তিমির লগন

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

॥ প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬ ॥

প্রকাশক :
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট :
শ্রীগণেশ বসু

মুদ্রণ :
শ্রীগণেশপ্রসাদ সরাফ্
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৭।১, বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা-৬

॥ দাম—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা ॥

রংগমঞ্চে গৈরীশ স্বর্ণযুগের শেষ
দীপবর্তিকা শ্রীতারকনাথ বাগচী
জীবনরসিকেষু—

: লেখিকার অন্যান্য বই :

এতটুকু আশা

দীর্ঘ পনেরো বছর বাদে অসিত মৈত্র-র বাড়ীটা আবার উৎসবের সাজে সাজলো। একে একে সমস্ত বাড়ীটার বাইরে মিস্তিরি লাগলো—হলদে রঙে যেন নূতন কাপড় পরে সেজে উঠলো বাড়ীটা। জানালা-দরোজায় লাগলো সবুজ রঙ। তারপর একদিন শানাই ওয়ালা বায়না করে গেল। অনেকদিন বাদে একদিন সে বাড়ীতে রোশন-চৌকিতে আবার গৌড় সারঙের সুরে কেঁদে উঠলো বাতাস। বুড়ো শানাইওয়ালা আসাতুল্লার হাত তেমনই মিষ্টি আছে, তবে গলায় আর বুকে তেমন জোর নেই। তারও পরে একদিন সমস্ত বাড়ীটা আলোঝলমল করে উঠলো। অসিত মৈত্র-র জীবনের শেষ কাজ এই উৎসব। কার্পণ্য করলেন না কোথাও। সেই ডেকরেটার-ই এলো, পনেরো বছর আগে যে এসেছিল। সেই একই ডিজাইনে সাজালো বাড়ী, প্যাণ্ডেল, হলঘর। সে-ও ছিলো শ্রাবণ মাস। আর এবার-ও লগ্ন মাঝশ্রাবণে। শেষ অবধি রজনীগন্ধা-ও এলো স্তবকে স্তবকে। সব আয়োজন সম্পূর্ণ। বিয়ে হতে আর একটা দিন বাকি।

অসিত মৈত্র তাঁর স্ত্রীর ঘরে ঢুকলেন। পুরনো খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন জ্যোতিপ্রভা, পা দুটি শালে ঢাকা। ফর্সা মুখে রোগ ও শোকে চোখের নিচে কালি পড়েছে। যেন এক মর্মরের বিষাদ প্রতিমা। রোগশয্যার পাশে টেবিলে ফল ও ওষুধ। কয়খানি পড়বার বই—হাতপাখা। পায়ের দিকের দেওয়ালে একটি মেয়ের ছবি। বয়স বড়জোর কুড়ি কি বাইশ। নতুন গহনা পরা কনেচন্দন আঁকা। ছবিটা ফিকে হয়ে এসেছে তবু বুঝতে ভুল হয় না যে সুন্দর ও সুকুমার একখানি মুখ—মুখেচোখে ঢলঢলে লাবণ্য ও বড়বড় চোখের চাহনি ঈষৎ বিস্মিত।

অনেকদিন বাদে আজ জ্যোতিপ্রভা কাঁদছেন। সকাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে চোখথেকে। শানাই-এর শব্দ বুকের

ভেতর থেকে সেই লুকোন কান্নাটাকে বের করে আনছে। এই রকম-ই আর এক বিবাহের দিন—আর এক উৎসবের বাজনা—যাকে ঘিরে বেজেছিল, সে আজ কোথায়।

অসিত মৈত্র স্ত্রী-র কাছে এসে বসলেন। জ্যোতি আস্তে আস্তে বললেন—সব হলো?

—সব।

—সেই মহম্মদকে খবর দিয়েছিলে।

—সেই ডেকরেটার, সেই সব কিছু। একবার দেখবে।

—মালবী কোথায়?

—তার ঘরে।

—নিশীথ?

—গাড়ী নিয়ে বেরিয়েছে। যাবে জ্যোতি?

—চলো।

স্বামীর হাতে ভর দিয়ে জ্যোতি উঠলেন। বললেন নিচে যাব আজ।

নিচের ঘর হলঘর, সব দেখতে দেখতে সহসা চোখে পড়লো সিঁড়ির সামনের দেওয়ালে সুবিশাল একটা রিক্ততা। বললেন—এ কি তার ছবি কোথায় সরিয়েছ?

—আমার ঘরে। শোন জ্যোতি—আজ বাদে কাল মালবীর বিয়ে নিশীথ আর বাসবীর বিয়ের ছবিটা অমন ভাবে ভালো দেখায় কি?

বলো!

—তবে ওখানে একটা চাঁদমালা দাও, বা ফুলের রিং দাও ফাঁকা যেন চোখে লাগছে।

—তাই দেব।

জ্যোতি এবার নিজের ঘর পেরিয়ে মালবীর ঘরে এলেন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই দাঁড়িয়ে গেলেন দরজার মুখে। মালবী নয়—যেন বাসবী-ই বসে আছে খাটে। নতুন খাটে বসে আছে নতুন গহনা আর শাড়ী

মাথায় পরিষ্কার। রোমান্স প্রিয়তা বা ভাবালুতা নয়, মালবীর সম্পর্কে তার উদ্বেগটা আন্তরিক। সে বলেছিল—তোমার না থাক, আমার আগ্রহ আছে।

—কেন, তাই তো আমি বুঝিনা।

—কেননা তুমি আমাকে বুঝতে চেষ্টা করো না। বুঝতে পারো না কেন, যে কোন মানুষের দুঃখকষ্ট সম্পর্কেই আমার গায়ে পড়ে একটা উপকার করবার স্বভাব আছে। আমি মানুষটাই ঐ ধাঁচের। স্বভাব কি আর এই বয়েসে বদলানো সম্ভব? তোমাকে কেমন করে আমি এমন একটা বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে সরে যেতে পারি বল।

—আমি তো কোন বিভ্রান্তি দেখছি না।

—দেখবে কি করে মালবী, তুমি একটা অদ্ভুত হিস্টিরিয়ায় ভুগছ।

অন্যদের ওপর রাগ করা চলে, কিন্তু যে রাগে না, সেই রজতের ওপর রাগ করা অর্থহীন।

পরে রজত আরও বলেছে। অনেক বলেছে। কিন্তু মনে হলো মালবী কোন স্বর্গের আশ্বাস পেয়েছে। দিবারাত্রি 'আমি পারবো, আমি পারবো—' এই কথা মনে মনে জপ করে তার স্নায়ুতন্ত্রী যেন চড়া তারে বাঁধা হয়েই আছে। একটা আশ্চর্য প্রেরণা তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সে নিজের কথা ভাববে না। নিজেকে সে নিঃশেষে ডুবিয়ে দেবে আর একজনের মধ্যে। বিয়ের রাত থেকে সে হবে সেই আর একজনের ছায়া। তাকে সুখী দেখে তার বাবা মা সুখী হবেন। তাকে দেখে, তার মধ্যে, নিশীথের অশান্ত প্রাণটা শান্তি পাবে। আর সে নিজে? সে-ও সুখী হবে। কেন, সুখ কি শুধু একই রকম? একভাবেই সুখী হয় মানুষ? নিজের সুখেই সুখ? সুখ শুধু নিজের চরিতার্থতায়? আত্মবিলোপে সুখ নেই? তিলে তিলে নিজের সুখ শান্তি বিসর্জনে সুখ নেই? সত্যকথা, সে নিশীথকে-ও ভালোবাসে না। কিন্তু ভাণ করতে তো পারে। আর ভালোবাসার অভিনয় করতে করতে একদিন যে সে ভালোবাসবে না নিশীথকে, তারই বা কি মানে আছে?

আজ রজত কোন কথা বললো না। বললো না যে তার পরিচিত দুই একজন বন্ধু বলেছেন—ঐ বাড়ীটাতে যাওয়াই তোমার ভুল হয়েছিলো। ঐ বাড়ীটাতে কোনো বাইরের মানুষ ঢোকে না, বেরোয় না। অর্থাৎ ও বাড়ীটা কারুকে আপন করতে চায় না। ওরা নিজেদের মধ্যেই সম্পূর্ণ, অর্থাৎ মৈত্র, তাঁর স্ত্রী আর নিশীথ তালুকদারের কথা বলছি। মৈত্রের ছোট মেয়েটিও তো বড় হলো এতদিনে। সে-ও নিশ্চয় বাড়ীর সকলের মতোই হয়েছে।

আরো অন্তরঙ্গ যারা তারা বলেছে—মালবীর সঙ্গে বৃথাই ভাব করছো রজত। মালবীকে বিয়ে করবে ঐ নিশীথ। নিশীথ যেখানে যখন ঢুকেছে, সবটুকু গ্রাস না করে ছাড়ে নি। দেখনি—ও বাড়ীতে প্রকৃত মালিক কে? নিশীথ না?

প্রতিবাদ করেনি রজত। আর নিশীথের সম্পর্কে বেশী জানবার কোন আগ্রহও তার ছিল না। কেন জানতে চাইবে সে? এ বাড়ীতে সে ঢুকেছে মালবীর বন্ধু হিসাবে। মালবীর সঙ্গেই তার পরিচয়।

প্রথম দর্শনে তার এই মনে হয়েছিলো, নিশীথের বয়স বেয়াল্লিশ, মালবীর বয়স বড় জোর বাইশ। এই অ-সম বিবাহ যে দৃষ্টিকটু! তারপর মনে হলো নিশীথ বিয়ে করছে হয়তো টাকার জন্যে, নয়তো যে স্ত্রীকে সে মর্য্যাদা করতে পারেনি—অকালে হারিয়েছে, তারই প্রতি অগাধ প্রেমের জন্য। কিন্তু মালবী? মালবী কেন বিয়ে করতে চাইছে নিশীথকে? সে প্রশ্নের জবাব কোথায়?

মালবী প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। তবে উচ্ছল নয়, সংযত। সংযত ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ মেয়ে। সে যে কাজ করবে, তার নিশ্চয় কোন ভিত্তি থাকবে, আর সে ভিত্তি নিশ্চয় সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভেবেছিলো রজত।

মালবী কিন্তু রজতকে অন্তরঙ্গ হতে অবকাশ দিল না। বন্ধুর মতো সহজ সম্পর্ক রইলো। তাকে আর গভীর হতে দিল না। একটু হেসে সহজ ও সুন্দর ভাবে সেই পরিণতি এড়িয়ে গেল।

আরো গভীর হতে চাইলো রজত। চাইলো, এই হাসি ও কথার

আড়ালে যে দেয়ালটা তুলে রেখেছে মালবী, যার ওপারে সে আত্মরক্ষা করে বাঁচে, সেই দেওয়ালটা ভাঙতে। ইচ্ছে হলো, একটু অন্তরঙ্গ হতে চাইলেই মালবী যে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে, সেই ঔদাসীন্যটুকু সরিয়ে দিতে।

কিন্তু সে আর হলো কোথায়? সে সম্ভব হলো না। মালবী একদিন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই জানালো, যে সে বিয়ে করছে নিশীথকে। আর এতদিনের প্রস্তুতি আছে এর পেছনে, যে এখন আর নতুন করে কোন কথা শোনা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

আজ রজত অন্য কোন কথা তুলল না। বললো…

—শেষ অবধি বিয়েটা সত্যি সত্যিই করেছো?

—তোমার কি ধারণা ছিল আমি ঠাট্টা করছি!

—না। তবে…

—তবে কি রজত!

রজত মুখ তুলল। মালবীর চোখে চোখ রেখে বললো—তবু ভেবেছিলাম, তোমার মধ্যে যে সত্যপ্রিয়তা আছে, অসত্যের প্রতি ঘৃণা আছে, তারই জোরে তুমি শেষ অবধি এই অন্ধ মোহটা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

—আবার রজত!

—হ্যাঁ মালবী। কিছু মনে ক'রো না—এমনভাবে তোমার মুখোমুখি বসে কথা কইবার অবকাশ আমার আর হবে না। তুমি এখানে থাকলেও না—স্বভাবতঃই তখন আমি একজন পরস্ত্রীর সঙ্গে কথা কইতে আসব না—তাই বলছি—আমি এখনো বিশ্বাস করি—যা করতে চলেছ, সে একটা মোহ—অসম্ভবকে সম্ভব করবার মনোভিলাষ—কিন্তু এতে তুমি সুখী হবে না।

—আমি তোমার কথা মানি না।

—আর সেই সত্যাসত্যের কথা তুললাম কেন? না, যখন মনেপ্রাণে জানো, যে তুমি নিশীথবাবুকে ভালবাস না, তখন একটা অসত্যকে ভিত্তি করে এতবড় কাজ করতে চলেছ তুমি! আজ তোমাকে মূর্খ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে মালবী।

—আমি এ সব কথা শুনতে চাই না রজত।

—আর বলবো না।

—শুভ কামনা জানাবে না!

—নিশ্চয় জানাবো। শোন মালবী—অন্তরে জানলাম, যে তুমি একটা মিথ্যা মোহকে আশ্রয় করে এই বিয়ে করতে চলেছো। একজন মৃতকে জীবিতের চেয়ে বড় করে তুলতে চাইছ। দেখে গেলাম, যে বিয়ে করছো কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা আর বিকৃত কল্পনাকে। জেনে গেলাম, যে এই কাঁচের ঘর একদিন ভেঙে পড়বেই—সেদিন তোমাকেও ক্ষতবিক্ষত হতে হবে। এত সত্বেও, কামনা করে যাচ্ছি তুমি সুখী হও।

—এটা রাগের কথা হলো রজত।

—হয়তো হলো! কিন্তু ছি ছি মালবী, আমার কথা ভাবতে বলিনি—নিজে কেন এই স্বরচিত ফাঁদে পড়লে! এ কি ভুল করলে! আচ্ছা, উঠলাম। হয়তো মধুর কিছু শোনাতে পারলাম না। সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর কথা বলতে আমি পারলাম না আজ। মালবী, তুমি আমায় মাপ ক'রো।

বেরিয়ে গেল রজত। ঘরে চুপ করে বসে রইলো মালবী কিছুক্ষণ। আজ আর সে কিছু ভাববে না, কিছুতে বিচলিত করবে না মন।

'যেন সুখী হই, যেন সুখী হই'—এই কামনা করতে করতে তার চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরতে লাগলো। মনটা টলমল করতে লাগলো। বিয়ের আগের দিনে, কি জন্যে এলো রজত? কেন ঝোড়ো হাওয়ার মতো তার মনের সব সাজানো সঙ্কল্প এলোমেলো করে দিয়ে গেল! কেন এমন হয়! কাল যার বিয়ে, আজ কেন তার মনে আর একজনের কথা শুনে এমন করে আলোড়ন ওঠে! না, রজতের কথা সে ভাববে না।

বাইরে সেই সানাইওয়ালা এবার নূতন সুর ধরেছে। মালবীর মনে আছে দিদির বিয়ের দিনের কথা। সে সানাই-এর সুরও যেন শিশুমনের অবচেতনের কোথায় লুকিয়ে আছে। আজকের সানাই

শুনে সে সানাই সাড়া দিয়ে ওঠে কি! কই, না তো! আজ সানাই কি বাজাচ্ছে! আজকে আশোয়ারী বাজবার মতোই সকালটি। সজল মেঘে ছলছলে আকাশ। এমনি সকালেই তো আশাবরী বাজাব!

সুরের সে স্বচ্ছন্দ সুন্দর লহরা শুনতে শুনতে মালবী আবার কামনা জানায়। সে যেন সুখী হয়।

* * *

রজত চলতে থাকে। সে বেরিয়ে আসতেই মৈত্রদের গেটটা ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। কোন রহস্য, কবেকার কি দুঃখ বেদনা লুকিয়ে আছে ঐ বাড়ীটার মধ্যে! কেন ওখানে আজ অবধি কোন বহিরাগত আপন হতে পারল না! কেন ঐ গেটটা অমন করে রজতের সকল জিজ্ঞাসা, সকল প্রশ্নের ওপর বার বার বন্ধ হয়ে যাবে!

মালবী আজ যেমন করে রজতের মনকে নাড়া দিলো—এমনটি আর কখনো দেয়নি। স্বীয় সংকল্পে সুদৃঢ় মুখ, কঠিন হৃদয়—মালবীকে দেখে আজ যেন রজত বুঝলো এই মেয়েটির প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা ও কতখানি প্রীতি তার মনকে ভরে রয়েছে। এমন করে আগে বোঝেনি কেন!

কিন্তু ভালবাসাও রজতকে অন্ধ করতে পারে না। সে মনে না করে পারে না, যে মালবীর এই আচরণের মূলে রয়েছে এক অন্ধ মোহ—তার সমস্ত শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতি। কিন্তু সেই সব ভাবানুভূতির মর্য্যাদা দিতে গিয়ে মালবী নিজে যে শেষ হয়ে গেল—সেটা তো কেউ দেখল না!

একটা শূণ্যতা বোধ হয় তার। কি করবে ভেবে পায় না। বসে গিয়ে চৌরঙ্গী ও পার্ক ষ্ট্রীটের ভিতর মোহনার একটি বার-এ।

কিন্তু অনাস্বাদিতই থাকে পানীয়। ভাললাগে না রজতের। আজকের দিনটা এই তার চোখের সামনে পলে পলে কেটে যাচ্ছে। আজকের দিনটা ফুরোলেই কাল সকালে ঐ বাড়ীটায় বিয়ের বাজনা বাজবে। ঐ সানাইয়েই লাগবে বিয়ের সুর। আর কাল সন্ধ্যায় মন্ত্রোচ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মালবী হয়ে যাবে নিশীথের স্ত্রী। সে আর

যাবে না। কেউ আর যাবে না। ঐ অভিশপ্ত বাড়ীটা উঁচু পাঁচিল, ঝাউগাছের প্রহরা, মস্তো লোহার গেট, আর অদ্ভুত সব মরা স্মৃতির প্রতি অসাধারণ মমত্ব বোধ সব কিছু নিয়ে গ্রাস করে ফেলবে মালবীকে।

ঐ বাড়ীটা যেন মরা। অসিত মৈত্র কোনদিনও বেরোন না। তাঁর স্ত্রী ও থাকেন নিজের ঘরে বন্ধ। নিশীথ তালুকদার শ্বশুরের গাড়ী নিয়ে বেরোয়। শ্বশুরের ব্যবসা দেখে। স্পেকুলেটও করে বলে শোনা যায়। সে-ও একটা আশ্চর্য্য মানুষ। হাসে না, টেনিস খেলে না, বেরোয় না বেশী, পাইপ মুখে বাগানে ঘোরে—আর বিকেলে মৈত্র ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। তাঁদের নিয়ে মন্দিরে গিয়ে বসে থাকে, কীর্তন শোনে—মহারাজ সাধুদের সঙ্গ করে।

নিশীথ মদ খায় না। রজতকে তার সহকর্মী দেবেন বলেছিল—যে লোক মদ খায় না, তাকে বিশ্বাস ক'রো না বুঝলে! পৃথিবীতে যত অন্যায় কাজ হয়, সবই মদ না খেয়ে করে মানুষ। মদ খেয়ে কি করে বল! বড় জোর নিজের বৌ-ছেলেকে কষ্ট দেয়, নিজে ফতুর হয়, নয় তো বোকার মতো খুন ক'রে জেলে যায়। না রজত, আমি বলছি তোমায়—ও লোকটা অন্যদের মদ খাওয়ায়, নিজে বসে বসে দেখে! ও লোকটাকে বিশ্বাস ক'রো না।

দেবেনের মদ্যপ্রেম সবাই জানে। তার জীবনদর্শন রজতের সঙ্গে এক হতে পারে না। কিন্তু নিশীথের সম্পর্কে তার নিজেরই অনেক কথা মনে হয়। ঐ মানুষটাকে সে কিছুতেই মালবীর স্বামী হিসাবে ভাবতে পারে না। অথচ মালবী অবাধ্য, অনমনীয়—তাকে বোঝাতে পারল না রজত।

মালবীর বিয়ের দিন কাগজের অফিসে রজতের ডিউটি ছিলো রাতে। একপক্ষে ভালোই। অপ্রিয় সব চিন্তা থেকে মনটা যত দূরে দূরে থাকে ততই ভালো লাগবে তার। মনের অতলে একটা ভোঁতা ব্যথার বোধ। কে যেন ভোঁতা একটা যন্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে—ব্যথাটা তাই অদ্ভুত ধরণের।

অফিসের গাড়ীতে রাত তিনটেয় বাড়ী ফিরে বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিল রজত। ঘুম ভেঙেছিল ফোনের আওয়াজে। ফোন বাজছে বার বার। ফোনটা তুলে নিতেই কানে এলো—মালবীর গলা—'রজতবাবু আছেন? রজতবাবু?'

—কথা বলছি আমি।

—শোন রজত, একবার এখনি এস।

—কেন মালবী? কি হয়েছে?

—শুনে মালবী যেন একটা নিশ্বাস ভেতরে টানলো তারপর বললো—তুমি কাগজ দেখনি?

—না। কি হয়েছে?

—কাল রাতে···

—হ্যাঁ, কাল রাতে···কি?

নিজের কথাগুলোই যে বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারছে রজত। তবু নিজেকে সে গুছিয়ে নিতে পারছে কোথায়?

—কাল তো তোমার বিয়ের রাত ছিল, মালবী?

—বিয়ে হলো কোথায়? ওঃ রজত, তুমি···হ্যাঁ, হ্যাঁ—কথা বলুন—রজত, কেটে দিচ্ছি—ফোন নিচ্ছেন অন্যরা।

কেটে গেল ফোন। রজত উঠে পড়লো। সবগুলো কাগজ থরে থরে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে চাকর। চট করে খুললো একখানা। ছোট্ট খবর—চার লাইনের—সামনের পাতাতে-ই। আকস্মিক মৃত্যুর জন্য বিবাহ স্থগিত। নিশীথ তালুকদার মারা গেছে। দুর্ঘটনা বলা চলে।

মালবীর বাড়ীতে যখন পৌঁছলো রজত—তখন সেখানে অনেক ভীড়। পুলিশের গাড়ী। জনসমাগম। মিসেস মৈত্র না কি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, ডাক্তারের ইনজেক্‌শনে ঘুমোচ্ছেন এখন।

মালবী কোথায়? মালবী বসেছিলো নিচের ষ্টাডি-তে। পাশে বসে একজন আত্মীয়া একটু কফি খেতে সাধাসাধি করছিলেন।

রজতকে দেখে মালবী শাদা হয়ে গেল। বিয়ের শাড়ীটা খুলে

ফেলেছে। গহনাগুলি গায়েই আছে। কনেচন্দন কিছুটা মোছা। রজত পাশে বসলো অকুণ্ঠভাবে। পিঠে হাত রাখলো সস্নেহে। বললো—মালবী!

মালবী দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুললো। পাংশু মুখে চোখের নিচে কালি পড়েছে। বিস্রস্ত চেহারা। বললো—কে এমন কাজ করলো রজত?

—মালবী! কি বলছো?

—তুমি জান না?

—না।

-কোন দুর্ঘটনা নয়। কে গুলী করে মেরেছে নিশীথদা'কে। বুঝলে?

—কি বললে?

—হ্যাঁ। আর···আর শঙ্করকে পাওয়া যাচ্ছে না।

—শঙ্করকে?

—হ্যাঁ রজত···ভাবতে পার? কে এমন কাজ করলে?

ছোট মেয়ের মতো কাঁদতে লাগলো মালবী। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—ফুলে ফুলে। আর সমস্ত ঘটনার ভয়াবহতা এই মুহূর্তে রজতের চোখে স্পষ্ট হলো নিদারুণ নগ্নতায়। বিয়ের লগ্নে মারা গিয়েছে ভাবী স্বামী—এই মেয়েটির অবস্থা কি অসহায়! আর এই উৎসবের আয়োজন, অর্থব্যয়, প্রস্তুতি—সবই তো নষ্ট হলো। অর্থব্যয়ের কথা দূরে থাক্—কলঙ্ক-আর এই ধরণের ঘটনার ফলে অবশ্যম্ভাবী আরো জটিল সব ঘটনার জাল কি ছড়িয়ে পড়লো না? এখনই কি পড়ছে না? এখনই কি মনে মনে, মুখে মুখে—কতজন বলছে না, যে কেন এমন হলো? এর মধ্যে নিশ্চয় কোন ব্যাপার আছে।

রজত যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো—বহু ঘটনার কালো একটা জাল জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছে এই পরিবারটিকে। মালবীর কথাই তার মনে হলো। হাজার লোকের মুখে, তার সম্পর্কেই কি কম কথা উঠবে না?

রজত বললো—মালবী, তুমি ভেবো না, আমি যদি কোন কাজে লাগি—লাগতে কি পারি না? বল?

মালবী মুখ তুলে বললো—রজত, তুমি বাবার কাছে যাও। বাবা একেবারে ভেঙে পড়েছেন। তুমি তো জানো, উনি নিশীথদাকে কি চোখে দেখতেন?

উঠে গেল রজত। ইনস্পেক্টারের সামনে বসে মৈত্র তখন বলে চলেছেন—নিশীথকে আমি দেখিনি ওপরে যেতে…সে বিশ্রাম নিচ্ছিলো …হ্যাঁ, শরীর খারাপ ছিলো সকালে বলছিলো…

মনে হলো অসিত মৈত্র যেন বুড়ো হয়ে গেছেন। বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন এক রাতেই।

মানুষের মনের জটিল গতিবিধির খবর কে রাখে? কে জানতো নিশীথের হত্যার সূত্র ধরে এমন করুণ ও মর্মস্পর্শী এক নাটক উদ্‌ঘাটিত হবে?

মৈত্র পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে রজত প্রাণপণে সাহায্য করলো। নিশীথের নাম কে না জানে? তার গত জীবনের কোন পরিচয়ই এর পেছনে আছে—তাই বললো সবাই।

নিশীথ তালুকদারকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হলো যে, তাকে কোনদিনও জানতেন না অসিত মৈত্র। শুনলেন যে, এডিথ বিশ্বাস, যে ব্যক্তিগত জীবনে নার্স, আর অকলঙ্ক যার চরিত্র—সে-ই এই কাজ করেছে।

অভিযুক্ত এডিথকে দেখতে গিয়েছিলেন অসিত মৈত্র। কাস্টডির শাদা চূণকাম করা ঘরে, সন্ধ্যার আঁধারে যে মেয়েটি মূর্তিমতী হতাশার মতো দুটি হাত কোলে জড়ো করে বসেছিলো, তাকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। বললেন—কে? কে তুমি?

কাঁদছিলো মেয়েটি, মুখে তার কথা ছিল না। তবু কোনো এক আশ্চর্য আর্তি ফুটে উঠেছিল মুখে, এগিয়ে এসেছিল সে।

অসিত মৈত্রের মাথায় সব গোলমাল হয়ে যায়। —ও কে? ও কে? ওকে যেতে বলুন—

প্রায় ভেঙে পড়েন অসিত মৈত্র। বেরিয়ে আসেন রজতের সঙ্গে। তারপর বাড়ীতে ফিরে সোজা চলে যান ওপরে। জ্যোতিপ্রভার ঘরে। সেখানে বন্ধঘরে দুইজনে কি কথা হয়, কেউ জানতে পারেনা। শুধু জ্যোতিপ্রভার আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। বন্ধ দরজার পাহারার নিষেধে সে আর্তির কথাগুলি হারিয়ে যায়। শুধু গালার কান্নাটাই শোনা যায়।

কি করে কি হলো বোঝা যায় না। মালবী ভাসাভাসা শোনে এ্যাডথ না কি তার দিদির মতো দেখতে। তার বাপ এখন সরকারী দফ্‌তরে দফ্‌তরে কাকুতি মিনতি করে বেড়াচ্ছেন যাতে মামলা বন্ধ করা হয়। সে কথা সত্যি।

তারপর অসিত বার বার চেষ্টা করেন—এই মামলা তুলে নিতে চান—মেয়েটিকে অব্যাহতি দিতে চান।

কিন্তু হৃদয়ানুভূতি বুঝে তো আইনের পন্থা চলে না।

তখন দেরী হয়ে গিয়েছে। ঘুরছে চাকা। ধর্মাধিকরণের ধর্মচক্র। তার নিষ্পেষণে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে মানব হৃদয়ের গোপনচারী সব দুঃখ, কত কথা।

পাবলিক প্রসিকিউটারের গলা কঠোর গাম্ভীর্যে গমগম করে ওঠে।

—কেন নিশীথ তালুকদারকে হত্যা করেছেন আপনি?

নিরুত্তর এডিথ। মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাথরের মতো নিশ্চল। মুখে কোন কথা নেই। কাঁচাপাকা চুলগুলো উড়ছে সামনে। দুইহাত রেলিংয়ে জড়ো করা। সেই দুইখানি নমিত হাতের অসহায় ভঙ্গীতে কি যে ক্লান্তির ছাপ। ক্লান্ত এডিথ। ক্লান্তি ঝরে ঝরে পড়ছে।

এই দীর্ঘায়িত নীরবতা আরো বিরক্ত করে পাবলিক প্রসিকিউটারকে

—আর একটি নির্দোষ মেয়ের জীবন নষ্ট করেছেন আপনি।

নিশীথের বাগদত্তা বধূর জীবনে এনেছেন অশান্তি। একটি সুখী পরিবারে এনেছেন কলঙ্ক।

মাথা নাড়ে এডিথ। তবু কোনকথা বলে না।

—আপনার দোষ স্বীকার করেন আপনি?

—স্বীকার করি।

গুন্‌গুন্‌ শব্দ ওঠে জনতার মধ্যে। অসিত মৈত্রের মুখ শাদা। কিন্তু সে চোখে অভিযোগ কোথায়? তাঁর চোখে শুধুই যন্ত্রণা আর মিনতি। আর কেন? এই বিচারের প্রহসন থেকে মুক্তি দিলেই ত' হয় এডিথকে। এত কথার কি প্রয়োজন?

কিন্তু তাঁর দিকে তাকায় না এডিথ। বলে

—আমার স্বামীকে হত্যা করেছি আমি। স্বীকার করছি।

—স্বামীকে?

—হ্যাঁ।

পাবলিক প্রসিকিউটার হাসেন। বলেন

—নিশীথ তালুকদারের স্ত্রী বাসবী তালুকদারের আজ থেকে দশ বছর আগে মৃত্যু হয়েছে কলেরায়। শেখপুরার থানা রিপোর্ট তার সাক্ষ্য দেবে।...সালের জুলাই মাসের বিশ তারিখে রাত একটায় মৃত্যু হয় বাসবী তালুকদারের। ডক্টর পালের সার্টিফিকেট আছে।

এডিথের গলা জোরালো হয়ে ওঠে। দৃঢ় প্রতিবাদের সঙ্গে সে বলে

—সে কথা মিথ্যা। আমি মরিনি। আমার মৃত্যু রটনা করেছিলেন আমার স্বামী। আজ থেকে দশ বছর আগে...

বলতে বলতে গলাটা ভেঙে আসে। কিন্তু আশ্চর্য আত্মসংযম এডিথের। অন্য কোনো ভাবচাঞ্চল্য দেখা যায় না। দুটি হাতের আঙুল—এ ওকে জড়ায়, আবার খুলে যায় আবার জড়ায়। এত জোরে জড়ায়, যে রক্তশূন্য হয়ে যায় সাময়িকভাবে। তা ছাড়া মনের বিক্ষোভের তেমন কোন পরিচয় বোঝা যায় না। এডিথ বলে

—বিশ্বাস করুন আমি মরিনি। মরিনি, শুধু এই বিশ্বাস নিয়ে

বেঁচে ছিলাম, যে একদিন এই অন্যায়ের প্রতিশোধ আমাকেই নিতে হবে। তারপর যখন জানলাম মালবী বিপন্ন, তখন আর দেরী করতে পারলাম না। মেরেছি আমি নিশাথকে তার বিয়ের রাতে। কিন্তু তার আগে পনেরোদিন ধরে আমি ছায়ার মতো অনুসরণ করেছি তাকে। বোট্যানিকালে এক পিক্‌নিকের দিন···

—আমি বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম তোমাদের, যে আমি বাসবীকে দেখেছি···তোমরা বললে ভুল।

মিসেস মৈত্রের গলা ভেঙে মাথা প্রায় লুটিয়ে পড়ে মালবীর কাঁধের ওপর। সচকিতে উঠে দাঁড়ায় মালবী। মাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে ভিড় ঠেলে।

আদালতের ভিতরে বসে থাকেন একা অসিত মৈত্র। এডিথের কথাগুলি শোনা ও তাঁর পক্ষে চরম যন্ত্রণার। কিন্তু না শুনেও উপায় নেই তাঁর।

এডিথ এতক্ষণে আত্মবিশ্বাসে জোর পেয়েছে। সতেজ স্পষ্ট কণ্ঠে সে বলে

—আজ থেকে পনেরো বছর আগে···

অসিত মৈত্রের বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে এডিথ রূপান্তরিত হতে থাকে বাসবী তালুকদারের। সেই কণ্ঠ, সেই দাঁড়াবার ভঙ্গী···সেই চোখ··· কেন তিনি অবিশ্বাস করেছিলেন স্ত্রী-কে, মেয়ে মালবীকে? কেন নিজের চোখের সাক্ষ্য-ও তিনি বিশ্বাস করেন নি? বাসবী···হ্যাঁ বাসবী-ই তো! বোট্যানিকাল গার্ডেনে পিকনিক। বিয়ের বারোদিন আগে। গাড়ী করে আসতে আসতে স্পষ্ট যখন দেখলেন আলো আঁধারিতে দাঁড়িয়ে আছে বাসবী···চেয়ে আছে তাঁদের দিকে···তখন তাকে শোকার্ত পিতৃদহৃয়ের বিভ্রম বলে মনে করলেন কেন? কেন এগিয়ে গিয়ে দেখলেন না? আর বেহালাতে সেই ঠাকুর বাড়ী থেকে কীর্তন শুনে ফেরবার সময়? যখন দেখলেন পুকুরের ধারে ঝিলমিলে আলোয় গায়ে কালো শাল টেনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসবী, তখনই বা কেন ভয় পেলেন? আতঙ্ক হলো? কেন মনে হলো যে

মৃত্যুর ওপার থেকে অপূর্ণ সব কামনা বাসনা নিয়ে বাসবী বারবার ফিরে আসতে চাইছে? কেমন করে নিজেকে ক্ষমা করবেন তিনি সেদিন যদি তাঁর সাহস হতো, তা' হ'লে কি বলতে' হতো কিছু? বাসবীকে তিনিই তো বুকে করে নিয়ে আসতেন। কিন্তু তাঁর সেই বিচ্যুতি আজ আর সংশোধন করবার সময় নেই। হাতের লাঠিটা শক্ত ক'রে ধরে চেয়ে থাকেন মৈত্র।

এতদিন ধরে এত কথা জমেছিলো যে বাসবী আজ আর থামতে পারে না। সে বলতে সুরু করে

—পনেরো বছর আগে···

যবনিকা উঠতে থাকে আশ্চর্য এক কাহিনীর ওপর থেকে। সে কাহিনী যেমনি বিচিত্র, তেমনি সংঘাত জটিল। সে কাহিনী রচনা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের জীবন নিয়ে যে কাহিনীকার কাহিনী রচনা করেন, তিনিই পারেন এমনি করে সরু মোটা দুই তারে জড়িয়ে জড়িয়ে এমনি বিমিশ্র আবহ সৃষ্টি করতে। বড় খেয়ালী সেই স্রস্টা। তাঁর সে খেয়ালখুসীর দাম দিতে গিয়ে দেউলে হয়ে গেল কার জীবন। কে-ই বা ফাঁকি দিয়ে অনেক টেনে নিলো, সে হিসেব তাঁর মাথায় নেই। সে হিসেব তিনি কেন করবেন?

॥ ১ ॥

বাসবীর সঙ্গে নিশীথের প্রথম পরিচয় রুবি মল্লিকদের মুনলাইট পিকনিকে। মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়। জীবন তখনো এমন জটিল হয়ে ওঠেনি। অন্তত আজকের পরিপ্রেক্ষিতে সে জীবন ও যেন অনেক সহজ সরল বলে বোধ হয়।

পিকনিকে যাবার ইচ্ছা ছিলো না বাসবীর। এই ধরনের হৈ চৈ কেমন যেন তার ধাতে সয়না। ভালো লাগেনা তার। কিন্তু বন্ধুদের উপরোধ-ই নয়, মা-ও জোর করলেন। বললেন

—বাবার মতো অসামাজিক হবি? ভালোলাগে সারাদিন এমনি বাড়ীতে মুখগুঁজে থাকতে? যা, লক্ষ্মী তো! রুবি, এলী, ওরা আশা করে বলে গিয়েছে—সত্যি মেয়েগুলি বেশ! ওদের-ও তো মনটা খারাপ লাগবে?

শেষ অবধি মা-র কথাতেই রাজী হলো বাসবী। ভীড় আর মানুষে বাসবীর বড় ভয়! চুপচাপ থাকতেই ভালো লাগে তার। আপন মনে, নিজের কাজে। আর এই নিঃসঙ্গ থাকবার অভ্যাস তার চিরদিনের। তার জন্যে খানিকটা দায় নিশ্চয় তার বাবা ও মা-র। অমনি করে সকলভাবে বহির্জগতের সবরকম ঘাত প্রতিঘাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে চলেছেন তাঁরা।

অসিত মৈত্র উত্তরবঙ্গের জমিদার বংশের ছেলে। মধ্যপ্রদেশে কিছু মাইকা আর কয়লার খনি কিনেছেন। পয়সা করেছেন প্রচুর। তবু ব্যবসাতে-ও কিছু কিছু প্রাচীন জমিদারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বাইরের সাফল্যের চেয়ে মানুষ হিসেবে খাঁটি হওয়াটাকে তিনি বড় করে দেখেন। যুদ্ধের মরশুমে বাজার ভরা ফাট্‌কাবাজ। ব্যবসায়ের রীত্‌করণ-ও যেন কালোবাজার ঘেঁসা। এ সব তিনি ঠিক বোঝেন না। রক্ষণশীল মানুষ। মধ্যপ্রদেশে ছিলেন অনেকদিন। কিন্তু মেয়ের লেখাপড়ার জন্যে চলে এলেন কলকাতায়। বড়মেয়ে

বাসবী। তারপর কয়েকটি সন্তান হারিয়ে, বাসবীর চেয়ে চৌদ্দ বছরের ছোট মালবী। দুটি মেয়ে-ই বাপ মা-র নয়নমণি। বিশেষতঃ বাসবী। এত নরম মন তার। এমন নিষ্পাপ, এমন অনভিজ্ঞ, যে সে বাপের বিশেষ প্রিয়। এই ভীরু ও লাজনম্র মেয়েটার ক'রে বিশেষ চিন্তা মৈত্র-মশাই-এর। বাইশ বছর বয়স হলো, কিন্তু বহির্জগত সম্পর্কে কেমন যেন একটু ভয়। বাসবী একটু ভীতু-ও। এখনো মালবীর সঙ্গে খেলা করা, বাগানের কাজ একটু আধটু করা, গান করা, বা বই পড়া। এর বাইরে নতুন নতুন খোরাক চায় না তার মন।

স্ত্রী অনেক সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন মৈত্রকে। বাসবীকে বিয়ে দিতে হবে। বিয়ে দিতে চাইলেই যে পাত্রের অভাব, তা নয়। আসলে মৈত্রমশাই নিজের জীবনের শিক্ষাটা ভোলেননি। বাপের পয়সা দেখে কোনো চটকদার ছেলেকে জামাই করবার বাসনা নেই তাঁর। তিনি খোঁজে আছেন একটি সৎচরিত্র শিরদাঁড়া-ওয়ালা ভালো ছেলের। যে জীবনে কষ্ট করে দাঁড়াতে চায়, বা দাঁড়িয়েছে। মানুষ হিসেবে হৃদয়বান ও খাঁটি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষ হিসেবে ভালো না হলে বাসবীকে কখনোই সুখে রাখতে পারবেনা কেউ। বাসবী নিজের কথা নিজে বলবে না। মুখ দেখে তার মনের কথা বুঝতে হবে। আঘাত করলে ফিরে ঘা দেবে না। বড় বড় আহত চোখে চেয়ে থাকবে। ঠোঁটটা একটু একটু কাঁপবে। শৈশবে কখনো শাসন করতে চাইলে—বাসবীর মুখখানা হয়ে যেতো অসহায়। চোখে জল টলটল করতো। চেয়ে থাকতো মুখের দিকে। আর ঠোঁটটা কাঁপতো। তাই দেখে মুখের কথা মুখেই থাকতো অসিত মৈত্রর। জ্যোতিপ্রভা-ও কিছু বলতে পারতেন না বাসবীকে। বাসবীর মধ্যে কেমন করে যেন সেই শিশুটা আজ-ও লুকিয়ে আছে। একটু মনে ব্যথা পেলে-ই তা বোঝা যায়। এই ঠোঁট আর মুখের অসহায় ভঙ্গী বাসবীর আজও রয়েছে।

মালবী বাসবীর চেয়ে একটু বিপরীত। চঞ্চল, প্রাণবন্ত, জেদী। সে এখনও শিশু। তার সম্পর্কে মৈত্রমশাই-এর ভাবনা নেই। মালবী

তার বাবার একদিকের উত্তরাধিকার পেয়েছে। তাকে সহজে কাঁদানো যায় না। জেদ করে নিজের দাবী সে আদায় করতে জানে। দিদির মতো কাঁদতে বসে না, বা মন খারাপ করে না।

পিকনিকের জায়গা হচ্ছে ভিভিয়ান রায়দের দমদমের বাড়ী মিসেস্ রায়ের নিজস্ব নার্সারী। বরাবর বিলেতে মানুষ। সেখানে নাকি কাজকে বড় শ্রদ্ধা করা হয়। মানুষগুলো-ও বুঝি সেইজন্য-ই তৈরী হয় খাঁটি হয়ে। মিসেস রায় জন্মসূত্রে না হোক, সঙ্গগুণে খুব কাজের হয়ে উঠেছেন। স্লিভ্‌লেস্ জামা, আঁটসাট বড়ির মতো খোঁপা, পায়ে চটি—মিসেস রায় সর্বদা নানারকম কাজ করে বেড়াচ্ছেন। এদিকে স্কুলের জন্যে যখন চ্যারিটি করছেন, তখনই মনে মনে জমায়েত অভ্যাগতদের প্রতি নজর রেখেছেন। পরে সেই সব লোকদের নিয়ে কমিটি ক'রে একটা সেল করলেন হাতের কাজের। এই ডগ-শো করাচ্ছেন আলিপুরে কার বাগানে, আবার দেখা গেল নিজেই একটা স্কুল খুলে ফেললেন ইংরেজী কথোপকথনের।

দমদমের বাড়ীতে তাঁর নার্সারী। গাছ, টব, অর্কিড ও বিভিন্ন মৌসুমের ফুলের এই মালঞ্চের মালিনী মিসেস রায় সাধ করে-ই হননি। কি ভাগ্যে দেশে সায়েব সুবোরা রয়েছে। তাদের প্রতিদিন নানাকাজে ফুল দরকার। সরকার আর বিদেশী ফার্ম-এর তিনহাজারী, চারহাজারী, পাঁচ-হাজারী মনসবদারদের ঘরে ঘরে মিসেস্ রায় তাঁর শাদালালে মেলানো রোডষ্টার চালিয়ে ফুল পৌঁছে দিয়ে আসেন। এর মধ্যে যেন মোটা ব্যবসায়ের কোন মনোবৃত্তি নেই। মিসেস রায়ের ভাবখানা হচ্ছে, যে তিনি ফুল ফুটিয়েই খুসী। তাঁর গ্রাহকরা যেন আরো গভীর রসপিপাসী মানুষ। আপাত দৃষ্টিতে এ শুধুই ফুল রসিক দুইজনের ব্যাপার। ইনি দিয়েই খুসী—হাসিতে ভেঙে পড়ে বিদায় নিলেন। উনি নিয়েই সেই ফুলের তোড়ায় নাক ডুবিয়ে ছুটে গেলেন। জানলায় রাখবেন, না টেবিলে রাখবেন, খাবার টেবিলকেও বঞ্চিত করবেন না, এই সব আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মাসের শেষে বিলটি যখন এলো, সে-ও লেনদেন হলো খুব তাচ্ছিল্য ভাবেই।

আজকের পিক্‌নিকে মিসেস রায়ের উৎসাহ খুব। চাঁদের ভরসায় বসে না থেকে, নিজেই তিনি গাছের আড়ালে কালোশেডে ঢাকা সবুজ আলোর ব্যবস্থা করেছেন। তাতে আলো কোথাও স্পষ্ট চোখে পড়বে না। অথচ সমস্ত আবহাওয়াটাই হবে স্বচ্ছ। রুবির হয়ে মিসেস্ রায়-ই সব দেখেশুনে বেড়াচ্ছেন। যে আসছে, তাকেই বলছেন

—নিশীথকে দেখেছ ? আলাপ করেছো ? আমার এলীর সঙ্গে···

—তাই না কি ?

ব'লে কৌতূহলী শ্রোতা এগিয়ে আসতেই তিনি সাগ্রহে বলছেন

—নিশ্চয়। আজ তিন মাস ধ'রে···নিশীথ তো এলীর জন্যে পাগল ! বলে দেরী করে কি হবে ? আমি বলি দাঁড়াও, পার্টি ডাকি এলীর জন্মদিনে, তখন এনগেজমেণ্ট করবো···

—আচ্ছা ?

কথাটার শেষে বিস্ময়ের সুর। মিসেস্ রায় তাঁর রুমাল দিয়ে টোকা দেন শ্রোতার আঙুলে

—সত্যি ! কিন্তু প্লীজ্ কারুকে বলো না যেন।

ব'লেই নিজে আর একজনকে বলতে চলে যান।

ভিভিয়ানের বোন এলী আর নিশীথের নাম ইদানীং মুখে মুখে ফিরছে। এখানে ওখানে সেখানে—সর্বত্র এলীর সঙ্গে দেখা যাচ্ছে নিশীথকে। এমনকি রেড্ ক্রস-এ ডিউটি সেরে যতক্ষণ না বেরুচ্ছে এলী, নিশীথ তার গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়েই আছে রাস্তায়, এমন-ও দেখা গিয়েছে। আবার সেই আউটরাম ঘাটে ? এলীর কোলে-ই তো মাথা রেখে শুয়ে পড়লো নিশীথ ক্লান্ত হয়ে ? এমনি আরো নজীর আছে। অবশ্য এসব ঘটনা কেউ নিজে দেখেনি, ও দেখেছে, বা ও তার কাছে শুনেছে। সে-ও আবার তার বন্ধুর কাছে জানলো ব্যাপারটা। এই আর কি !

ভিভিয়ানের মা-র চোখে বর্তমানে নিশীথ ছাড়া অন্য কোন কর্মবীর নেই। শিলিগুড়ির এক গরীব উকিলের ছেলে নিশীথ তালুকদার কেমন করে শুধু নিজের চেষ্টায় উন্নতি করলো, সে কথা বলতে গর্ব বোধ

করেন মিসেস্ রায়। এই তো উন্নতি। এ উন্নতি চোখে দেখা যায়। বোঝা যায়। তিনি সগর্বে বলেন

—নিশীথ হলো কর্মবীর। ওর মতো কর্মী ছেলে কয়জন? কর্মী না হলে এই ত্রিশবছর বয়সে এতখানি উন্নতি কেউ করে? ব্যারাকপুর মিডল রোডে বাড়ী, গাড়ী,—চমৎকার!

তাঁর কথা শুনে লোকের মনে হবে নিশীথের সবটুকুই গল্প হয়ে ওঠার মতো চমকপ্রদ। নিশীথকে নিজের ফার্মে ঢুকিয়েছিলেন ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেনের চ্যাটার্জি। নিজের পায়ে দাঁড়াবার ইচ্ছেয় জ্বলজ্বলে মুখ, চওড়া কবজি আর গুরুভার বহনের মতো সক্ষম ভারী কাঁধ, এই দেখে নিশীথের ওপর বিশ্বাস হয়েছিলো তাঁর। তাঁর বাড়ীতে থাকতো নিশীথ। সেখানে খেতো, শুতো—তাঁর ডান হাত ছিলো।

তাঁর সেই ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রপাতির কারখানা আর ব্যবসাটি কেমন করে নিশীথের হাতে চলে এলো, সে-ও নাকি আর এক গল্প। নিশীথের ব্যাপারে যেখানে যা ঘটে, সবই গল্প। আবার নিশীথের দৈনন্দিন জীবন, তা-ও এক গল্প! নিশীথের বাড়ীতে যে পার্টি হয়, তাও সবই অন্যরকম। কাঁচের মস্ত গামলায় ঢালা থাকে মদ। পাঁজা করা স্ট্র থাকে। গরম ট্রেতে ক'রে বেয়ারারা বয়ে নিয়ে বেড়ায় কাবাব, তন্দুরী চিকেন, সসেজ রোল। এক পার্টিতে নিশীথ হাজার দু'হাজার খরচ করে। নিজে সে মদ ছোঁয় না। তবু আপ্যায়নের আনন্দেই এই আয়োজন। সেখানে-ও নিশীথকে সত্যিকারের রসিক মনে হয় মিসেস রায়ের। প্রকৃত গুণীজন ছাড়া কি পরকে আনন্দ দিয়ে এত আনন্দ পায় কেউ? এদেশে নিশীথের স্বভাবের এইসব খামখেয়ালীপনা কেউ বুঝতে চায় না। কিন্তু ও দেশে এই ধরণের অনেক নজীর জানেন মিসেস রায়।

এইসব গল্প-কথার জালবুনে শ্রোতাকে চমকে দেন মিসেস্ রায়।

কিন্তু মনটা তাঁর খুব নিশ্চিন্ত নেই। আসলে নিশীথকে তাড়াতাড়ি গাঁথতে না পারলে মুস্কিলে পড়বেন তিনি। এলীর সঙ্গে নিশীথের ঘনিষ্ঠতার কথা জানাজানি হয়ে গিয়েছে সর্বত্র। তবু নিশীথ কোনমতেই

কথা দিচ্ছে না। মেয়ের বয়স ছাব্বিশ হলো। মেয়ের না আছে রূপ, না আছে যৌবন। ফর্সা রঙ, পাকানো চেহারা আর ডিগ্রী দেখে কি আর মনোমত বিয়ে দেওয়া যায়?

রুবির পার্টি নামেই কলকাতা শুদ্ধ মেয়েরা আসবে। কাকে চোখে লাগবে নিশীথের বলা যায় কী? তাই তিনিই জোর করে পার্টির ব্যবস্থা এখানে করেছেন। যাতে সবটুকু তাঁর চোখের সামনে থাকে। সবটুকু তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এলীকে বারবার বলেছেন আজ—

—সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থেকো। তোমার বন্ধুদের সকলকেই যে নিশীথ দেখেছে তা-তো নয়! ধরো ঐ বাসবী—

—বাসবীকে ভয় হবে আমার?

এলীর হাসিটা শুনলেন না মিসেস রায়। তাঁর যে কতজ্বালা তা তিনিই জানেন। বলেন

—বাসবী ঐ ন্যাকা ন্যাকা মিল্কমেইড গোছের চেহারা। তার ওপর অসিত মৈত্রের টাকা! বলো কি, বাসবী দেখতেও খারাপ নয়।

মাকে এত ব্যস্ত দেখে এলী পিঠে হাত দিয়ে আশ্বস্ত করলো। বললো

—কি বলো! নিশীথকে তুমি যা ভাবছ তা নয়! ও আমাকে কথা দিয়েছে।

—সেই কথাটা-ই তো আমি সকলকে জানাতে চাই। কথা দিয়েছে। কথা দিয়েছে কবে এনগেজমেণ্ট হতে পারে?

—না। বলেছে: পরে হবে। আর, বাসবীর সম্পর্কে তোমার ভয় করবার কোন মানে হয় না মা। নিশীথ ঐ রকম ভালমানুষ আর বোকা মেয়েদের দেখতে পারে না মোটে-ই। আমি জানি।

কিন্তু অলক্ষ্যে বিধাতার ইচ্ছে ছিলো অন্যরকম। তা-ই ঘটলো।

এলীর সাজগোজে ত্রুটি ছিলো না। রুবির আয়োজন আর মিসেস্ রায়ের ব্যবস্থাপনা ছিলো নিখুঁত। কিন্তু নিশীথের কিছু ভালো লাগল না। এমনি ধারা কোন জায়গায় এলেই মিসেস্ রায় আর এলী

যে তাকে কব্জা করবার চেষ্টা করেন, তাতেও সে বিরক্ত। ইদানীং আর একটা উপদ্রব স্মুরু করেছে এলী, তাকে বিয়ে করতে হবে। এলীকে বিয়ে? সকাল থেকে রাত অবধি এলী যে কি অজস্র বক্তে পারে ইংরেজীতে। ঐ অতখানি কিচমিচি আর নিরন্তন মিসেস্ রায়ের কর্তাগিরি সহ্য করা? অসম্ভব। নিশীথের কাঁধে ঝুঁকে পড়ে মুখের কাছে একটুকরো কেক্ ধরে সাধছিলো এলী

—খাও, ডার্লিং, খাও।

বিরক্ত লাগলো নিশীথের। এলীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এক হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভঙ্গীটা যে কত রূঢ় হলো, সেটা বুঝতে একমিনিট দাঁড়িয়ে-ও থাকলো না সে। দূরে, বড়ো একটা চীনে ঝাউ গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটী দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে তার চেহারা বা প্রসাধন এতই অন্য রকমের যে সহজেই চোখে পড়ে। ফর্সা রঙ, সুন্দর মুখ। মুখের ডৌল, চুলবাঁধবার ভঙ্গী, সবই যেন নরম। কমনীয়তা যেন গলে গলে পড়ছে। সবুজ সিল্কের শাড়ী পরণে। হাতে, গলায়, কানে সাধারণ আভরণ। বারবার ঘড়ি দেখছে হাতে, আর অধৈর্য হয়ে উঠছে যেন। কিন্তু যে কথা কইছে, তাকেই সামান্য স্মিত হাস্যে স্বীকার করছে। নিশীথের বেশ লাগলো। এখানে এমন মেয়ে? সে যেন ঠিক আশা করেনি। রুবি মল্লিকের নিমন্ত্রণে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে এ মেয়েটি যেন ব্যতিক্রম। এতখানি রং ঢং আর হাসি গল্পের মাঝখানে নিজের সহজ স্বাভাবিকতার জন্যেই যেন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে সে। এগিয়ে গেলো নিশীথ। একেবারে সামনে গিয়ে বললো

—আপনি কিছু খাচ্ছেন না। দেখেছি আমি। আসুন ঐ টেবিলটায় বসি।

ছোট একটি টেবিলে মুখোমুখি ব'সে ঝুঁকে পড়লো নিশীথ। বললো

—কি পরিমাণ কথা বলছে ওরা বলুন তো? এত কথা ভালোলাগে আপনার?

তারপর বাসবীর ইতস্তত ভাব দেখে সহসা স্মরণ করে হেসে বললো।

—নিজের পরিচয়-ই দিইনি, না? আমি নিশীথ তালুকদার। আপনি?

—বাসবী মৈত্র।

—আরকেউ এসেছেন এখানে? আপনার সঙ্গে?

—না তো!

তারপর বাসবী বলে

—আমি এসেছি চিত্রিতাদের সঙ্গে। চিত্রিতা আমার বন্ধু। ও বোধহয় এখনো কিছুক্ষণ থাকবে! আমি বাড়ী যেতে চাই।

নিশীথকে বাসবীর সঙ্গে কথা কইতে দেখে ভিভিয়ান এগিয়ে আসে চিত্রিতার সঙ্গে।

বলে—বাসবীর সঙ্গে আলাপ হলো নিশীথদা? অসিত মৈত্রের মেয়ে। চায়নাডল্-ও বলতে পারো। পালকে মুড়ে রেখে দিয়েছেন মৈত্র।

এত কথার জবাব দিতে পারে না বাসবী। একটু লাজুক বিব্রত হাসি হাসে। ভিভিয়ান বলে

—নিশীথদা, পার্টি খুব চলছে! চিত্রিতাকে নিয়ে আমি একটু পালাচ্ছি সকলকে ধোঁকা দিয়ে! তুমি একটু পৌঁছে দেবে বাসবীকে?

—নিশ্চয়, আনন্দের সঙ্গে।

নিশীথের সঙ্গে যাওয়া উচিত হবে কি না ভাবছিলো বাসবী কিন্তু ভিভিয়ান অনুনয়ের ভঙ্গীতে বললো—প্লাজ্ বাসবী!

বাসবী খানিকটা রেগেই রাজী হলো। আর কোনদিন এমন ধারা আসবেনা সে! চিত্রিতাকে পরে কি কি কথা শোনাবে, তা এখনই ভাবতে বসলো।

রুবি মল্লিকের কাছে যখন নিশীথ আর বাসবী একসঙ্গে বিদায় জানাতে এলো, দেখে সকলের চোখ-ই বড় বড় হলো। কি ব্যাপার?

রাগে ক্ষোভে মিসেস্ রায় কিছু বলতে পারলেন না। মুখে হাসলেন। কিন্তু মেয়েকে নিচু গলায় ঝড়ের মতো বকে গেলেন। বল্লেন—বোকামির একটা শেষ থাকা উচিত। কোন আক্কেলে তুমি ওর সঙ্গ ছেড়ে এমন দূরে দূরে ঘুরছিলে?

এলীকে আড়ালে ডেকে অনেকগুলো শপথ জানালো নিশীথ। হ্যাঁ, আজ রাতেই ফোন করবে সে। আজ রাতে ফোন করবে, কাল বিকেলে আসবে এলীর বাড়ীতে, সব করবে!

পাশাপাশি চলতে চলতে বাসবী চুরি করে দেখলো নিশীথকে। সুন্দর চেহারা। পাণ্ডুর গৌরবর্ণ রং। ফ্যাকাশে রং, আর ঘন কালো ভ্রূ। ঠোঁটটা বড়ই পাতলা। একেবারে সোজা ছুটো লাইন। সবশুদ্ধ এমন কোন আকর্ষণ আছে নিশীথের মধ্যে, যা প্রথম থেকেই চুম্বকের মতো টানলো বাসবীকে।

বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেবার অবিশ্যি দরকার হলো না। ইতিমধ্যেই বাসবীর মা গাড়ী পাঠিয়েছেন। গাড়ীতে তুলে দিয়ে নিশীথ বললো

—বাঙালী নিজস্বতা রেখেও যে ব্যবসা করতে পারে সেটা নতুন করে প্রমাণ করলেন আপনার বাবা। তাঁকে আমি যে কবে থেকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি! একদিন আলাপ করতে যাবো।

—নিশ্চয় আসবেন!

সে রাতে বাড়ী ফিরে বাসবীর বারবার নিশীথের কথা মনে হলো। কথা না ক'য়ে চুপ করে থাকলে কেমন যেন ভয় ভয় করে। কি যেন আছে ঐ ঠোঁটের ভঙ্গীতে। কিন্তু কথা কইলেই সে ভয় যায় কেটে।

নিশীথের ফ্যাকাশে মুখ আর কালো ভ্রূর কথা তুলে একদিন এলী তাকে নাটকীয় ভাবে বলে ছিল।

—That Pale face!

বাসবীর আজ মনে হলো, কথাটি সুন্দর তো! That Pale face my fate! নিজে একবার উচ্চারণও করলো। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথায় একটা শিহরণ অনুভব করলো বাসবী। ঐ ফ্যাকাশে মুখের কথাই বা তার মনে হলো কেন?

॥ ২ ॥

তারপর সুরু হলো সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। একজন শুধু আকর্ষণ করবে। আর একজন সকল জগৎ সংসার ভুলে কাছে আসবে। দুটি হৃদয়ের জোয়ার ভাঁটার সে কথা নিয়ে কবি হয় তো বলেন

'পঞ্ছী বাওরা—
চাঁদ সে প্রীত লগায়ে।'

তবে প্রেমের সে মাসুল দিতে গিয়ে মানুষের মন রক্তাক্ত হয়ে যায়। আর কাঁটার আঘাতে যদি বুলবুলের বুক থেকে রক্তক্ষরণ না-ই হলো, তো প্রেমের রক্তগোলাপ এমন সুরভিত হয়ে ফুটবে কি করে? সেই পুরনো খেলা। মৃগী এবং ব্যাধ। এ ক্ষেত্রে ব্যাধ ছিলো মৃগয়ায় পটু। আর মৃগী একেবারে অপাপবিদ্ধ। এ হরিণী মায়াবনে বিহার করে না। শায়কের সামনে বুক পেতে দেয়। তাই জয় সম্পূর্ণ করতে দেরী হলো না ব্যাধের।

সেই পার্টির পর থেকেই কখনো দেখা হলো নিউমার্কেটে, কখনো বন্ধুজনের বাড়ীতে। বাসবী নিশীথের জন্যে ছলনা করতেও শিখলো বাবা মা-কে! বাড়ী থেকে না বলে চলে যাওয়া, এখানে ওখানে দেখা করা, সব কিছুই সুরু হলো। নিশীথকে অতখানি বিশ্বাস কেমন করে করলো বাসবী! কেমন করে বিশ্বাস এলো তার? বলে বোঝাতে পারবে না সে কারুকে। কিন্তু সেই দিনের আকস্মিক পরিচয়ের পরই বাসবী অনুভব করেছে, এই মানুষটির সঙ্গে তার জীবনটা যেন বাঁধা। যেন এরমধ্যে অন্যকোন গভীর যোগসূত্র আছে। আর, নিশীথ একটি দিনের জন্যেও তাকে অসম্মান করেনি। পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে লঙ্ঘন করেনি সীমা। এটা তার খুব ভাল লেগেছে।

মৈত্রমশাই নিজে আপত্তি করলেন। বাসবীর স্বামী বলতে নিশীথের কথা তাঁর কোনদিন মনে আসেনি। তাঁর যা কিছু, সবই পাবে দুই মেয়ে। নিশীথের সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছেন তিনি

বাইরে। প্রশংসা এবং অপ্রশংসা। মেয়ের সম্পর্কে ভাবতে হবে তো তাঁকে? খোঁজ নেবেন কার কাছে?

কিন্তু নিশীথ সত্যই স্বনামধন্য পুরুষ। একটু বাজার ঘুরতেই তার সম্পর্কে নানারকম খবরাখবর বেরিয়ে পড়লো। বিশেষ ক'রে রমাপদ সোমের বোন, কনক মিত্রের বৌ ইভা মিত্রের ঘটনা শুনে রীতিমতো শঙ্কিত হলেন তিনি। বললেন স্বয়ং রমাপদ সোম।

কনক মিত্র আই. সি, এস, কুলে একজন রাঘববোয়াল বিশেষ। যখন যে জেলাতে থাকেন, সে জেলার বড় বড় ব্যবসায়ীদের পেঁচিয়ে ফেলবার অদ্ভুত কায়দা জানেন তিনি। তাঁর সঙ্গে লেনদেন করবার পর দ্বিতীয় পক্ষের অবস্থা হয় হস্তীভুক্ত কপিত্থের মতো। হাতীর সঙ্গে অবিশ্যি কনক মিত্রের কোন সাদৃশ্য নেই। বেঁটে, কালো, রোগা, ছটফটে মানুষ তিনি।

ইভা মিত্রের বিবাহিত জীবন সাত বছর ধরে দুর্বিষহ করে, স্ত্রী যখন ডিভোর্সের চেষ্টা করতে বাবার কাছে ফিরে গেলেন, তখন কনক মিত্র তিন বছরের ছেলের কাসটডি স্ত্রীকে না দেবার জন্যে ছেলেকে আটকে রাখলেন। মর্মাহত ইভামিত্র, ছেলের মুখচেয়ে তখন ফিরে যেতেও প্রস্তুত। কিন্তু কনক মিত্র বেঁকে-ই রইলেন। সোজা হলেন না। ছেলেকে রাখলেন নার্সের কাছে। স্ত্রী-র সঙ্গে দেখাই করতে দিলেন না।

এই সময়ে ইভা মিত্রের সঙ্গে নিশীথের পরিচয়। নিশীথের মতো কাজের একটি ছেলেকে পেয়ে ইভা মিত্রের উকীল ব্যারিস্টার ইত্যাদি ঝামেলা সামলাবার সুবিধা হলো। টাকা তাঁরও আছে। কিন্তু বাবা বৃদ্ধ। ভাই বিলেতে। তাঁর পাশে দাঁড়াবে কে? আশ্চর্য ক্ষমতায় নিশীথ তাঁর বিশ্বাস অর্জন করলো। বিশ্বাস করলেন তিনি নিশীথকে। সব কথা বললেন। তাঁর সঙ্গে নিশীথকে সে সময় সর্বদাই দেখেছে মানুষ। ইভা বলতেন— ও আমাব ছোট ভাই।

কিন্তু তবু কোন সুরাহা হয় না। শেষে রমাপদ সোম ফিরে এসে যখন খোঁজখবর সুরু করলেন, তিনি উদ্ঘাটিত করলেন এক জটিল

রহস্য। কনক মিত্রের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই হাজার দশ টাকা খেয়েছে নিশীথ, এবং ইভামিত্রের সঙ্গে ঘোরাফেরা করবার মধ্যে এক জঘন্য চক্রান্ত আছে। নিশীথের সঙ্গে ইভামিত্রের এই ঘনিষ্ঠতা আদালতে ইভামিত্রের দুশ্চরিত্রের-ই সাক্ষ্য দেবে। কনক মিত্রকে নিশীথ আরো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ইভামিত্রের সঙ্গে তার একসঙ্গে তোলা ছবি সে জোগান দেবে। দরকার হয় সাক্ষীও দেবে।

পাকা হাতে এইসব জট উপড়ে ফেললেন রমাপদ সোম। নিশীথকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। সময়মতো ইভামিত্র ছেলেকেও পেলেন ফিরে। কিন্তু নিশীথের সম্পর্কে তাঁর মন ভেঙে গেল।

এইসব কথা শুনলেন মৈত্রমশাই স্বয়ং রমাপদর কাছে। শুনে উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ী ফিরেলন। বললেন

—এমনি ভুঁইফোঁড়, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবনা মেয়ের। কি তার পরিচয়? টাকা থাকলেই সব হলো?

বাসবী তখন বাবাকে অনুরোধ করলো—একবার নিশীথের সঙ্গে তুমি নিজে কথা বলে দেখ। তোমাদের সম্মতি না পেলে আমি কেমন করে বিয়ে করবো বল? শুধু লোকের মুখে শুনে তুমি তার সম্পর্কে একটা ধারণা মনে গড়ে তুলো না। আর আমি কি একেবারে তাকে চিনিনি? সবটাই ভুল করেছি? মেয়ের কথা শুনে মৈত্র ভাবলেন ভাল করে। তারপর বললেন—তাকে বাড়ীতে নিয়ে এসো একদিন। এত ক্ষোভ বিক্ষোভের পর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলো নিশীথ। বাসবী তাকে বাবার কথা বলে অসহায় বড় বড় চোখে বলেছিলো—তুমি বাবার সঙ্গে আলাপই তো কবলে না ভাল করে? বাবাকে বলো। চলো তুমি আর আমি বলি, বাবা ঠিক মত দেবেন।

নিশীথকে চাক্ষুষ দেখে কিন্তু মৈত্রমশাই বিভ্রান্ত হলেন। এই ছেলের মন এত নোংরা? এরই সম্পর্কে জঘন্য সব কথা বললো রমাপদ? কেমন করে হয়? কি বিনীত, আত্মভোলা, সরল ছেলেটি? কেমন

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। বাসবীর মা-কে দেখে তার চোখ ছলছলিয়ে এলো।

—কবে মা মারা গিয়েছেন, এমন করে আর কারুকে দেখে মা-র কথা মনে হয়নি আমার।

বাসবীর মা-র মন তো এক নিমেষেই গললো। মৈত্রমশাই-ও কথা কইতে কইতে বারবার দেখতে লাগলেন। কই হিসেবে মিলছে না তো।

নিজের সম্পর্কে-ও যা বললো সে তাতে মনে হলো এ ছেলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে জানে। কত কষ্ট ক'রে কত উপবাস ক'রে, তবে যে লেখাপড়া শিখেছে নিশীথ, শুনে মৈত্রমশাই মুগ্ধ হলেন। পরের বাড়ীতে দুটি ভাতের জন্য বসে থাকা, মাইনের জন্য সেই জ্ঞাতি কাকার বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা—কি কঠোর অধ্যবসায়!

নিশীথ বলে।

—আমার চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য যে বাবা-র আশীর্বাদ আমি পাইনি। বাবা-ও আমার কষ্টটুকুই দেখে গিয়েছেন। তারপর আমি যে দাঁড়াতে পেরেছি জীবনে—সেটা আর দেখে যাননি তিনি।···আমি বলছি আপনাকে, আপনার আশীর্বাদ না পেলে বাসবীকে আমি নিরস্ত করবো। কেন না বাপ মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কেউ জীবনে সফল হয় না। আর, যদি আশীর্বাদ-ই করেন, তবে এ-ও বলবো, কিছু চাইনা আমি। শুধু বাসবীকে-ই চাই।

এবার সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করতে মনটা প্রস্তুত হলো। তবু গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। কথাবার্ত্তা কয়ে নেওয়া ভালো। সবটা তো আর দেখতে পায় না মানুষ। ঐ যতটা দেখা যায়! মৈত্র মশাই একদিন ডাকলেন নিশীথকে। বললেন

—রমাপদ সোম-কে তুমি চেন?

—একদিন বড়দা বলেছি। তাঁর বোনকে আমি দিদি বলতাম।

বলে কিছুক্ষণ বেদনাহত মুখে চুপ করে রইলো নশীথ। তারপর বললো

—যখন তুললেন কথা, সবই আমি বলবো। কিন্তু বড় দুঃখের স্মৃতি। আর, দিদি যা ভুল করেছিলেন! তার জন্যে আমি কোনদিন দোষ দিইনি তাঁকে, তবে সব কথা বললে মিসেস মিত্র, অর্থাৎ ইভাদি ও খানিকটা হেয় হয়ে যাবেন সেই জন্যেই চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছি আমি। অবশ্য খানিকটা কাদাও মাখতে হয়েছে আমাকে, কি করবো। একজন ভদ্রমহিলার সম্মান তো আমার রাখা উচিত।

আর শুনতে চান না মৈত্রমশাই। পরের ঘরের কুৎসা শোনবার আগ্রহ নেই তাঁর। নিজের ঘর ঠিক থাকলেই হলো। তিনি শশব্যস্তে বলেন।

না, না, থাক।

আসলে তিনি ত' তখনই বুঝেছেন! একহাতে কিছু তালি বাজে না। ইভামিত্রের কোন দোষই ছিলো না, তাকে অমনিই ডিভোর্স করতে চাইলেন কনকমিত্র? তা কখনো হয়? আর নিশীথকে দেখে তিনি বেশ বুঝতে পারছেন এ সব ছেলেরা পরের জন্যে সব কষ্টই সহ্য করে হাসিমুখে। এরা সব অন্যজাতির ছেলে। নিশীথের জাদুমন্ত্রে তিনি-ও সম্মোহিত। তাই মনে হলো অনেক ভালো ভালো কথা। আদর্শবাদের কথা। আবেগে তিনি নিশীথের পিঠে চাপড় মারলেন আস্তে আস্তে। বললেন

—Carry on, my boy. Carry on undaunted.

মৈত্রমশায় নিজে সম্মতির কথা জানাতে গেলেন স্ত্রী-কে। বাসবী আর নিশীথ দু'জনে হাতধরে এসে প্রণাম করলো তাঁদের। স্নেহান্ধ পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ের আশীর্বাদ অজস্রধারে অভিষিক্ত করলো তাদের।

বিয়ের দিন ঘোষণা করা হলো স্টেট্‌সম্যান কাগজের কোণায় ব্যক্তিগত খবরাখবরের মধ্যে।

॥ ৩ ॥

মিসেস্‌মিত্রের ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক মিটলোনা। বিয়ের ক-দিন আগে বাসবী ছোট্ট মালবীকে নিয়ে গিয়েছে সাহেব পাড়ায়। দুপুর বেলা। পার্কষ্ট্রীটের কোণায় বসেছে এক সাহেবী চা-এর দোকানে।

সহসা চোখে পড়লো বাসবীর, কোণের দিকের টেবিলে বসে এক মহিলা নিশীথের সঙ্গে কথা কইছেন। সুন্দরী ছিলেন হয়তো একদা। এখন দুঃখের রেখায় বিষাদ মলিন চেহারা। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে। কালোপাড় গরদের শাড়ী পরণে। মাথায় ঘোমটা দুটি সোনার পিনে আটকানো। দু'জনে খুব তর্ক হচ্ছে বলে মনে হলো। মহিলা খুব জোরে কথা কইছেন। নিশীথ বাসবীর দিকে পিছু ফিরে বসে আছে। সে যেন মহিলাকে থামাতে চাইছে। চুপ করাতে চাইছে। মহিলা শুনছেন না। উত্তেজনায় গলা যখনি চ'ড়ে যাচ্ছে, তখনি তাঁর হাত ধরে থামাতে চাইছে নিশীথ। সে হাত ঝটকা দিয়ে ফেলে দিচ্ছেন মহিলা। আবার কথা বলছেন।

বাসবী এগিয়ে গেল। নিশীথ তাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে কি রকম চমকে যাবে তাই ভেবে মজা লাগছিলো তার। কিন্তু তাকে দেখেই নিশীথের মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। গলার সুরটা বিরক্তির ধার ঘেঁসে গেল প্রায়। বললো

—তুমি!

—বা রে, তোমাকে দেখেই তো উঠে এলাম।

—আমাকে দেখে? কতক্ষণ এসেছো?

—তা, দশ মিনিট তো বটেই!

কেমন যেন বোধ হলো বাসবীর, সে দোষ করেছে। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো অল্প অল্প, সে বললো

—নিশীথ, তুমি বিশ্বাস করো, আমি জানতামনা তোমরা কোন কাজের কথা বলছো। আমি যাচ্ছি, বুঝলে?

জবাব নেই নিশীথের মুখে। কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন মহিলা। বললেন

—এই বাসবী? এত ছেলেমানুষ? ইস্!

যেন করুণা হয়েছে তাঁর। মমতা হয়েছে। তারপরই মিনতিতে তিনি বললেন তীব্র, তীক্ষ্ণ, কণ্ঠে

—এ কাজ ক'রোনা নিশীথ! ছি ছি—এমন কাজ ক'রো না। এই মেয়ে?

মুখ ঢেকে, প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি। বিভ্রান্ত বাসবী তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। কি হলো? কি ব্যাপার?

ঘরশুদ্ধ লোক কৌতূহলে তাদের দিকে তাকাচ্ছে।

—চলো বাসবী, বলছি সব।

বলে তাকে ঠেলে বেরিয়ে এলো নিশীথ। বাসবী নিয়ে এলো মালবীকে। গাড়ীতে উঠে আবার সপ্রশ্ন চোখে তাকালো বাসবী। নিশীথ ড্রাইভারকে বললো

—চলো গড়ের মাঠে!

বিকেলের রোদে বাঁকা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে গাছ গুলো। তার নিচের বেঞ্চে বসলো দু'জনে। নিশীথ সিগারেটটা টেনে ধাতস্থ হয়ে নিলো আগে। তারপর বললো

—সব বলছি বাসবী। তোমাকে বলব না তো কাকে বলবো? আমার জীবনের সে সব দিনগুলোর কথা তো জানোনা বাসবী। সহায় নেই, সম্বল নেই, কলকাতার শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই সময়ে ইভামিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন কনকমিত্রের সঙ্গে তাঁর চূড়ান্ত মনোমালিন্য চলেছে। ছেলের কাস্টডি হারাতে বসেছেন মিসেস মিত্র। কেস চলেছে তখন। নিজের জীবনের অশান্তির জন্যেই হোক বা যে জন্যেই হোক, আমাকে আঁকড়ে ধরলেন মিসেস মিত্র। শুধু তো টাকা থাকলেই হয়না বাসবী! পাশে চাই একটা বিশ্বাসী প্রাণ। আমার মনে সমবেদনা আর শ্রদ্ধা দুই-ই ছিলো। তাঁর বিশ্বাসের বদলে ঢেলে দিলাম আমার

প্রাণ-পণ শক্তি। কিন্তু তাঁর মনেই ছিলো পাপ। আমি তো তা জানতাম না।

বাসবীর মনটা নিশীথের জন্যে দুঃখে আকুল হয়। বলে—

—আরো বলো!

নিশীথ আস্তে আস্তে বলে

—এই কথাটাই সেদিন বলতে পারিনি তোমার বাবাকে। আমি তাঁকে তো বোন ছাড়া কিছু ভাবিনি। আর তিনিই……

অবাক হয়ে বাসবী তাকিয়ে থাকে। বাইরেটা দেখে সত্যিই চেনা যায়না মানুষকে। এই মাত্র যে মহিলাকে দেখলো, যাঁর বাইরেটা অমন শ্রদ্ধা জাগায় মনে—তাঁর ভেতরটা অমনি? নিশীথের হাতে মৃদু চাপ দেয় শুধু বাসবী। নিশীথ বলে

—তারপরে আর সম্ভব হলো না। সরে এলাম আমি। সেই আক্রোশে কত কলঙ্কই যে রটালেন মিসেস মিত্র! আমি না কি তাঁর টাকা আত্মসাৎ করেছি, আরো কতো কি…

—আজ কেন এসেছিলেন?

—সেইসব পুরোন মিথ্যের জের টানতে চান। তোমাকে বিয়ে করে যে আমি সুখী হব, তাতে বাধা দিতে চান।

—কি সাজ্ঘাতিক কথা! তুমি কি বললে?

—তাঁর সে সব অভিযোগ মোটেই কানে নিলাম না। অবশ্য শক্ত কথা বলতে হলো দুটো একটা।

বিকেলের রাঙারোদ্দুরে গাছগুলোর ছায়া আগেই হেলেছিলো। এখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চূড়ায় এতটুকু রাঙা রোদ লেগে আছে। রেডরোড আর অন্য চারিদিক থেকে সন্ধ্যা আসছে আস্তে আস্তে। ময়দানের সবুজ রং এখন কেমন ক্লান্ত ধূসর। গলাতে ক্লান্তি। নিশীথ আস্তে বলে।

—বলো বাসবী বলো আর কোন সংশয় নেই?

—না। তোমাকে অবিশ্বাস করবো?

কিছুক্ষণ বাদে বাসবী বলে

—এবার চলো ফেরা যাক!

দু'জনে চলতে থাকে গাড়ীর দিকে।

মিসেস মিত্র যে কতো সাঙ্ঘাতিক মহিলা তা বাসবী আবার টের পেলো। তার বাবার কাছে-ও না কি ফোন করেছিলেন মহিলা। জানিয়েছিলেন, যে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এই বলে—নিশীথকে বিয়ে করলে সুখী হবেনা বাসবী। তিনি মিনতি করে বলেন—দাদার কাছে আপনি সবই শুনেছেন তো? নিশীথের সঙ্গে মেয়েকে কেন বিয়ে দেবেন? আপনার মেয়েকে আমি দেখেছি সে দিন। নিষ্পাপ—ছোট্ট একটি মেয়ে। আমার ছোট বোনটি থাকলে ওরই মতো বড় হতো এতদিনে। আমার কথা আমি ছেড়েই দিচ্ছি। কিন্তু নিশীথের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া তো আপনার কর্তব্য!

ভবিতব্য তখন একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। মৈত্রমশাই-এর কানে সে সব কথা ভালো লাগবে কেন? ইতিমধ্যেই বাসবী আর নিশীথ তাঁকে মিসেস মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলেছে। মৈত্র মশাই আশ্চর্য হয়ে যান। তার পরে-ও মিসেস মিত্রের এ রকম ফোন করবার সাহস হলো? তিনি স্ত্রী-কে বলেন

—দেখছো কি রকম Vindictive স্বভাব? নিজে তো সুখী হবেই না, অন্যের জীবন-ও তছ্‌নছ্‌ করে দিতে চাইবে।

বিয়ের আয়োজনে যেমন মৈত্র মশাইয়ের বাড়ীটা গুণ্‌গুণ্‌ ক'রে উঠলো, বাসবীর মনের খুসী তার বাধা মানেনা। এ হলো সেই একটুকু ছোঁয়া লাগা আর এতটুকু কথা শোনার অবস্থা। কিছু পলাশের নেশা আর চাঁপায় মেশানো রঙীন মাতাল মন। কথা কইতে গেলে কথা হাসি হয়ে যায়। হাসতে গেলে গলায় নামে গান। এতদিন সরস্বতীর মতো কৌমার্য ছিলো বাসবীর রূপে। এখন তাতেই রঙ লাগলো। ভরে উঠলো পেয়ালা। সহসা আপন খুশীতে রামধনু ছিটিয়ে দেওয়া এক ঝর্ণার মতোই বাসবী ভরে উঠে ছড়িয়ে পড়লো। চলতে, উঠতে নামতে, পায়ে এসে যায় প্রজাপতির চপলতা। বাসবীর

দুই চোখ ভ'রে শুধু নিশীথ আর নিশীথ। ভোর হ'লেই ফোনটা বেজে ওঠে। বেজে ওঠে নিশীথের ভারী গলায়—ভাল আছো? সুপ্রভাত। ঘুম হয়েছিলো?

তারপর কতকগুলি কথা শুধু মনের খুসীতে সৃষ্টি করে যাওয়া। তারা যেন সুর সপ্তকের স্বরগ্রাম। ভালো আছি। কেন কাল এলে না? ঘুম হবে কি ক'রে? সারারাত যদি মন খারাপ হয়ে থাকে? আজকে তো আসছো? নিশ্চয়। বাঃ খুব লোক! কথা দিয়ে কথা রাখছো না। কি কথা? বলবে?

এইরকম। তারপরে সুন্দর করে স্নান করা' সাজগোজ করা, মালবীর সঙ্গে বাগানে বসে চা খাওয়া—এমনি সব হাল্কা আনন্দ! বাসবী ছিলো অপরিণত, সুকুমার। প্রেমের স্পর্শে তার যৌবন হলো সচেতন। নানা রঙে ভরপুর, নিটোল, রসে ও লাবণ্যে উচ্ছল।

বাড়ীতে দর্জি বসিয়েছেন বাসবীর মা। যুদ্ধের সময়। বাজারে কি পাবেন না পাবেন, সে ভরসায় না থেকে, অনেকদিন ধরেই তিনি বাসবীর জন্যে কিনতে সুরু করেছিলেন কাপড় চোপড়। নানারঙের বেনারসী, ঢাকার থেকে খাস ঢাকাই, সবুজ, সমুদ্র-নীল, ঘাসী-সবুজ, পলাশ-লাল, কবুতরের চোখের মতো ঝিলমিলে গোলাপী, এমনি নানা-রঙের কাপড়ের টুকরো। এখন মেটিয়াবুরুজ থেকে পুরোনো আতিফ খলিফা তার ছেলেকে নিয়ে এলো। সেলাইয়ের কল নিয়ে বসে গেল ঢাকা বারন্দায়। স্যাকরাকে নিয়ে মিসেস মৈত্র পাথর খুঁজতে বেরুলেন। পায়ের মাপ নিয়ে পুরোন চীনে কারিগর জুতো বানাতে সুরু করলো। তামা আর রুপোর বাসনপত্র মাজাঘসা হচ্ছে, দরজা জানলায় রং পড়ছে। ঝি চাকরদের জন্যে নতুন কাপড় আসছে। সারা বাড়ীটা-ই উৎসরের সুরে গুঞ্জরিত। বিচ্ছেদের দিন আসন্ন হয়ে আসছে।

পুরনো মাসিকপত্র ছড়িয়ে তার মধ্যে বসে বাসবী এটা সেটা দেখ-ছিলো গুছিয়ে রাখবার নামে। হঠাৎ সবিতা এলো। খুব খুসী হয়ে উঠে বসলো বাসবী। সবিতা তার প্রাণের বন্ধু। বি. এ. পাশ করে-ই

অবশ্য বি. টি. পড়তে গিয়েছিলো সে। সংসারের জন্যে কাজ করবার প্রয়োজন ছিলো সবিতার। কালো রং, সুন্দর স্বাস্থ্য, কাজের মেয়ে সবিতা বসু। এই বিয়ের ঠিকঠাক হবার পর থেকে বাসবীর অন্যান্য বন্ধুরা তাকে প্রায় পরিত্যাগ করছে বললে-ও হয়। সবিতা ছিলো চন্দননগর স্কুলে। খবর পেয়েই সে আসছে।

কিন্তু সবিতাও যেন কেমন আড়ষ্ট। কেমন অসহজ বোধ করছে। বাসবীর মা বলেন

—কথাবার্ত্তা পরে কইবে। আগে আমি একটু মিষ্টি আর সরবৎ ক'রে আনি।

—একটু তাড়াতাড়ি কিন্তু মাসীমা, আধঘণ্টা বাদে আমাকে উঠতে হবে।

—ইস্, স্কুলে ফোন করে দিচ্ছি। তুই আজ যাবি না!

বাসবী বা তার মা-র ব্যবহারে সবিতা যেন আরো বিব্রত হলো। শশব্যস্তে বললো

—না বাসবী, আমাদের সুপার অসুস্থ। তা ছাড়া আমি কথা দিয়ে এসেছি। আমি ফিরবোই।

মা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যেতেই বাসবী বললো—কি ব্যাপার বল্‌তো?

সবিতা বলে—বাসবী, শুনলাম তুই না কি নিশীথ তালুকদারকে বিয়ে করছিস্?

—হ্যাঁ।

—তুই তাকে কতদিন ধরে জানিস্ বাসবী?

—জবাব দিহি করতে হবে? কৈফিয়ৎ দিতে বলছিস?

—চটে যাস্‌না বাসবী। আমি তোর একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী না হলে এমন করে ছুটে আসি? তুই জানিস্‌না, আমার মাসতুতো দিদির জীবনটা সে কি ক'রে নষ্ট করেছে।

—কি নাম তোর দিদির?

—ইভামিত্র।

বাসবী বললো—ইভামিত্র সম্পর্কে একটা কথাও শুনতে চাইনা সবিতা। অতই সহজে কোনো মহিলার সম্পর্কে বদনাম রটাতে পারে না। ভদ্রমহিলার নিশ্চয় দোষ ছিলো। তাঁর চরিত্র···

অবাক হয়ে চেয়ে রইলো সবিতা কিছুক্ষণ। বললো

—তাঁর কথা তবে থাক। কিন্তু এলী রায়ের কথা-ও কি ভাববিনা? তোর সঙ্গে পরিচয়ের আগে ও এলীর সঙ্গে কতদূর ঘনিষ্ঠ হয়েছিল তা জানিস? সবাই জানত এলির সঙ্গে-ই ওর বিয়ে হবে। এলীর এখন যে অবস্থা—

—নিশীথ বলেছে এলীর মতো যে সব মেয়ে অতি সহজে ঘনিষ্ঠ হতে পারে তাদের ও শ্রদ্ধা করতে পারে না।

বাসবীর এই আশ্চর্য বিশ্বস্ততা দেখে অবাক হলো সবিতা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলো। বললো—বাসবী, তোকে নিশীথ নিশ্চয় জাদু করেছে।

—তুই এত কথা বলছিস সবিতা, তুই তো তাকে চিনিসনা?

—জানি বাসবী, একদিন নিশ্চয় জানতাম। শিলিগুড়িতে আমার ছাত্র জীবনের অনেকটা কেটেছে। নিশীথকে জানি, তার মানুষকে বশ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে, তা-ও আমি জানি। সে আমার অপরিচিত নয়।

—নিশীথকে চিনিস তুই?

—তার কি সে কথা মনে পড়বে? আর আমার কথা সে মনে রেখেছে কিনা জানিনা—আমার দিদি ললিতার কথা তার মনে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সে সব কথা থাক। আমি আর কিছু কইবনা বাসবী। তুই সুখী হ'।

—বিয়েতে তুই আসবি না?

—বিয়েতে?···করুণা ও দুঃখ মেশানো একটা হাসি ফুটে উঠলো সবিতার মুখে। বললো—বিয়েতে তার পূর্ব পরিচিত-দের দেখলে সে খুব খুসী হবে কি? আমার তা মনে হয় না।

চলে গেল সবিতা। কেমন যেন একটা মলিন ছায়া রেখে গেল

ঘরে। ঘরের পরিবেশ যেন ভারী হয়ে রইলো। ভালো লাগল না বাসবীর। রেডিওটা খুলে দিয়ে সোফায় ডুবে গিয়ে ভাবতে লাগলো। কেন এতজন এত কথা বলছে নিশীথের নামে? নিশীথের উদার সুন্দর মুখ, আত্মভোলা হাসি, এই যখন মনে পড়লো, তখন আবার মনে হলো যে মানুষ এমন বিচারে ভুল করে কেন? ঐ মানুষটাকে একপলক দেখেই তো বোঝা যায় কত সরল, কত স্নেহভালবাসার কাঙাল ঐ নিশীথ। তাকে এতদিন ধরে দেখেও কি বিশ্বাস করতে পারলো না সবিতা? ইলামিত্রর কথা বলতে এলো তার কাছে?

বাসবী পরিষ্কার বোঝে সবিতাও বদলে গিয়েছে। দুঃখ হয় তার। মনে হয় বন্ধুত্বের বুনিয়াদ এত পলকা ছিলো! এমন স্বল্প আঘাতে-ই ভেঙে ভেঙে পড়ছে?

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। নিশীথ এসেছে। বাসবী সত্যিই চমকে গিয়েছে। কৌতুকে চোখের কোণ কুঁচকে হাসছে দাঁড়িয়ে।

বাসবীর বাবা মা-ও ঢোকেন। বসবীর অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আসতে থাকেন। জমে ওঠে আসর। অনেক কথার মাঝখানে বাসবী নিচু গলায় বলে নিশীথকে…

—সবিতা এসেছিলো। শিলিগুড়ির সবিতা বসু। বললো তোমায় জানে। মনে আছে?

—মনে থাকবে না? কত যে নারকেল নাড়ু আর আচার খাইয়েছেন ওর মা! থাকতে বললে না কন? কতদিন দেখিনি তাকে।

সহজ সুর নিশীথের গলায়। অবাক বাসবী চেয়ে থাকে। বলে—কেন বলো ত, এত মানুষ এত কথা বলে বিয়েতে বিঘ্ন ঘটাতে চাইছে?

—হিংসে। তুমি বুঝবে না। নিশীথ বাসবীর চুলটা নিয়ে খেলা করতে থাকে।

—সবিতার দিদি ললিতাকে-ও না কি জানতে তুমি?

—জানবো না? চমৎকার গান গাইতো যে! শিলিগুড়িতে যে জলসা হতো, যা হতো, আমরা যেতাম ললিতাকে নিয়ে। অথচ দুঃখের কথা কি জানো!

—কি ?

—সেই ললিতা আত্মহত্যা করলো। ওদের পরিবেশটাই ঐরকম। একটু 'মেলান' কোলিয়া ঘেঁষা। সবিতাও ছিলো একটু!

বাসবী যেন এতক্ষণে বুঝতে পারে সবিতাকে! বলে—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

বিয়েতে বাসবীর বন্ধুরা অনেকেই এলোনা—সবিতা, এলী, সুপ্রিয়া। আবার অনেকে এলো –যাদের সঙ্গে নেহাৎ-ই হাল্কা বন্ধুত্ব-রমোলা, শ্রী, সুনন্দা। কে এলো না সে কথা উৎসবের দিনে মনেই রইলো না কারু। অসিত মৈত্রের উঁচু পাঁচিল ঘেরা সুন্দর বাড়ীখানা সরগরম হলো। যুদ্ধের বাজার। অতিথি নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি। আইন বাঁচিয়ে সাতদিন ধরে প্রত্যহ ভোজ হলো। বিয়ের দিন শুধু চা, পানীয়, হাল্কা খাবার। নিচের হল-এ সিনেমা দেখান হলো। বিখ্যাত এক সানাই-বাদক সানাই বাজিয়ে গেলেন।

এ বিয়েতে প্রণামী নমস্কারী বা ননদপুঁটুলীর মামুলি চিরাচরিত দানসামগ্রীর লেনদেন হলো না। জামাই মেয়েকে দু'খানা চেক যৌতুক করলেন মৈত্র। তার ওপর বরসজ্জা ও কন্যাসজ্জা তো আছেই।

বিয়ের রাতে অবিশ্যি ছোটখাটো অঘটন ঘটলো! বাসর ঘরের বরণডালার বাতি নিভে গিয়েছিল প্রদীপের কোলপুড়ে। জোড়ে বাসরে ঢোকবার সময়ে কেমন করে চেলির আঁচলের গিঁঠ খুলে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে মন খুঁৎ খুঁৎ করলো এক বাসবীর মায়ের। আবার গ্রন্থি পড়লো। প্রদীপ জ্বললো মোটা সলতেয়। সবাই হেসে বললো—মঙ্গল আর অমঙ্গল হলো সংস্কার। এমন সুখের বাসরকে রীতকরণ দিয়ে বাঁধতে নেই।

॥ ৪ ॥

বিয়ের পর নিশীথ আর বাসবী বেরিয়ে পড়ে গাড়ী নিয়ে জি, টি, রোড ধরে। দিল্লী পর্যন্ত। এতদিন পর্যন্ত বাসবীর জীবনটা ছিলো নিস্তরংগ। অনেক ঘটনার চঞ্চল তরঙ্গে সে জীবনে আলোড়ন জাগেনি। নিশীথ সে জীবনে আনলো গতির নেশা। নিশীথের চেনাপরিচিতের পরিধিটা-ও এতখানি বিস্তৃত, দেখে অবাক হলো বাসবী। এ্যালেন রোডের একান্তে সাহেব পাড়ার ছোট্ট একখানা রেসিডেন্‌শিয়াল হোটেলে তারা উঠল। মালিক ভদ্রলোক নিশীথের বন্ধু। মালকিন ফরাসী ললনা। তাঁর সঙ্গেও নিশীথ কম ঘনিষ্ঠ বলে বোধ হলো না। এই সুদূরে এসে-ও নিশীথের পরিচিত মুখ বেরিয়ে পড়লো।

ইম্পিরিয়াল হোটেলে এক নৈশডিনার। বাসবী আর নিশীথ ব'সে আছে। বাসবী উৎসুক হয়ে দেখছে আর গল্প করছে। হঠাৎ চোখে পড়লো দূরে, দেয়ালের আয়নায় একখানা মুখ লক্ষ্য করছে তাদের। নিশীথের দিকেই চেয়ে রয়েছে সেই মুখ। এতদূর থেকে-ও বাসবীর বুঝতে অসুবিধা হলো না যে সে মুখ লম্বা, অত্যন্ত ফসা, আর ঘন কালো চুল আর ভুরু আরো স্পষ্ট করেছে সেই ফর্সা রঙ। মুখখানা দেখে সে যেমন পেছন ফিরেছে, অবাক হয়ে দেখে ভদ্রলোকের পাশে একজন মহিলা। দু'জনেই কানাকানি করলেন নিজেদের মধ্যে। আর হঠাৎ নিশীথ বললো

—আরে! ..

নিশীথের পরিচিত জন কেউ হবেন। নিশীথ উঠলো চেয়ার ঠেলে। তাঁদের দিকে এগিয়ে যাবে—সহসা সেই মহিলা অস্ফুটে কি বলে ভদ্রলোকের হাত ধরে টেনে বেরিয়ে গেলেন। চেয়ার টেবিল ঠেলে দশজনকে বিব্রত ক'রে। ব্যাপারটা সকলকেই আশ্চর্য্য করলো। সকলেই চাইছে কৌতুকভরে। নিশীথের অবস্থাই হলো মর্মান্তিক। হঠাৎ নিশীথের মুখ লাল হয়ে গেলো। সে ডাকলো বাসবীকে।

নিশীথের লজ্জা বাসবীকে-ও স্পর্শ করেছে বৈ কি? সে উঠে গেল বাধ্য মেয়ের মতো।

বেরিয়ে এসে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে বাসবী দেখে নিশীথের আঙুল-গুলো কাঁপছে। বাসবী বললো—কি হলো বল তো! বুঝতেই পারলাম না।

—স্কাউণ্ড্রেল একটা

—কে? কি বলছো তুমি?

—ঐ চ্যাটার্জি। আবার কে? ভেবেছে এমনি করেই আমার মুখবন্ধ করতে পারবে?

কিছুই না বুঝে বাসবী চুপ করে রইলো। নিশীথ বললো

—কবে কি হয়েছে, তাই মনে ক'রে বসে আছে?

বাসবীর কাছে সবটাই কুহেলী। দুর্বোধ্য। নিশীথ বলে

—এর শোধ আমি ঠিকই নেব! দেখো! তোমাকে অপমান করবে আর চুপ করে থাকবো আমি?

—আমাকে অপমান করলো কোথায়?

—বা, আমাকে অপমান করা মানেই তো তোমায় অপমান। তাই না?

এই কথাতে বাসবীর মনের মেঘ নিমিষেই কেটে যাওয়া উচিত ছিলো। তবু যেন কাটলো না মেঘ। মনের একটা কোণা যেন ধোঁয়াটে হয়েই রইলো। মহিলার পাংশু মুখখানা মনে রইলো। আর মনে রইলো ভদ্রলোকটির আশ্চর্য ফর্সা মুখের ডানদিকে লাল একটা জড়ুল।

তারপরে ব্যারাকপুরে মিড্‌ল রোডে বাংলো বাড়ীটায় নতুন জীবন সুরু। একতলা বাড়ী, টালির ছাদ নিচু হয়ে নেমেছে। প্যাগোডা চঙে। বাংলো ঘিরে দেবদারু গাছের সারি। ছোট একটি লিলি পণ্ড্। বড় বড় ঘর। ড্রয়িংরুম ডাইনিংরুম মাঝখানে রেখে দুই পাশে তিনখানা তিনখানা ছ'খানা ঘর। পূবদিকের ঘর তিনখানাই অতিথিদের মতো খাট টেবিল চেয়ারে সাজানো। নানারকম লাইট, গ্রামোফোন, অজস্র

চেয়ার, কাঁচের গেলাস অজস্র। একসঙ্গে কতজন অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নিশীথ? ভেবে পেলো না বাসবী। ধূলোভরা গাড়ীটা থেকে নেমে-ই বাইরের ঘরে ডিভানে গড়িয়ে পড়লো নিশীথ আর বিব্রত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বাসবী। নিজেরই জায়গা। তবু যে সে নতুন মানুষ? পুরোন মানুষ কেউ হাত ধরে পরিচয় করিয়ে না দেয় যদি, তাই বা নতুন বাড়ীটার সঙ্গে পরিচয় হয় কি করে?

তাকে বিব্রত দেখে এগিয়ে এলো শঙ্কর। পায়ে হাত দিয়ে গড় করে প্রণাম করলো। বললো

—আসুন মা, আপনার ঘরে নিয়ে যাই।

ঘরে ঢুকতেই আলো জ্বলে উঠলো। হেসে উঠলো ঘর। চিকণ পাটির নক্সায় দেয়াল ঢাকা। জাপানী নক্সার হাল্‌কা আসবাব ঘরে ছেটানো। মনিপুরের বিচিত্রিত ঢাকনায় নতুন বিছানা ঢাকা। শাদা ঝকঝকে দেয়াল, ঘাসী-সবুজ পর্দা দরজা জানালায়। এততে-ও যদি বা রঙের কিছু অভাব ছিলো—নিশীথ এক টুকরি ফুল নিয়ে ঢুকলো। সৌরভ আর রঙে ভ'রে উঠলো সবটুকু ফাঁক।

ড্রয়িংরুম, ডাইনিংরুম, ড্রেসিংরুম—ঘুরে ঘুরে বাসবীকে সব দেখালো নিশীথ। আগে আগে নিশীথকে মনে হতো খেয়ালী, অন্যমনস্ক। কিন্তু তাকে এমন পাকা সংসারী দেখে বাসবী যেন একটু নিরাশ হলো। বইয়ের শো'কেসে বাংলা ইংরেজী বই সাজানো।

এতো থাকতে-ও সে বাড়ীটার কোথাও যেন অশরীরি একটা কালোছায়া রয়েছে। প্রথম রাতে-ই বাসবী তার উপস্থিতি অনুভব করলো। শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘুম ভাঙলো কোন একটা অজানা আতঙ্কের মধ্যে। কেন, কি তার কারণ, কিছু বলতে পারবে না বাসবী—সহসা তার মনে হলো সে যদি চলে যায় এই সব ছেড়ে, তাহ'লেই শুভ হবে তার। সুষুপ্ত নিশীথের সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে সহসা তার মনে হলো এই মানুষটাকে কতটুকু জানে সে? সামান্য পরিচয়ে কি প্রতিশ্রুতি পেলো সে যে আজীবনের মতো জড়ালো নিজেকে? কেন, কোথা থেকে পেলো সেই ভরসা?

বহু বছর বাদে-ও সেই রাতের কথা মনে হয়েছে বাসবীর। মনে হয়েছে সেদিন মনের সেই নির্দেশ মানতো সে! যদি চলে যেতো মা-র কাছে সকালেই! তাহ'লে হয়তো এত জটিলতার সৃষ্টি হতো না কোনদিনই।

ক'দিন বাদেই বাড়ীর ঘরে ঘরে বাতি জ্বললো। ক্লাব থেকে বেয়ারারা এসে ঘষেমেজে চকচকে করলো কাঁচের গেলাস। মচমচে টিস্যু কাগজে মোড়া ফুলের বাস্কেট এলো। পর্দা পালটে গেলো। বাড়ীটা চট ক'রে আর বাড়ী নয়, একটা ক্লাবের মতো বারোয়ারী ব্যবস্থায় ভরে গেলো। পার্টি হবে রাতে।

—এই পার্টিতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের সঙ্গেই আমার সমস্ত কাজ কারবার। দোহাই তোমার খাতির ক'রে চ'লো একটু।

নিশীথের সেই অনুরোধটা মনে করতে করতেই সন্ধ্যেবেলা প্রসাধন শেষ করলো বাসবী। ঘরের বাতিটা নিভিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াবে, এমন সময় চড়াসুরে বেজে উঠলো বাজনা। এক পাঁজা রেকর্ড রেডিওগ্রামে চড়িয়ে হাসছে এক সাহেব, তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি ভারতীয় মেয়ে—কাঁধ ছেড়ে আঁচল লুটিয়ে পড়ে বুঝি মাটিতে--তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিশীথও হাসছে। বাসবী ঢুকতে মেয়েটি বললো—ডার্লিং নিশীথ, এ যে একেবারে ফুলের কুঁড়িটি। কোথা থেকে পেলে? জহুরী তো তুমি?

বাসবী এতোই বিস্মিত যে, অপমানিত হবার অবসর-ও পেলো না। নিশীথ বললো--কেয়া, প্লীজ, তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে-ই ভয় ধরিয়ে দিও না! বাসবী, এ হলো কেয়া চ্যাটার্জি, আর এই যে রকি, আমাদের একজন আমেরিকান বন্ধু।

রকি আর পরিচয়ের জন্যে অপেক্ষা না ক'রে ইতিমধ্যে চারটি গ্লাস উঠিয়ে এনেছে। বাসবীকে বললো—Have one!

তাকে ড্রিঙ্ক দিচ্ছে লোকটা? বাসবী বললো—না। ধন্যবাদ!

কেয়া আর রকি হেসে উঠলো। কেয়া বললো—আমি-ও খেতুম

না, মিসেস্ তালুকদার! But your everloving husband here, ও-ই আমাকে ধরিয়েছে! কি নিশীথ, বৌয়ের বেলা এখন ছেড়ে দিচ্ছ কেন?

কেয়ার লম্বা লম্বা নখগুলো আঁকড়ে ধরলো গেলাসটাকে। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে গলায় ঢেলে দিলো পানীয়টুকু কেয়া! তারপর রকির হাত ধরে চলে গেলো ঐ দিকে!

বাসবী কিছু বলতে না বলতে-ই আরো একঝাঁক মানুষ ঢুকলো। বাঙালী, অবাঙালী, ইংরেজ, আমেরিকান। তাদের পিছনেই প্রায় একঝাঁক মেয়ে। বাঙালী, অবাঙালী—নানা বয়েসের। বাসবীকে দেখে তারা নানাজনে নানারকম অভিনন্দন জানালো। ইষৎ মোটা ফর্সা একটি লোক বাসবীকে দেখিয়ে নিশীথকে বললো,—নিশীথ, This is your latest, কিন্তু বড্ড কাঁচা যে! সুপার-এর পছন্দ হবে?

এই লোকটার ইতর ব্যবহার নিশীথকে যেন স্পর্শ-ই করলো না। আশ্চর্য হলো বাসবী। কিন্তু বিস্মিত হবার তখনো অনেক বাকী ছিলো। তার পরে ড্রিঙ্কের ফোয়ারা ছুটলো। মেয়েরা যে যার মতো ছেলেদের সঙ্গে বাড়ীটায় ছড়িয়ে পড়লো। মাতাল হয়ে সেই মোটা লোকটি—বাসবী জেনেছে সে কেয়া চ্যাটার্জি-র স্বামী, সে বাসবীকে বারবার পাশে বসতে অনুনয় করলো। কেয়া চ্যাটার্জি আর সেই সাহেবটি-র সঙ্গে কথায় বার্তায় নিশীথ রইলো ডুবে। অন্য কোন দিকে তার নজর রইলো না।

সেদিন ঘুমোতে বাসবী-র রাত কেটে গেল প্রায়। সকাল হতে ঘুম ভেঙে বাড়ীটা এমন অদ্ভুত লাগলো দেখতে! এ ঘরে ও ঘরে কাঁচের গেলাস বোতল ছড়িয়ে রয়েছে। মেঝেতে, দামী টেবিলে, কার্পেটে, সিগারেটের টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র। দেশলায়ের পোড়া কাঠি এখানে ওখানে। বিছানাগুলোর চাদর উলটে পড়ে আছে, একটা চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। তখন-ও বাসবীর মন সমালোচনা করতে জানে না। বাসবীর কেমন যেন বিভ্রান্ত লেগেছিলো শুধু। শঙ্করকে ঝাড়ন

হাতে এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে সেই বিশৃঙ্খলা সারতে দেখে বাসবী কাছে এগিয়ে গিয়েছিলো! না বলে পারেনি,—শঙ্কর, তোমার বাবু এই রকম পার্টি কটা দেন মাসে? এই রকমই কি চলে এখানে?

শঙ্কর মাথা নেড়েছিলো। বলেছিলো—মা, তুমি এসেছ, দেখ, তুমি যদি পারো! তুমি শক্ত হয়ে যদি দাঁড়াও মা। দেখো, এসব হৈ হাঙ্গামা আস্তে আস্তে কমে যাবে।

নিশীথকে নিয়ে সে শঙ্করের সঙ্গে কথা বলেছে, এই লজ্জা বাসবীকে যেন ভর্ৎসনা করলো। মনে হলো—ছিঃ মুহূর্তের জন্যে হলেও, এমন ছোট হয়ে গেলাম কি করে?

চাকরদের ডাকলো বাসবী। তাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিস্কার করলো গত রজনীর জঞ্জাল যত। ছাইদানী উঁচু হয়ে রয়েছে ছাই-এ। কাঁচের গ্লাস ভেঙে গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে। কোথাও বা কাত হয়ে পড়ে আছে গেলাস—পানীয় শুকিয়ে রয়েছে টেবিলে। উচ্ছিষ্ট খাবারের টুকরো টাকরা এখানে ওখানে পড়ে আছে। সিগার দিয়ে সোফার চামড়া আর কাপড় পুড়িয়েছে কেউ বাজি ফেলে। কালো কালো ফুটো গুলো বিশ্রী দেখাচ্ছে। জুতোর ধূলো জমে রয়েছে মেঝেতে। সমস্ত কিছুর ওপর সকালের আলো পড়ে বড় কুৎসিত, বড় হতশ্রী দেখাছে এমন কি ফুলগুলো পর্যন্ত যেন বিবর্ণ আর বাসি। সোফার পেছনে। দেয়ালের ছবির পেছনে মাকড়সার জাল—মেয়েদের কল্যাণী হাতের স্পর্শের জন্যে যেন বাড়ীটা, অপেক্ষা করে আছে।

সব আবর্জনা পরিস্কার করে বাড়ীটা যখন সুন্দর হয়ে উঠলো বাসবী তখন নিজে স্নান করলো। নিশীথ তখনো ঘুমোচ্ছে। ঘরে এসে খাটের বাজু ধরে বাসবী খানিকক্ষণ চেয়ে রইলো নিশীথের দিকে। ঘুমোলে নিশীথকে ভারী সুকুমার দেখায়। চেয়ে চেয়ে বাসবীর মনে একটা মমতার বোধ এলো। সে নিজে সংসারের কি-ই বা জানে। সে-ও তো কত অনভিজ্ঞ। তবু মনে হলো—নিশীথকে শুধু ভালো-বাসলেই হবে না। শক্ত হাতে তার সংসারের হালটা-ও ধরতে হবে।

বাসবীর মনে যেটুকু বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল নিশীথ, সেটুকু মুছে ফেলতে যেন তৎপর হলো সে। অন্তত বাসবীর তাই মনে হলো। কয়দিন ধরে বাসবীকে নিয়ে যেন পুতুল খেলা খেললো সে। সকাল হলে বাসবীর বিছানা ছেড়ে নামবার হুকুম নেই। পাশে বসে নিশীথ নিজে হাতে তাকে চা ঢেলে দেবে। তারপর নিজে চোখ বুজে চুপ করে থাকবে। বাসবী তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাবে। তারপর এক একদিন এক এক রকম প্রোগ্রাম। কোনওদিন সকাল বেলাই ঘুম না ভাঙতে বাসবী শোনে নিশীথ কথা কইছে ফোনে মালবী-র সঙ্গে। সেদিন গাড়ী নিয়ে সকাল বেলাই কলকাতা। ব্যারাকপুরের বাজার থেকে টাটকা মাছ আর তরকারী কিনে গাড়ী বোঝাই করা। তারপর কলকাতার বাড়ীতে অতর্কিতে পৌঁছিয়ে সকলকে অবাক করে দেওয়া। নিশীথ ইচ্ছে করলে সে সব সময় আশ্চর্য ছেলেমানুষ হয়ে যেতে পারে। জ্যোতিপ্রভাকে পর্যন্ত টেনে আনে তাদের মধ্যে। দলে পড়ে জ্যোতিপ্রভা-ও সিনেমায় যান—হৈ চৈ হয়। মালবী সে সব দিনে স্কুলে যেতে চায় না। আবদার করে দিদির কাছে। একটি সুন্দর হাসিখুশী দিনের শেষে রঙীন সন্ধ্যা নামতে সুরু করে মহানগরীর আকাশে; বাসবীর বাড়ী ফিরবার সময় হয়। মালবীর মনটা বিকেল থেকেই খারাপ হতে সুরু করে। যত সময় কাছে আসে, ততই সে দিদির আঙুলটা ধরে কাছে কাছে থাকে। সারাদিনের হাসি মুখখানা কেমন যেন হয়ে যায়। মালবীর মনটা খারাপ দেখলে বাসবীও থাকতে পারে না। তখন জ্যোতিপ্রভাই সান্ত্বনা দেন তাকে। বলেন—কেন তুই-ও সাথে সাথে মন খারাপ করিস? ও তো সারাদিনের পর ক্লান্ত। তোরা যাবার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়বে আর সকাল থেকেই তো স্কুল আছে।

ঘর ফিরবার সময়ে সারাদিনের আনন্দটা ছোট বোনটির মুখখানা ভেবে মলিন হয়ে যায় বাসবীর মনে। তার মুখে আর কথা জোগায় না। নিশীথ-ই কথা বলে চলে। বাসবী আনমনে চেয়ে থাকে জানলা

দিয়ে। শহরের ধোঁয়াগুলি হেমন্তের শিশিরে ভারী সন্ধ্যায় পথ ছেড়ে উপরে উঠতে পারে না। বাসবীর স্বপ্নদর্শী চোখে মনে হয় ও গুলি বুঝি বা কুয়াশাই হবে। বলে—দেখ, কি সুন্দর কুয়াশা।

—কুয়াশা কোথায়, ধোঁয়া ত'!

—তা হোক, সুন্দর ত'!

বলে বাসবী আনমনে হেলান দিয়ে রাখে মাথা। এইরকমই তার মন। খুব একটা বাস্তব সচেতন নয়। যেটুকু সুন্দর যেটুকু চোখে দেখতে ভাল, যেটুকু মনকে ভরে রাখে—সেটুকুর বেশী সে চায়না জগতের কাছ থেকে। সেটুকু পেলেই সে খুশী।

নিশীথ যে কি ভাবে, তা ঠিক বোঝা যায় না। বাসবী যেন এক এক সময় বুঝতে পারে না। যেমন এই সময়ে নিশীথের মুখখানা যখন সন্ধ্যার আবছা আলোতে একেবারে অপরিচিত দেখাচ্ছে। চোখটায় কেমন অপরিচিত দৃষ্টি পাতলা ঠোঁট টানটান—কি ভাবছে নিশীথ?

বাসবীর ইচ্ছে করে জোরে কথা বলে, বা কোনরকমে নিশীথের এই আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে তাকে নিজের জগতে টেনে আনতে। কেমন যেন সাহস পায়না। এইসব সময়ে তার আবার মনে হয় নিশীথকে সে যেন তেমন চেনেনা জানেনা। কেন যেন মনের মধ্যে অনিশ্চয়তার একটা দোলা লাগে। কোলের ওপরে হাত দুটি জড়ো করে বাসবী চেয়ে থাকে জানলা দিয়ে। ধূলো ও ধোঁয়ায় ধীরে ধীরে পর্দা নামছে পথের ওপর। মনে মনে ভীরু প্রশ্ন জাগে বারবার। কতখানি জানলে জানা হয় একটা মানুষকে? বেশ তো, সকল কথা না-ই জানলো। প্রেম না কি পরস্পরকে পরস্পরের কাছে সুপ্রকাশ করে? অনেক অজানা-ও নাকি সহজ হয়ে যায়, হৃদয়ে যদি প্রেম থাকে? বাসবী এইসব কথা বুঝতে চেষ্টা করে। সে তো নিশীথকেই ভালোবাসে। আর নিশীথও তাকেই ভালোবাসে। ভালোবাসে বলেই না এলীকে আর এলীর মতো আরো অনেক মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করে নিশীথ তাকে বিয়ে করেছে?

নিজের মনকে নিয়ে আর পারে না বাসবী। একবার ধিক্কার দেয় নিশীথের সম্পর্কে এত সংশয় কেন তার আবার মনে হয় কি আছে নিশীথের মধ্যে? সংশয়, শুধু সংশয়ের মেঘ কেন ধোঁয়া পাকায় মনে?

কিন্তু বাসবী এত কথা ভাবতে না ভাবতেই নিশীথ যেন সহসা তার সম্পর্কে সচেতন হয়। পাশ ফিরে বলে—কি, বাসবী? এত চুপচাপ কেন?

—কি কথা বলবো? তুমি ত' চুপ করে আছে।

—সেইজন্য? রাগ হয়েছে? কি আশ্চর্য এসো স্টিয়ারি। ধরো। আচ্ছা, না-ই বা চালালে। কাছে এসো।

—ইস্, কত কাছে আসব বল? রাস্তায় লোক রয়েছে না? দেখবে না?

—ও, ট্রাফিক পুলিশটার কথা বলছো! দেখলেই বা? দেখবার জিনিষ তুমি, দেখবে না?

—শুধু বাজে কথা!

—বেশ, কাজের কথা বলি।

—বল।

নিশীথ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে হাসে। বলে—কাজের কথা হলো, এখন একদম আঁধার হয়ে এসেছে। তুমি যদি আরও কাছে এসে ব'সো বাসবী, তাহলেও কেউ দেখতে পাবে না।

নিশীথের গলায় এত অবাধ, অকুণ্ঠ প্রশ্রয় ঝরে ঝরে পড়ে, যে বাসবী নিজেকে ভুলে অতটুকু নিলাজ হয়। নিশীথের বাঁ-হাতের বেষ্টনীতে ঘেঁষে বসে। পরম সুখে চুপ করে থাকে। নিশীথ বলে—কই, কথা বল!

কথা বলেনা বাসবী। নিশীথের প্রেমের এতটুকু প্রকাশে মনের সব মেঘ গলে গলে জল হয়ে গেছে তার। মনটা ছল ছল করছে সুখে। রামধনু রঙা আকাশ আর ছলছলে মেঘের মিতালীতে যেমন হয়।

এই সব সময়ে নিশীথের যেন নতুন করে মনে পড়ে যায়—বাসবীকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছে। বাসবীকে তার আরো ভালবাসার কথা ছিলো।

এই সময়ে আর কেউ নয়, কিছু নয়—শুধু নিশীথ আর বাসবী। এই সময়ে অবুঝ আবদার নিশীথের। আর প্রত্যেকটি আবদার রাখতে হবে বাসবীকে। নইলে নিশীথ অভিমান করবে না বাসবীর মতো, বা চুপ করে মনে মনে গুমরে গুমরে দুঃখ পাবে না—সে শুধু আরো অবুঝ হবে। সে যদি কিছুই না বুঝে অমন করে, তা'হলে তার সবগুলি কথা, এমনকি যে সব কথা সে বলেনি, চোখের ভাষায় বা ঠোঁটের হাসিতে, বা আরো অলক্ষ্য কোনো ইঙ্গিতে আভাস দিয়ে গিয়েছে, সে সব কথা-ও রাখে বাসবী।

—এই লাল শাড়ীটা পরো বাসবী—এই রকম করে চুল বাঁধ, চুলে ফুল পরো বাসবী, টকটকে লাল গোলাপ ফুটেছে না বাগানে? পায়ে পরো সেই জরির নাগরা। বা—দিল্লীতে কিনলাম না? রুবি পরো। রুবি বলতে মনে পড়লো—রুবি মল্লিক কেমন রুবি পরতো মনে আছে? নামে নাম মিলিয়ে? কি বলছো, লাল তোমায় মানায় না? কে বললে তোমায়? ও সব কথা ভুলে যাও। চলো যাই প্রিন্স-এ। কেয়া আর চ্যাটার্জীকে আসতে বলেছি। চ্যাটার্জীকে ভালোলাগে না তোমার? না, না, মানুষ হিসেবে ওরা খুব খারাপ নয়—মিশে দেখো। কেয়া বড় উগ্র? তা হলোই বা। মেয়েটার নানারকম গুণ আছে। ওর জন্যে চ্যাটার্জীর কম সুবিধে হয়নি কাজে? রাজী হও বাসবী—রাগ ক'রো না। তোমার বাবা জানলে রাগ করবেন? জানবেন কেমন ক'রে? দাঁড়াও, নখগুলো আমিই রং করে দিই। দেখ তো, এখন কেমন দেখাচ্ছে? চমৎকার। বাসবী, তোমাকে সুন্দর দেখালে আমার এত ভালো লাগে।

—আজ না হয় এই ঢাকাই শাড়ীটা পর। চলো আমি আর তুমি যাই ব্যারাকের বাগানে। সূর্য্যাস্তের সময়টুকু থেকে, সূর্য ডোবা দেখে চলে আসব। ঢাকাই শাড়ী পরেছ তুমি—দুই হাতে সেই ঢাকাই

শাঁখার কঙ্কণ পরেছ—চেয়ে আছ গঙ্গার দিকে—দেখতে আমার বড় ভালো লাগে বাসবী। চলো। দেখবে কি অপরূপ সন্ধ্যা নামে সেখানে। গঙ্গা দিয়ে, আকাশ দিয়ে, ঘাস দিয়ে, গাছের পাতা দিয়ে —লুটিয়ে লুটিয়ে সন্ধ্যা নামে। তারপর তুমি আমি ফিরে আসব। আজকে তোমার গান শুনব বাসবী। কাঁচের ঢাকা বারান্দায় বসে তুমি একটার পর একটা গান গাইবে। কি গান গাইবে? অভ্যাস চলে যাচ্ছে? বা—এত অল্প দিনেই ভুললে চলবে? যে গান ভালোলাগবে তা-ই গাইবে। তোমার যদি গাইতে ভালো লাগে, তো আমার শুনতে ভালো লাগবে না?

এমনি কিছুদিন। বাসবী আর নিশীথ। নিশীথ আর বাসবী। এদের সুখ দেখে অসিত আর জ্যোতিপ্রভা-ও সুখী। যারা এ বিয়েতে আপত্তি করেছিলো—বিয়ের রাতে মঙ্গলাচরণে বার বার বাধা পড়েছিলো বলে যাদের মন সংশয়ে আর আশংকায় ভরে গিয়েছিলো—নিশীথ আর বাসবীর এ পরিপূর্ণ সুখের প্রদীপ্ত ছবিখানি যেন তাদের সকল সংশয়কে পরিহাস করে। এর চেয়ে সুখ আর হয় নাকি? বাসবী মনে মনে ভাবে। আর সুখ সে চায় না।

॥ ৫ ॥

চিত্রাঙ্গদা ও অর্জুনের সে প্রেমে—চিত্রাঙ্গদার ক্লান্তি আসেনি। নিরবচ্ছিন্ন প্রেমলীলায় বিরাগ এসেছিলো পার্থ-র। সে বিরাগ মহনীয়। কেননা চিত্রাঙ্গদাকে শুধু লীলাসঙ্গিনী নয়—জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে বিষ ও অমৃত সমান ভাগে ভাগ করে নেবার যোগ্য সঙ্গিনীরূপে দেখতে চেয়েছিলেন অর্জুন। সে প্রেমের মহান পরিণতির কথা লিখে ধন্য হয়েছেন রচয়িতা।

বাসবীর প্রেমে-ও যেন নিশীথের ক্রমে ক্লান্তি এলো। মনে হলো আর ভালো লাগছে না নিশীথের। কয়দিন ধরেই সে নিজের অফিস কামরায় কাজে ব্যস্ত ছিলো। অফিস কামরায় যে কি আছে নিশীথের —ঢুকেই সে দরোজা বন্ধ করে। কি করে সে ঘরে? আসবাবের মধ্যে তো আছে একটা লোহার আলমারী, সেক্রেটারিয়েট চেয়ার আর অমনিই সামান্য টুকিটাকি। বাসবী যদি বা বলেছে,—কি করো ও ঘরে দরজা বন্ধ করে? কি এমন কাজ? আমি দেখতে পারি না? আমি তো সাহায্যও করতে পারি?

নিশীথ মাথা নেড়েছে হেসে।

সেদিন সকালে সে বললো—আমার কাজ আছে কলকাতায়—ফিরতে রাত আটটা হবে। যাবো তিনটেয়। বাসবী, তুমি আলিপুর যাবে?

বাসবী রাজী হয়নি। শরতের শেষে শিশিরের দিন সুরু হয়েছে। ঘাস ভিজে, মাটী ভিজে - দেবদারু গাছের পাতা থেকে সকালে টুপটাপ শিশির ঝরে। ঝাউ গাছের ঝিলমিলে পাতায় ফোঁটা ফোঁটা শিশির আটকে থাকে। সূর্যের প্রথম আলোতে তারা মণি মুক্তার বিভ্রম রচনা করে মিলিয়ে যায়।

শঙ্কর মৌসুমী ফুলের বীজ এনে দিয়েছে। বাসবী কয়দিন ধরে

জমি তৈরী করিয়েছে। মনে ভেবে রেখেছে আজ বিকালে চারা বসাবে শ্যাসটারশিয়ামের বেড-এ। ফুলের রং মিলিয়ে বাগান সাজাতে তার এক ধরণের পটুতা আছে। আলিপুরের বাড়ীতে-ও বাগানের ভার তার-ই হাতে ছিলো।

বাগানের কাজ করতে ব্যস্ত ছিলো বাসবী। তাই গাড়ীর শব্দ শুনে পেছন ফিরে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। গাড়ীটা চেনা। খুবই চেনা। ভিভিয়ানের গাড়ী। গাড়ীতে ড্রাইভার নেই--কেউ নেই। গাড়ী থেকে নেমে এল যে তাকে দেখে সে আরও অবাক। নেমে এলো এলী। বাসবী আশ্চর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো প্রায়—এলী!

এলী প্রায় হোঁচট খেয়ে ছুটে এলো বাসবীর কাছে। বললো—বাসবী, নিশীথ কোথায়? বাড়ী নেই ত?

কি হয়েছে এলীর? বুঝতে পারে না বাসবী। এলীর চোখ মুখ কেমন বিভ্রান্ত –বেশভূষাও বিশৃঙ্খল। এলী রায়কে কেউ এমন ধারা এলোমেলো দেখেনি। এলী চিরকাল নিখুঁত সাজেগোজে—নিটোল নিভাঁজ তার পোষাক—এমনকি চুলগুলোকে-ও গোছা-গোছা ক্লিপের শাসনে সব সময়ে আটকে রাখে।

বাসবীর হাতে মাটি মাখা—সেদিকে না চেয়ে এলী তার হাত চেপে ধরে। বলে—নিশীথ নেই?

—না তো! সে গিয়েছে কলকাতায়। বসবে চলো এলী!

—না, শোন বাসবী—আচ্ছা, ঘরেই চলো।

ঘরে এসে এলীকে বসায় বাসবী। এলী ভয়ানক ঘামছে। কোন কারণে সে যেমন উত্তেজিত, তেমনই বিভ্রান্ত। গরম নেই। তবু পাখা খুলে দেয় বাসবী। এলী দু'চার বার ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সংযত করে। তারপর বাসবীর দিকে চেয়ে বলে - বাসবী, নিশীথের কাছে আসিনি আমি, তোমার কাছে এসেছি।

—বল, এলী!

বাসবী বুঝতে পেরেছে যে গলাটা তার অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে। কিন্তু উপায় কোথায়? এলীর সঙ্গে বিয়ের চার মাস বাদে এই প্রথম

দেখা। দুজনের মধ্যে একটা সঙ্কোচের দেওয়াল থাকবে সেটা তো স্বাভাবিকই। কিন্তু এলী তো সে সব কথা বলতে আসেনি?

মন ঠিক করতে গিয়ে ঘরের ভেতর দু'চার বার পাক খেয়ে নেয় এলী। বাসবীর সামনে দাঁড়িয়ে ঈষৎ ঝুঁকে বলে—বাসবী, নিশীথের নিজের প্রাইভেট কাগজপত্র কোথায় থাকে জানো? নিশ্চয় জানো। চাবিটা দিতে হবে। খুলে দেবে চলো।

—কি বলছো এলী?

—কি বলছি? বাসবী, শোন। নিশীথ কলকাতায় আমার সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছে—কি বলবো তোমায়, তুমি কিছু জান না?

—না।

বাসবীর পায়ের তলায় যেন মাটি হারিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। এলীর সঙ্গে দেখা করছে নিশীথ কলকাতায়? তবে এলী এখানে কেন?

এলী বলে—কিছু জানো না? নিশীথ আমার জীবনটা তছ্‌নছ্‌ করে দিচ্ছে, তুমি কিছু জানো না! বিশ্বাস হয় না বাসবী। বিয়ের আগেকার তুমি হ'লে এই সরলতায় বিশ্বাস করতে আমার এতটুকু বাধতোনা। কিন্তু এখন তুমি·· তুমি যার স্ত্রী···তার স্ত্রী হিসাবে তোমাকে বিশ্বাস করতে বাধছে।

বাসবী এবার উত্তেজিত হচ্ছে। সে বলে—তুমি বিশ্বাস না করলে আমি নিরুপায়। কিন্তু আমি সত্যিই কিছু জানি না।

—কিছু জানো না, না! আচ্ছা, বিশ্বাস তোমায় করলাম বাসবী। কিন্তু তার কাগজপত্র কোথায় আছে! আমাকে একবারটি দেখাতে পার!

—নিশীথের অফিসে বন্ধ। আর তার কাগজপত্রে তো আমি হাত দিইনা এলী।

—হায় ভগবান—তুমি ভদ্রতার কথা ভাবছ বাসবী, ভব্যতার কথা ভাবছ? আমি যে মরে যাচ্ছি? তার কি হবে? নিশীথ, হ্যাঁ তোমাকে বলছি বাসবী—নিশীথ আমাকে মেরে ফেলছে। আমি আর সহ্য করতে পারছিনা—আর পারছি না!

এলী এবার ডিভানের ওপর মাথা রেখে মাটিতে নতজানু হয়ে

বসে ফুলে ফুলে কাঁদে। বাসবীর উচিত তাকে সান্ত্বনা দেওয়া—শান্ত করা—সে তা পারে না। সে শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। এলী বরাবরই শক্ত মেয়ে। কিন্তু আজ এলী নিজেকে সামলাতে পারেনা।

কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই উঠে দাঁড়ায়। চোখমুখ মুছে নেয়। বলে—কিছুই যখন জানো না। তখন আর না-ই জানলে। আমি যাচ্ছি!

—নিশীথকে কি বলবো এলী?

—বলো, আমি তার কাছে আরো এক সপ্তাহ সময় চাইলাম। এক সপ্তাহ মাত্র। এর মধ্যে সে যেন আমাকে আর ফোন না করে, বা চিঠি না লেখে। বলো, আমার মনে থাকবে।

তেমনই বিভ্রান্ত একটা ঘূর্ণীর মতো বেরিয়ে যায় এলী। তার গাড়ীর শব্দ-ও পাওয়া যায়। তবে ঝড়টা সে শুধু নিয়ে-ই যায় না সঙ্গে—ঝড়ের মাতামাতি খানিকটা বাসবীর ঘরেও রেখে যায়। সে ঝড়ে ঘরের ছবি ভেঙে পড়ে না, জিনিষপত্র বিপর্যস্ত হয় না। চোখের দেখায় কোনো বিশৃঙ্খলা-ই হয় না—সত্য। চীনে ছবিটার পাশে শাদা দেওয়ালে টিকটিকিটা তেমনই অভিনিবেশে পোকা ধরতে চেষ্টা করে। সব যা ছিলো তেমনই থাকে। কিন্তু ঝড় মাতামাতি করে বাসবীর মনে। ঝড় সেখানে প্রলয়ঙ্কর হয়ে ধোঁয়াটে মেঘ গুলোকে উড়িয়ে মনের আকাশ পরিস্কার করে না। চোরা একটা দৈত্যের মতো ধুমকুণ্ডলী সৃষ্টি করে বাসবীর মনের আকাশটা কালো করে ফেলে।

নিশীথ সেদিন তাড়াতাড়িই ফেরে। সাড়ে ছ-টা না বাজতেই। বলে—শোন, যে কাজে গিয়েছিলাম, সে কাজ হলো না। টিকিট কিনে আনলাম। বিলিতী দল এসেছে। নিউ এম্পায়ারে সেক্সপীয়ার অভিনয় রাত আটটায়। চলো, বাইরে খেয়ে ফিরবো। দেরী করো না।

বাসবী সে কথার জবাব দেয় না! নিশীথের দিকে কেন যেন, চাইতে অবধি পারে না সে। উঠে চলে যায় শোবার ঘরে। বুঝতে পারে না নিশীথ। পিছু পিছু আসে। বলে—বাসবী শুনছ?

বাসবী খাটের বাজু ধরে দাঁড়ায়। বলে—নিশীথ, এলী এসেছিলো।

—কে ?

—এলী !

—কখন ?

নিশীথের গলার স্বর চাপা উত্তেজনায় গরম হয়ে উঠেছে। সেই উত্তাপেই কি বাসবীর ঘাড়, কান, গলা পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে ? মনে হচ্ছে আগুন বেরোচ্ছে গা দিয়ে ? বাসবী মুখ ফেরায় না। বলে—পাঁচটায় হবে। নিশীথ, এলী বলেছে এক সপ্তাহ সময় দিতে।

—আচ্ছা !

একটা শীষ টানে নিশীথ। তারপর কাছে আসে। হাত রাখে বাসবীর কাঁধে। বলে—বেশ তো ! এলী এসেছিলো। এলী এক সপ্তাহ সময় চেয়েছে, তুমি কাপড় বদলে নাও ? জানো, আলিপুরের বাড়ীতে টিকিট দিয়ে এলাম। মা আসতে পারেন বাবার সঙ্গে। যাবে না ? দেরী হয়ে যাচ্ছে যে, বাসবী !

—নিশীথ, এলী কেন এসেছিল ?

—এই কথা ? আচ্ছা তাই বলছি। কিছু এমন ব্যাপার নয়। এলীরায়ের স্বভাব তো ! সমস্ত ব্যাপারটাকে নাটুকে করে না তুললে ওর শান্তি নেই।

—বল, নিশীথ !

—বলছি। কাপড় ছাড়ো তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো ? এ কি কাঁদছ ? না বড় ছেলেমানুষ তুমি ! কাপড় ছাড়ো। চলো, গাড়ীতে অনেকক্ষণ যাবে তো, বলছি সব !

—না-ই বা গেলাম নিশীথ। ভালো লাগছে না আমার।

—বেশ—

বাসবীকেই আজ খুশী করবে নিশীথ। নিশিথ বলে।

—তবে চলো এমনিই একটু ঘুরে আসবে ?

—চলো।

গঙ্গার ধারে এসে বসে দুইজন। বাসবা আবার বলে—নিশীথ, এলী তোমার অফিসকামরায় যেতে চাইছিলো, তোমার কাগজপত্র দেখতে চাইছিলো। কেন ?

—শোন, বাসবী। এলীকে তুমি কতটুকু জানো জানি না—কিন্তু আমার সঙ্গে ত' তার আলাপ ছিলো—জানই তো সে কথা। মেয়েটি বড় হিস্টিরিয়া করতে পারে…এই যখন আমাদের বিয়ের কথাটা বললাম, তখন সে যে…

- না, না, সে কথা থাক…কিন্তু এলীকে তুমি কেন ডেকেছিলে কলকাতায় ? বল, নিশীথ। বল…আমি তোমার স্ত্রী—আমার কি সে কথা জানবার অধিকার নেই ?

—নিশ্চয় আছে। কিন্তু বাসবী, জানবার মতো আছে কি বলো ? এলীর সঙ্গে বিয়ে হবে সরিৎ মজুমদারের। এলী সেইজন্যে বলতে চায়, যে তার যে সব চিঠিপত্র আমার কাছে আছে—আছে কি নেই তা-ও আমাকে দেখতে হবে খুঁজে--কেন না আজকের ব্যাপার তো নয়! সেইগুলি সে ফেরৎ চায়। তা, এ ব্যাপারটা খুবই সহজে হতে পারতো। সে এটাকে নিয়ে নাটক করে তুললো। কোন প্রয়োজন ছিল না।

এবার বাসবী আশ্বস্ত হতে পারতো। কিন্তু তবু মন মানে না। মনে মনে সে নিশীথের কথার সঙ্গে মেলাতে চেষ্টা করে এলীকে। কেন যেন মেলে না। এলী চিরকাল লেখাপড়া নিয়ে থেকেছে একটু নীরস—তবু সংযত স্বভাব তার। এমন কি…মনের মধ্যে সে কথাটা আজও খচখচ ক'রে বেঁধে তবু মনে না করে পারে না বাসবী যে নিশীথকে সে এলীর কাছ থেকে একরম ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই এলীর কাছে তার একটু অপরাধের ভাব আছে। যা হোক, একথা বাসবী স্বীকার করবেই—এলীর মা-র মধ্যে যদি বা কিছুটা চপলতা, কিছু আল্‌গা ভাব থাকে, এলীর মধ্যে তা নেই। এলী তার বাপের মতোই শান্ত, সংযত, ও ভদ্র। তাই, নিশীথ-বাসবীর বিয়ের যখন সকল কথা-ই ঠিক, তখন বাসবীর সঙ্গে এলীর একদিন দেখা হয়েছিলো মার্কেটে। মুখোমুখি হতে বাসবী লাল হয়ে গেল ঠিকই,

এলীর ফর্সা মুখখানা যেন আরো সাদা হয়ে গেল। কিন্তু এলী তাকে এড়িয়ে গেল না। কথা কইলো। বললো—কি, বাসবী? নিজেই এসেছো বাজার করতে?

—এই, দেখছি আর কি টুকিটাকি। তুমি কি করছো, এলী?

—উল কিনতে এসেছি, তা উল তো এখনো আসেনি বাজারে।

—তাই দেখলাম।

—আচ্ছা বাসবী!

—আচ্ছা এলী!

কই, সেদিন তো এলী রূঢ় রুক্ষ হয়ে ওঠেনি—কোন অভদ্রতা করেনি? কিন্তু নিশীথকে-ই বা সে অবিশ্বাস করে কি ক'রে? আড়চোখে নিশীথের দিকে চায় বাসবী। মুখের ভাব তেমনই দুর্জ্ঞেয় এক যবনিকায় ঢাকা। সিগারেটের আলোয় যতটুকু আলোকিত হচ্ছে, ততটুকু-ই দেখা যায়। বাসবী আস্তে বলে—নিশীথ, এলীর চিঠি যদি তোমার কাছে এখনো থাকে, তবে দিয়ে দিলেই তো হয়!

—নিশ্চয় দিয়ে দেব। আমি কি রাখতে চাই? সরিৎ মজুমদার নিশ্চয় খুব রক্ষণশীল, বা নীতিবাগীশ লোক—এলী তাই পূর্বজীবনের কোনো চিঠিপত্র কোথাও রাখতে চায়না। জানাতে চায়না তার ভাবী স্বামীকে। তাই মনে হয় না?

—তা ছাড়া আর ত' কোন কারণ দেখি না নিশীথ!

—তাই দিয়ে দেব বাসবী। দেব বলে-ই তো গিয়েছিলাম। সে যে এখানে এসে পড়বে, তা কি জানি? মাঝ থেকে ক্লান্তিটুকুই সার হলো। না হলো থিয়েটার, না কিছু।

—আবার দেখা যাবে! চলো ফিরি।

—চলো।

মালবীর সামান্য জ্বর হয়েছিলো। যেতে বলেছিলো দিদিকে। বাসবীর হাত ধরে বলেছিলো—জানো, আমার জ্বরটা যাতে বেশী হয়ে যায়। আমি সেইজন্যে ভগবানকে ডাকছি।

—কেন মালবী ?

—জ্বর না হ'লে তুমি ত' আমার কাছে থাকবে না।

এখন, মালবীর কথা ভগবান শুনেছিলেন বলেই হোক, বা অন্য কোন কারণে হোক, মালবীর জ্বরটা বেশ বেড়ে গেল। বাসবী ফোন করে জানালো। নিশীথ-ও এলো দু'দিন। মালবীকে বললো—ভালো করে আটকে রাখ দিদিকে।

বাসবীকে বললো—রকি-রা চলে যাচ্ছে মাদ্রাজ। চ্যাটার্জি পার্টি দিতে চায়—আমি বলেছি সেটা আমার এখানেই হোক কেয়াদের বাড়ীতে জায়গা কোথায় ? তা, তুমি না থাকলে কি করে···

—না নিশীথ, তোমার সে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমি না থাকলেই ওদের-ও ভালো লাগবে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবো। তাই নয় ?

—যা বলো।

নিশীথ আর খুব বেশী কিছু বলে না।

কেয়ার কথা ভাবতেই বাসবীর মনে পড়ে যায় লম্বা লম্বা আঙুল আর টুকটুকে লাল নখগুলোর কথা। ঐ হাতখানা দেখেই যেন মানুষটাকে বোঝা যায়। সবকিছু যেন আঁকড়ে ধরতে চায় কেয়া চ্যাটার্জির ঐ হাতখানা। কি'যেন আছে কেয়ার মধ্যে, তাকে সহ্য করতে পারে না বাসবী।

আবার বাসবীর একটা কথা মনে পড়ে। বলে

—শোন।

—বল।

—চিত্রিতার জন্মদিন পরশু। আমি এখানে আছি জেনে যেতে বলেছে বারবার। হয় তো যাব না। কিন্তু যদি যাই, তাহ'লে তো দেখা হবে এলীর সঙ্গে।

—কি বলতে চাও ?

মুখ লাল হয়ে যায়। তবু বলতেই হয় বাসবীকে—এলীর সে চিঠিগুলো ইতিমধ্যেই তুমি দিয়ে দিও নিশীথ। ওখানে যদি দেখা হয়, বড্ড অপ্রস্তুত হতে হবে না ?

নিশীথ হঠাৎ হেসে ওঠে। বলে—না। অপ্রস্তুত তোমাকে হতে হবে না। এলীর যা কিছু ছিলো আমার কাছে দিয়ে দিয়েছি সব।

চিত্রিতার সে জন্মদিনের উৎসবের কথা কোনদিন-ও ভোলেনি বাসবী। উৎসবের জন্য নয়। এলীর জন্য। চিত্রিতাদের বাড়ীতে উৎসবের জন্য জমায়েত হয়েছিলেন যাঁরা, সকলেই যেন কেমন করে তাকিয়েছিলেন তার দিকে। কেন, তা বুঝতে পারেনি বাসবী। তবে চোখে পড়েছিলো, ভিভিয়ান, এলী ও মিসেস রায়ের অনুপস্থিতি। ভিভিয়ানের সঙ্গে বিয়ে হবে চিত্রিতার কয়মাস বাদে-ই। সেই ভিভিয়ান এমন দিনে অনুপস্থিত কেন? সকলের চোখে চোখে বাসবী যেন উত্তর খোঁজে। উত্তর পায় না।

বাড়ী ফিরে এসে মনটা খারাপ হয়ে যায় বাসবীর। নিশীথের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করে। চিত্রিতার বাড়ীর সে উৎসবে কেমন যেন একটা চাপা অস্বস্তি-র ভাব ছিলো পরিবেশে। সেই অস্বস্তি বুকে করে নিয়ে এসেছে যেন বাসবী! তার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হলে-ও, একটা চিন্তা তার মনে সমানে ঘুরে ঘুরে আসছে। চিত্রিতার জন্মদিনে এলী-রা কেউ এল না কেন? আর প্রত্যেকে সে প্রসঙ্গে এমন নীরব কেন রইলেন? কেন জিজ্ঞাসা করে-ও জবাব মিলল না? কথা বাদ দিয়ে-ই বলা চলে, চিত্রিতার বিষয়ে বাসবীর একটা কৃতজ্ঞতা বোধ আছে মনে মনে। হাজার হলে-ও চিত্রিতার জন্যেই নিশীথের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো তার। চিত্রিতা-ই তাকে নিয়ে গিয়েছিলো। সেই চিত্রিতার ভিভিয়ানের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে জেনে তার ভালো লেগেছিলো। সে নিজে সুখী হয়েছে বলেই না অন্যকে সুখী হতে দেখতে তারও ভালো লাগে? সে তো স্বার্থপর নয়। এলীর সঙ্গে সরিৎ মজুমদারের বিয়ে হচ্ছে জেনে-ও সে সুখী হয়েছিলো।

কিন্তু আজ বাসবী মনে না করে পারলো না—তার বন্ধুবান্ধবদের থেকে এই সামান্য সময়ে-ই সে যেন অনেকটা সরে এসেছে। তাদের প্রেম-ভালবাসা-মন জানাজানির ছোট ছোট অন্তরঙ্গ উত্তপ্ত কথা—

আর তারা বিশ্বাস করে বলে না বাসবী-কে। বাসবীকে এখন মনে মনে এড়িয়ে চলে কেন ওরা? এ কি ঈর্ষ্যায়? না অন্য কিছু?

এলোমেলো মনটা নিয়ে নিশীথের কাছে চলে যাওয়াটাই ভালো। মনে হয় বাসবীর। সকালের আলোতে ব্যারাকপুরের পথটা বড় ভালো লাগে তার। পথের রোজকার দৃশ্য-ও মনে হয় নতুন নতুন।

কিন্তু ব্যারাকপুরের বাড়ীতে ঢুকে সে মন আর থাকেনা বাসবীর। দরজা জানলা এখনো বন্ধ। সে আসবে বলে না হয় জানা নেই—তাই বলে বাড়ীতে কাজ সুরু করবেনা কেউ?

বড় বড় দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে অদ্ভুত ভাবে। যে রাতটা কাল বাসবীর মনে অস্বস্তি আর অশান্তি জাগিয়েছিলো, সে রাতটা-ই যেন এখন, বাসবীর ঘরে দোরে গুঁড়ি মেরে বসে আছে—বিশ্রী একটা উপস্থিতির মতো। আর যে ঘরগুলো বন্ধ থাকে বরাবর—সে ঘরগুলো কে যেন খুলে দিয়েছে। দরজায় দরজায় ভারী সবুজ পর্দা ঝুলছে।

নিশীথের অফিসকামরায় আলো জ্বলছে মনে হয়। কাঁচের দরজা দিয়ে আলো দেখা যায়। দরজা খুলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বাসবী। দেখতে চায় না সে—অথচ না দেখে-ও তার উপায় নেই।

এলী আর নিশীথ দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। এলীর চেহারা দেখে মনে হয় বুঝি এখনি ভেঙে পড়বে এলী। টেবিলে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে এলী বলছে।

—টাকা আমি দিতে পারিনি—তাই এখন সর্বনাশ তুমি করলে নিশীথ? আমি কি টাকা দিতাম না? বলিনি যে সময় চেয়েছিলাম এক সপ্তাহ?

—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না এলী।

শয়তান!

এগিয়ে আসে এলী। বলে—একবার সর্বনাশ করেছিলে—নার্সিং হোমের সে রসিদের ভয় দেখিয়ে আমার দিবারাত্রি নষ্ট করে দিয়েছো—

টাকা···বারেবারে তোমাকে আমি কত টাকা দিয়েছি নিশীথ? মা জানেন না—ভিভিয়ান জানে না···আমার এ্যাকাউণ্ট থেকে নিয়ে··· মিথ্যে কথা বলে ধার করে—সরিৎকে বিয়ে করে আমি সরে যেতাম এখান থেকে—সুখী হতাম হয় তো···কিন্তু তুমি—তুমি আমাকে শেষ করে দিলে!

গলা উঠছে এলীর—গলা উঠছে উঁচুতে—আর বাঁধ থাকছে না—ঢুকবে বাসবী? ধরবে এলীকে? বসাবে চেয়ারে? না চলে যাবে? এখান থেকে? যেখানে হোক?—কি শুনছে সে? এ কি সত্যি?

এলীকে থামাতে চেষ্টা করে নিশীথ। তাকে কাছে আসতে দেয়না এলী। বলে—দু'দিকে-ই তুমি ছুরি চালিয়েছ? সরিতের কাছে গিয়েছিলে সেই রসিদ নিয়ে? কি ভেবেছিলে নিশীথ? যে সরিৎ মজুমদার তোমাকে টাকা দেবে? কিন্তু সেখানে তুমি হেরে গিয়েছ··· তোমার হিসাব মিথ্যে হয়ে গিয়েছে – তুমি হেরে গিয়েছ নিশীথ—

হাসতে গিয়ে হাহাকার করে কান্নায় ভেঙে পড়বার সে এক মর্মন্তুদ কণ্ঠ এলীর—নিশীথের মুখের ওপর কথাটা ছুঁড়ে মারে এলী। বলে—ব্ল্যাকমেইল তুমি আর করতে পারবে না নিশীথ আমাকে সরিতের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট কাল আমার ভেঙে গিয়েছে···এ রসিদে আজ আমার কোন দরকার নেই।

টেবিলের ওপর নিশীথের সেফ্‌এর একটা ড্রয়ার নামানো। তাতে থাকে থাকে কাগজপত্র। তার ওপরে ছেঁড়া একটা কাগজ মুঠো পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে এলী।

সবটুকু শোনা হয়েছে। আর না শুনলে, আর না জানলে-ও পারে বাসবী—তবু সে শোনে কান পেতে। এলী বলে যাচ্ছে শেষ কথা। বলছে!

—আমি বলে যাচ্ছি নিশীথ। একদিন এর শাস্তি তুমি পাবে। যে জ্বালায় আমাকে জ্বালিয়েছ······আমি ভীরু, আমি পারলাম না—কিন্তু একদিন তুমি শেষ হয়ে যাবে।

বেরিয়ে আসে এলী। একবার মুখোমুখি দেখে বাসবীকে।

তারপর অক্ষম প্রতিহিংসার জ্বালাটুকু কয়েকটা কথায় ঢেলে দিয়ে বাসবীর জগৎ অন্ধকার করে দিয়ে যায় এলী।

—শুনেছ সব? তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করে দিতে ইচ্ছে করছে বাসবী—এ হলো নিশীথ তালুকদার—পেশা হচ্ছে ব্ল্যাকমেইল করা—আর তুমি হচ্ছো একজন মূর্খ, চূড়ান্ত মূর্খ মেয়ে বাসবী—ও তোমাকে-ও একদিন শেষ করে দেবে। আচ্ছা চলি—এই পরিচয়টা নিশীথের জানতে না তো? জেনে রাখ—আর তারপর-ও যদি সম্ভব, সুখী হয়ো! তারপরে মানে, তাই জানাব পরে।

জ্ঞান ঠিকই হারিয়ে যায় বাসবীর—কিন্তু তার আগে নিশীথের মুখের চেহারাটা সে দেখতে পেয়েছে। ডনজুয়ানের মনভোলানো মুখোসটা খসে পড়ে গেছে কখন—তারদিকে নগ্ন ব্যক্তিত্বটা খুলে ধরে চেয়ে আছে নিশীথ। যে পাতলা ঠোঁটটা অন্য সময় ছেলেমানুষী খুশীর হাসিতে ভরে থাকে—সেই ঠোঁটটা এখন শয়তানের ছুরির মতো বেঁকে আছে।

*　　*　　*　　*

ফুরিয়ে গেলে-ও ফুরোয় না কথা। ইতিকথার পরে আরো কথা বেঁচে থাকে। জ্ঞান হারাতে এই কামনা-ই জানিয়েছিলো বাসবী, যে আর যেন জ্ঞান তার না ফিরে আসে। সে দেখতে চায়না নিশীথকে—শুনতে চায়না নিশীথের কথা—সব অনুভূতি তার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে গিয়েছে এলী।

তবু জ্ঞান ফিরে আসে! তবু সুস্থ হয় সে। আর, উদ্‌ভ্রান্ত বাসবী আকুল হয়ে নিশীথের বুকে ভেঙ্গে পড়ে মিনতি জানাতে গিয়ে রূঢ় এক আঘাত পায়। সে আঘাত বুঝি এলীর কথাগুলির চেয়ে অনেক বেশী রূঢ়।

অনুতপ্ত নয় নিশীথ। অনুশোচনা নেই তার। অপরাধ স্বীকার ক'রে সে বাসবীর বুক নিজের অশ্রুজলে ভিজিয়ে দেয় না। বলে না, যে ভুল করেছে সে পাপের পথে গিয়ে। বলে না, যে বাসবীর প্রেমে অবগাহন করে নতুন জন্ম নিতে চায় সে।

সে শুধু বলে—ন্যাকামি ক'রোনা বাসবী। তোমার বা তোমার বাবার সম্মান আমি হানি করিনি। ডিগনিটির কথা উঠছে কিসে? তোমাদের সম্মানবোধ জানা আছে। ভালবাসার কথা দু'চারটে বললে কোনো মেয়েকে দেখলাম না যে, ঢলে পড়ে না। কি বলছো!

—নিশীথ, তুমি কি বলছো?

—কি বলছি? ঠিকই বলছি। আসলে হিসেবে আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। বোকার মতো সরিৎকে না জানিয়ে…যাক্ গে—খেয়ে নাও তুমি। সেই খাবেই যখন—তখন ন্যাকামি করে লাভ আছে কোনো?

—কোথায় যাচ্ছ?

—কোথায় আবার? অফিসে। কেয়া এসেছে, শুনলে না।

—আবার ঐ মেয়েটিকে আসতে দিয়েছ তুমি?—ছি, নিশীথ—আমি তোমার স্ত্রী! আমার সম্মান তুমি রাখতে দেবে না।

নিশীথ সে কথার জবাব দেয়নি। অফিসঘরের জানালা যখন খোলা, তখন তার ও কেয়ার বাদ প্রতিবাদ শুনতে কোন বাধা থাকেনি বাসবীর। কেয়া বলেছে

—আমার কাজ আমি করেছি। সরিৎ মজুমদারকে পৌঁছে দিয়েছি চিঠি। টাকা তুমি আমাকে দেবে না কেন।

—তাতে কাজ হয়নি বলে! বুঝতে পারছ না কেন, যে অধৈর্য না হয়ে, ওদের বিয়েটা হয়ে গেলেই ভাল করতাম আমরা।

—ছাই করতে। সরিৎ মজুমদার বৌ নিয়ে চলে যেতো বিলেতে।

—যা হোক—এখন আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারছি না কেয়া।

শুনতে শুনতে বাসবীর চোখ দিয়ে নিস্ফল চোখের জল পড়ে পড়ে বালিশ ভিজে গিয়েছে। তখন সহৃদয় কোনো দরদী বন্ধুর মতোই পাশে দাঁড়িয়েছে শঙ্কর। বলেছে—খেয়ে নাও না! একটু দুধ খাও। ভাল লাগবে।

অসহায় বাসবী শুধু মা-র কথাই মনে করতে পেরেছে। মা-কে

ডেকেই মুখ গুঁজতে পেরেছে বালিশে। শঙ্কর এবার হৃদয়ের অধিকারে নিঃসঙ্কোচে বাসবীকে সান্ত্বনা দেয়। বলে—এইরকম-ই বরাবর। তুমি যখন এলে, ভেবেছিলাম কিছু বদলে যাবে মানুষটা। চোখের জল ফেলো না মা। কেঁদে কেঁদে শরীর খারাপ করলে বল ক্ষতি কার?

ক্ষতির সবটা ভাগ-ই বাসবীর। সব ক্ষয় ক্ষতি তার-ই। আঘাত যেখানে পড়লো, সেই বুকটাই রক্তাক্ত হলো। যে আঘাত করলো, তার কি এল গেল কিছু?

নিঃশেষে ভালবেসে-ই মরেছে বাসবী। ভালবেসেছে বলেই এমন করে জ্বলে গেল প্রাণ।

মরা নদী-ও যদি জল পায় বর্ষণে, তবে তার বুকেও বান-ডাকার স্বপ্ন জাগে।

বিধ্বস্ত মনটা গুছিয়ে নেয় বাসবী। আর যা-ই হোক, অবমাননা যা তার-ই হোক, বাবাকে জানিয়ে সে ছোট হতে পারবে না। তার আগ্রহ-ই ছিলো এ বিয়ের প্রধান কারণ। অসিত মৈত্র যদি জানেন, নিশীথ যে কোন অপরাধী বা প্রতারকের চেয়ে-ও হীন—তা হ'লে আঘাত পাবেন মর্মে মর্মে। বাসবী তার বাবাকে জানে। সম্মানে ঘা লাগলে ভেঙে যাবে তাঁর মন। সে নিজেও সেই ধাতুতেই গড়া। অসম্মান বা লোকজানাজানির চেয়ে সম্মানিত জীবনের অভিনয় করে চলাটা অনেক ভালো।

আজ যেন ভাসাভাসা মনে হয় তার—ইভা মিত্র তাকে দেখে যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—তিনি তার স্বামীকে ঠিকই চিনেছিলেন। আর দিল্লীর হোটেলে সেই মিসেস্ চ্যাটার্জি—কি মর্মন্তুদ ইতিহাস তাঁর, তাই বা কে জানে!

এদিকে মুখোসটা খুলে ফেলে নিশীথ আবার সহজ হয়। বাসবীকে যে সে ঠিক অসম্মান বা অবমাননা করে, তা নয়। তবে তার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই স্বীকার করে না। বলে

—তোমাকে ত' আমি অনাদর করিনি বাসবী। ভালবাসি না তোমায়? তোমাকে সুখে রাখতে আমার ইচ্ছে করে না?

বড় দুঃখে হাসি পায় বাসবীর। সে শুধু ভাবে, নিশীথের সবটুকুই কি অভিনয়? তার জন্য উৎকণ্ঠা, তাকে ভালবাসা—এগুলো নিশ্চয় অভিনয় নয়। তার বাবা মা-র কাছে নিশীথ একা-ই কত সময় যায়। কথা বলে। মালবীকে আদর করে, খেলনা কিনে দেয়। অসিত মৈত্র-র শরীর এতটুকু অসুস্থ হলে অস্থির হয়ে পড়ে।

জ্যোতিপ্রভা একদিন বলেন—আচ্ছা বাসবী, এমন সোনার ছেলে নিশীথ, এত ভালোবাসে তোকে—তুই তবু সুখী হতে পারছিস্ না কেন বলতো? এই তো নিশীথ বলছিল—

—কি বলছিল?

তীব্র হয়ে যায় কণ্ঠ। জ্যোতি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকেন। বলেন—কি হয়েছে তোর? ও নাকি তোকে জন্মদিনে নেক্‌লেস কিনে দিলো—

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

—তুই একবারও নাকি সে হার গলায় দিস্ নি। নিশীথ হাসে আর বলে—মা, আপনার মেয়েকে সাধ্যমতো সমাদর করি—কিন্তু মন পাই না।

বাসবীকে হাসতে হয়। বলে—শরীরটা ভাল নেই। পরিনি ব'লে কি হয়েছে? পরবো এখন, দেখো।

জ্যোতিপ্রভা বলেন—ক-দিন থাকলেই তো পারিস এখানে? বন্ধু-বান্ধব—কারু সঙ্গেই দেখা নেই—মাঝে মাঝে মেলামেশা না করলে কি ভালো লাগে?

বাসবী মা-র হাতটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। বলে—এখানে থাকলে ওর অসুবিধে হয় মা।

তা জ্যোতিপ্রভা বোঝেন। সেই-তো সান্ত্বনা! বাসবী এখানে একটি দিন কাটালে তিন চার বার ফোন করে নিশীথ। বিকেলে এসে উপস্থিত হয়। বাসবীর জন্য উদ্বেগ ফুটে ওঠে তার কথায় কথায়।

জ্যোতিপ্রভা আনন্দে বিগলিত। বার বার স্বামীকে বলেন—এমন স্বভাব, এমন মায়া মাখানো কথাবার্তা—বাসবীকে এমন ভালোবাসে—মনে হয় তোমার মেয়ে হেঁটে গেলে ও বোধহয় বুকখানাই পেতে দিতে পারে।

—বাসু বেশ সুখী ত?

—নিশ্চয়। দেখতে পাও না—একটা দিন থাকতে চায় তোমার মেয়ে?

অসিত কথা বলেন না। মেয়ের সুখেই তাঁর সুখ। নইলে শেয়ারের খবরাখবর নিতে গিয়ে অনেক খবরই তিনি পান। উড়ো উড়ো কানে আসে। ম্যাডান ষ্ট্রীটের ফার্ম নাকি চোখে ধোঁকাবাজি। স্পেক্যুলেশনের লোভ দেখিয়ে সোনার হরিণদের ধরাই নাকি ঐ ফার্মের কাজ। নিশীথ নাকি তার পার্টনার চ্যাটার্জি-র সঙ্গে সেই কারবারে আছে। আর স্পেক্যুলেশনের ফাটকা খেলতে এসে ফেঁসে যায় যদি কোনো অনভিজ্ঞ স্বর্ণলোভী—সে দোষ নিশীথের নয়। কখনোই নয়। কেয়া চ্যাটার্জি ঐ চ্যাটার্জির বৌ। শোনা যায় তার ভূমিকা-ও নগণ্য নয়। পতঙ্গদের প্রলুব্ধ করে তারই সোনালী রূপের চমক।

নিশীথের সম্পর্কে কেউ বিশেষ কিছু স্পষ্ট বলতে পারে না। নিশীথ মদ খায় না, নিশীথ মিষ্টভাষী, নিশীথ তবু জনপ্রিয় নয়। কেন নয়, অসিত বুঝতে পারেন না। নিশীথকে কেউ রাগ করতে দেখেনি, মেজাজ খারাপ করতে দেখেনি—নিশীথের বিরুদ্ধে কিছু বলা সত্যিই মুস্কিল। লোকে তাই বলে—ও বাবা, নিশীথ তালুকদার? সে গভীর জলের মাছ।

এই ধরণের মন্তব্য ভালো লাগে না অসিতের। এটা খুব গৌরব করে বলবার মতো পরিচয় হলো না। কি করা যাবে, তিনি অন্যদিকটা ভাবতে থাকেন। তাঁর মেয়ে স্বামী পেয়ে সুখী। তাঁর স্ত্রী তো ধরে রেখেছেন—নিশীথ তাঁদের ছেলে। তিনি নিজেও জানেন—কি আন্তরিকতা মাখা তার ব্যবহার। কি সৌজন্য তার প্রতিটি আচরণে।

অসিত মৈত্র-র মনের পনেরো আনা খুশী হয়। কিন্তু একআনা যেন খুঁত খুঁত করে। এমন নিখুঁৎ মানুষ তাঁর ভালো লাগে না। বিশ্বাস হয় না। এত নিখুঁত, এত সম্পূর্ণ কোন ব্যক্তিত্ব হয়!

নিজেকে তিরস্কার করেন অসিত মৈত্র।

মা-কে খুসী করতে বাসবী সে হীরের হার পরে। কিন্তু সে হার যেন নাগপাশ হয়ে জড়ায় তার কণ্ঠ। হীরের দ্যুতির মধ্যে সে যেন দেখতে পায় রাজনাথ কাউলের পরাজিত দুটো চোখের শ্রান্ত তারা-র উপর নিশীথের অফিস কামরায় আলোটা চকমক করছে।

রাজনাথ কাউল। পুরনো আমলের পাকা আই, সি, এস মানুষ। তিনি অবসর নিলে-ও সরকার তাঁকে ছাড়তে চাননা। সকল কথা বাসবী জানেনা। বিয়ের আগে সে যখন বাবা আর মালবীর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাঁটতে যেতো ভোরবেলা, কাউল সাহেবকে দেখেছে কুকুর নিয়ে বেড়াতে। কুকুরের শখ তাঁর সবাই জানে। বাবার সঙ্গে বা তার সঙ্গে কথা হয়েছে নেহাৎ-ই সৌজন্যসূচক। মালবীর সঙ্গে বরঞ্চ ঠাট্টা তামাসা করেছেন। গল্প করেছেন। বলেছেন—মিস্টার মৈত্র, আপনার ছোট মেয়েটি বড় চমৎকার।

পারিবারিক জীবনটা বড় দুঃখের। ভাসা ভাসা শুনেছে সে—কাউল সাহেবের স্ত্রী মারা গিয়েছেন অল্প বয়সে। দুটি ছেলেকে নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছে কাউল-কে। একটু বড় হলে ছেলেদের পাঠিয়েছেন বোর্ডিং-য়ে—দেরাদুনের শৈল-শিখরে। নিজের নিঃসঙ্গ গৃহে আর একজনকে এনে শূন্যতা পূর্ণ করতে পারতেন। উৎসুক পাত্রীর-ও অভাব ছিলনা। কিন্তু স্বল্পভাষী কাউল সাহেব বরাবর-ই সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন।

ছেলেরা বড় হলো। সার্থক হলো তাদের শিক্ষাদীক্ষা। কাউল সাহেবের ঘর কিন্তু তেমনই নিঃসঙ্গ। কুকুর পুষে স্নেহ-ভালবাসার শখ মেটান। ডালমেশিয়ান ও সিল্‌কি-সিড্‌নীর প্রশংসা করে কুকুর-প্রদর্শনীর শেষে ট্রফি তুলে দেন হাতে লাটসাহেবের বৌ। কাউল-সাহেব তাতে-ই খুশী।

কথাবার্তা যা কইতেন, তা ভাসাভাসা। —রোভার-এর মেজাজটা ভালো নেই। কাল বাড়ীর কাছে বাজী পুড়িয়েছে কারা—শুনে থেকে রোভার-এর নার্ভ খারাপ। আর জুলি-কে নিয়ে-ও শাস্তি নেই। জুলি আজকাল দুধ খেতে চায়না। অথচ ডিম ধরাবার সময়-ও হয়নি। কি যে করা যায়!

শুনলে মনে হবে এক স্নেহকাতর পিতৃ হৃদয়ের উৎকণ্ঠার কথা শোনাচ্ছেন কাউল সাহেব। কিন্তু রোণাল্ড্ ও জুলির চোখ যেন কথা কয়েছে মনিবের কথা শুনে। তারা অল্প অল্প ডেকে বুঝিয়েছে, যে এই নিঃসঙ্গ হৃদয়টিতে তারাই হলো সকল উৎকণ্ঠা উদ্বেগের একমাত্র ভাগীদার। আর কেউ নেই সেখানে।

আর কিছু জানেনা বাসবী। জানতে সে চায়নি। ব্যারাকপুরের বাড়ী খোঁজ করে যেদিন কাউল-সাহেব এলেন—আর নিশীথের সেই অফিস কামরায় বসে কথা কইলেন বন্ধ দরজার ওপাশে—সেদিন বাসবী মনে মনে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেনি। এই সম্মানিত বৃদ্ধ মানুষটির জীবনের কোথায় কোন্ গুপ্ত পাপের গ্রন্থি আছে, যার সূত্র টেনে নিশীথ তাঁকে এখানে এনে ফেলেছে? আর সেই সুঠাম শরীর এমন বেঁকে গেল কি করে?

বেরিয়ে যাবার সময়ে সে স্পষ্ট দেখলো হাত যেন থর থর করে কাঁপছে তাঁর। মুখ লাল হয়ে উঠেছে। নিশীথ বললো—পরশু আমি অপেক্ষা করবো।

বাসবী সেদিন নিশীথের হাত ধরে পা ধরে অনুনয় করে। বলে—তুমি এমন কাজ ক'রোনা। এরা তোমাকে অভিশাপ দেয়-না? তোমার ভয় করে না? কেন, কি করেছেন কাউল সাহেব?

নিশীথ তাকে শক্ত হাতে বসিয়ে দেয় চেয়ারে। বলে—বাসবী, সব সময় মেলোড্রামা ক'রো না। তুমি জানো ও লোকটা ভেতরে ভেতরে কতবড় অপরাধী? জানো তা? বাইরেটা দেখে-ই বিচার করো তোমরা। তাই দানবকে দেবতা দেখ—

—আর দেবতাকে দেখি দানব, তাই না নিশীথ?

বাসবীর কণ্ঠে বিদ্রূপ ফোটেনা। ফোটে শুধু দুঃখ। নিশীথ হাসে। বলে

—তোমার গলায় শ্লেষবিদ্রূপটা তেমন আসে না। যাক্‌গে। ঐ যে ওর বাড়ী, গাড়ী, ছেলেরা বড় বড় কাজ করছে—ছেলেদের বিয়ে দিচ্ছেন হোমসেক্রেটারী আর ফিনান্সের বড়কর্তার ঘরে। এদিকে ওর স্ত্রী যে না খেতে পেয়ে মরছে সে খবর রাখ?

—মিথ্যাকথা নিশীথ। ওঁর স্ত্রী বহুদিন আগেই মারা গিয়েছেন।

—সে তো কাউলের কথা—বৌ মারা গিয়েছেন! বেশ! মারা গিয়েছেন! তবে কেন, তুমি তো খুব ব্রীফ ধরছো ওঁর হয়ে—তুমিই বলনা কেন—তবে কেন ঐ কাউল সাহেব বম্বের চৌপাট্টিতে শান্তা প্যাটলকে মাসে মাসে টাকা পাঠান? শান্তা প্যাটল—যে নরসিং প্যাটেলের সঙ্গে থাকে? যে লোকটা মহালক্ষ্মীতে রেসের বুকি।

—কোথা থেকে এত খবর পাও নিশীথ? কে বললো তোমায়?

—পাপ কখনো লুকানো থাকে না, জানলে? কাউলের বৌ অনেকদিন হলো কাউলের-ই এক ক্লার্কের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। ক্লার্কের কপালে অত মেজাজী মেয়ে সইবে কেন? হাত ফেরতা হয়ে নাম বদ্‌লে সে গিয়ে পৌঁছলো প্যাটেলের ঘরে। এখন ড্রাগ ধরেছে।

—কাউল কি করবেন?

—কেন, ছেলেরা অমন রোজগারী—স্বামী অমন অবস্থার লোক—মাথায় করে না হোক ঘরে এনে রাখুক তাকে?

—যোগাযোগটা ঘটাচ্ছে কে, তুমি?

—যোগাযোগ আর কি—কিছু টাকা পেলে-ই মহিলাকে রাখা যায় বম্বেতে। থাকতে পারেন কোন-ও বোর্ডিং-এ—কোনো হাউসে। বম্বে-তে জায়গার অভাব কি?

মনেমনে বাসবী আর একখানা মুখ দেখতে পায়। শরীর ও মনে রিক্ত নারীত্বের এক কুশ্রী অবমাননা। ভেবে দেখে, কাউলের ঘরে তার ছেলেদের, বৈবাহিকদের মধ্যে সেই সরকারী আদবকায়দা আর

সম্মানের মধ্যে সহসা যদি ছেলেদের মা—যাঁকে সকলে মৃত বলে জানে ও মানে—তিনি এসে উদয় হন তবে কত সহজে ভেঙে যেতে পারে সৌধ। মনে হয়—এলী আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলো—পারেনি। মনে হয় এলীর বিধ্বস্ত জীবনের পাপ তার এই সাজানো ঘরে নিয়ত ছায়া ফেলে আছে। আবার এখানে-ও যদি তেমনই কিছু হয়? শুধু কি নিশীথকে অভিসম্পাত দেয় লোকে? তাকে দেবে না? বলবে না—যে মুখে বলতে পারছিনা কলঙ্কের ভয়ে, কিন্তু মনে মনে প্রতি নিয়ত—সদা সর্বদা আমরা অভিযুক্ত করছি তোমাকে। আমাদের জীবন ভেঙে চুরে দিয়ে, আমাদের টাকা নিয়ে তোমার এই সব। তুমি অভিশপ্ত। আমাদের ভাঙা হৃদয়ের অভিশাপ তোমাদের প্রতি-নিয়ত অনুসরণ করছে।

আবার আর একজন। আবার আরো এক বোঝা অভিশাপ। বাসবী নিশীথকে বলে

—কত টাকা চেয়েছেন তিনি?

—আহা, তিনি কি চেয়েছেন—তবে হাজার পাঁচেক টাকা হলে তাঁকে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—পাঁচ হাজার টাকা!

—পাঁচ হাজার টাকা।

বলে নিশীথ এই সময়ে-ও কেমন কৌতুক করে হাসতে পারে। বলতে পারে—বুড়ো ঘাগী কম নয়। পাঁচ হাজার টাকা ওর কাছে কিছু নয়। বলছে ছেলেদের সব বুঝিয়ে দিয়েছে। এখন হাত পড়লে ছেলেরা সন্দেহ করবে।

নিশীথকে যারা কথা দেয়, তারা কথা রাখে। পরদিন আবার আসেন কাউল। দরজার ফাঁক দিয়ে কথা ছিটকে ছিটকে পড়ে। কাউল বলেন—তার হোম জানিয়েছে শান্তার অবস্থা ভাল নয়। বাঁচবে না সে। যতদিন-ই বাঁচুক, আমার আয়ু তার চেয়ে বেশী হবে। তুমি জেনো তালুকদার, সর্বদেশে সর্বকালে—ব্ল্যাকমেইল সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর সে অপরাধ সহ্য করাও পাপ। যেদিন শান্তার

মৃত্যু খবর পাব—সেদিন থেকে তুমি সাবধানে থেকো তালুকদার। সেদিন আর আমি কোন কথা শুনব না। তোমাকে আমি শিক্ষা দেব।

নিশীথ হাসে। বলে—অনেকটা পথ যাবেন। মেজাজ খারাপ করলে আপনারই কষ্ট হবে।

নিশীথকে বাসবী অনেক বারণ করেছে, তবু কাউলের ঘটনার পরেই নিশীথ ঐ হার কিনে আনে।

সেই হার পরে জ্যোতিপ্রভাকে দেখিয়ে আসতে বাসবীর শরীর যেন পুড়ে যায়।

মা-কে বলতে পারে না। বাবাকে বলতে পারে না। বলতে পারে না যে সাধকরে বিষ খেয়েছি—এখন আমি নীল হয়ে যাচ্ছি। আমাকে বাঁচাও। আমাকে ফিরিয়ে আনো। শৈশবের মতোই সকল অবমাননা, সকল কষ্ট থেকে ঢেকে রাখ আমাকে।

মনের কথা অঙ্গার হয়ে মনকেই পোড়ায়। আর বাসবীর এই সুবুদ্ধি দেখে নিশীথ খুশী হয়। সে সব রাতে তার প্রেম করতে সাধ যায়। বাধা দিতে চেয়েও পারেনা বাসবী। না, নিশীথ, না,—একথাও তার মনে মনেই থেকে যায়। নিশীথকে ভয় করে বাসবী। ভয় করে এই সব সময়ে।

বাসবীর সমস্ত অসহায় বাধা দূরে সরিয়ে নিশীথ যখন দুর্দম হয়ে ওঠে, তখন বাসবীর অবমানিত দেহ মনের জ্বালা দুই চোখে বিফল অশ্রু হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে।

এমন করে আর কতদিন যাবে? কেয়া চ্যাটার্জির ক্রুর মুখখানা মনে পড়ে। কেয়া চ্যাটার্জি নেশার ঘোরে বলছে—হ্যাঁ বাসবী তালুকদার, আমি মদ খাই,—তুমি আমায় ঘেন্না কর। কিন্তু এখানে আমাকে নামাল কে? নামিয়েছে তোমার স্বামী—ঐ নিশীথ তালুকদার। ভেবনা তোমাকে ও ঐ আলমারীতে সাজিয়ে রাখবে। একটা গোটা মানুষকে ভাল লাগেনা নিশীথের। ওর ঐ হাতে মানুষটাকে দলে মুচড়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে, তবে ওর ভাল লাগে।

কেয়া আর নিশীথ। দুজনে দুজনকে বিষাক্ত সাপের মতোই অবিশ্বাস করে। তবু বাসবী জানে—ঐ দুজনে মনেপ্রাণে অনেকটা দোসর।

কেয়ার মুখেচোখে তার জীবনের স্বাক্ষর আছে। নিশীথের নেই। এই যা তফাৎ।

বাইরের একটা সুখী জীবনের অভিনয় করে চলা আর অন্তরে অন্তরে জ্বলে জ্বলে মরা এমনি করে-ই কি চলবে জীবন? মনে মনে ভাবে বাসবী। রাতে শুয়ে ঘুম আসেনা চোখে। জোড়াতালি দিয়ে দিয়ে নিশীথের জীবন সম্পর্কে সে যে পরিচয়টা জেনেছে, সেটা-ই নানারঙা একটা ছবির মতো তার দুই চোখের পাতা জুড়ে থাকে। শিলিগুড়ির নিশীথ তালুকদার—বাইশ বছরের যে ছেলেটা কাজের খোঁজে এসেছিলো কলকাতা—ম্যাণ্ডেভিলার চ্যাটার্জি যাকে দেখে বিশ্বাস করে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। কি হলো তিন বছরের মধ্যে জানেনা বাসবী। শুধু শুনেছে চ্যাটার্জি একটা বদমায়েস। নিজের স্ত্রী-র টাকায় ব্যবসা করতে নেমে স্ত্রী-কে ডুবিয়েছে। চ্যাটার্জি না কি মূর্খ।

শুনেছে যখন এই ভেবে আশ্চর্য হয়েছে বাসবী, যে নিশীথ কেমন ক'রে, কোন্ লজ্জায় পরকে এমন সমালোচনা করে? সে নিজের সম্পর্কে কি কানা? না এই দুনিয়ার নিশীথ-রা অমনই হয়?

তারপরে ইভামিত্র। সেই মমতাভরা বিষণ্ণ মুখখানি যেন ভুলতে পারে না বাসবী। ইভামিত্র-র সঙ্গে সঙ্গে-ই এলী-র মুখ মনে পড়ে। মনে পড়ে কাউলের হতাশ দৃষ্টি। এলী চলে গেছে সুদূর লাহোরে—চাকরী নিয়ে কলেজে। কাউলের হতভাগ্য স্ত্রী আজ-ও বম্বের-কোনও দাতব্য হোমের নোংরা চারপাই-এ শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছেন কি না সে জানেনা।

এমনি আরো কতজন আছে? সবিতার দিদি ললিতা কেন আত্ম-হত্যা করেছিলো? সবিতা-ই বা কেন মানা করতে এসেছিলো বাসবীকে? সে সব কথার জবাব বাসবী কোনদিন-ও পাবেনা।

এদের সকলের চেয়ে তার ট্র্যাজেডি আরো অনেক বড়।

বাসবী নিশীথকে-ই ভালবাসে। তবু ভালবাসে। তবু নিশীথের সুষুপ্ত সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে তার মন তন্নতন্ন করে নিশীথের মধ্যে এককণা শুভসত্তা খুঁজে চলে। ছাই-এর তলায় যদি এতটুকু সোনা-ও থাকে, তবে সেটুকু নিয়ে-ই ধনী হবে বাসবী। তাই নিয়েই সে বাঁচবে। তবে বে-দিশা এক হারামণির সন্ধান করতে গিয়ে সে যে কালীমেখে মাখামাখি হয়ে গেল এই যা দুঃখ।

নিত্য নতুন অন্যায়ের সঙ্গে হাতমিলিয়ে চলতে গিয়ে নিজের পায়ের তলার মাটি সে যে হারিয়ে ফেলেছে, সে কথা কাকে বলবে বাসবী?

যে জোড়াতালির জীবনটা বাসবীর কাছে অসহ্য বোধ হয় নিশীথ তাতে-ই অভ্যস্ত। কেটে চলে দিন। নিশীথের অফিস ঘরে বাতি জ্বলে গভীর রাত অবধি। ফোন বেজে বেজে ওঠে। কেয়া চ্যাটার্জি নিশীথের চিঠি টাইপ করে। থেকে থেকে-ই টাকার দরকার হয় নিশীথের। গোপন পাপ, লজ্জা ও কলঙ্কের নজীর ফোটোসটাট্ কপি-তে আর চিঠিতে ধরে বেড়ায় নিশীথ। সে সব নজীর এসে জমা হয় কোথায়, তা জানে বাসবী। ঐ লোহার সেফের দেরাজে দেরাজে তাড়া বাঁধা ফাইলে।

বাসবীকে নিয়ে নিশীথ পার্টি-তে যায়, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। নিশীথের পাশে বাসবীকে যে দেখে, সে-ই বলে যেন রাজ-যোটক। নিশীথের সুন্দর দীর্ঘ চেহারা, মোলায়েম সাদা পাঞ্জাবী। কাঁধে মাদ্রাজী চাদর—মিহি ধুতির কোঁচা লুটিয়ে পড়ে সাদা কটকী চটির ওপর—সৌজন্য ও আভিজাত্যের এক প্রতিমূর্তি যেন।

তিনবছর আগে রুবিমল্লিকের এক মুনলাইট পার্টি-তে যে বাসবীকে দেখে এগিয়ে এসেছিলো নিশীথ তালুকদার—প্রথম প্রেমের দিনগুলির উত্তপ্ত সৌরভে যার কমনীয় সৌন্দর্য মোমের মতো-ই গলে গলে পড়তো—সে বাসবীকে আজ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। সে কোমল মমতা, সে অনাবিল সরল সৌন্দর্য বোধ হয় পছন্দ ছিলোনা নিশীথের। বাসবীর হৃদয় ও অনুভূতি গুলি তাই নিশীথ তিনবছর ধরে সযত্নে টেনে টেনে চড়াতারে বেঁধে রেখেছে। বীণের তার উদারা থেকে মুদারায়

সে-ই তোলে, যে প্রকৃত গুণী যে সেই উদ্বগ্রামে-ও অনায়াসে ললিত পঞ্চম বাজিয়ে চলে যেতে পারে। কিন্তু নিশীথ কোন সুর সৃজনের অভিলাষী নয়। তাই বাসবীর হৃদয়মন সে পর্দায় উঠে থরথর ক'রে কাঁপে। কাঁপে যন্ত্রণায়, কাঁপে হতাশায়।

বাসবীকে যে সব পূর্ব পরিচিত-রা দেখে তারা তার পরিবর্তনে অবাক মানে। বাসবীর স্নায়ু যেন রিণরিণ করছে—সে চেঁচিয়ে হাসে—কথা বলে চেঁচিয়ে—দুইহাত সতত অস্থির। আঙুলগুলো কখনো খুলছে, কখনো মোচড়াচ্ছে, কখনও শুধু-ই মুঠো করে ধরছে হাত। চলাফেরার মধ্যে একটা সতর্ক সজাগ ভাব। দুইচোখ অস্থির—সর্বদা ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে পেছনে দেখছে—ব্যাধের ভয়ে ভীত কোনো পাখী যেন। আঁচলটা বারবার পিঠে ঢেকে দেয় বাসবী। ঘাড়ের ওপরে এখনো দুটো আঙুলের দাগ লাল হয়ে আছে। এ প্রায় প্রত্যহের অভিজ্ঞতা।

নিশীথ যখনি হাসিমুখে ঢোকে—বলে বাসবী, কাল সন্ধ্যায় কোনো এনগেজমেন্ট রেখোনা—কাল আমি আর তুমি বুড্‌ঢা গুহ-দের পার্টিতে যাচ্ছি।

তখনি সচকিত হয়ে ওঠে বাসবী। বলে-কেন?

—কেন আবার? মানুষের কাছে মানুষ যায় না? সমাজ নেই?

তোমার সমাজ তো তোমার ঘরে উঠে আসে—সে জন্যে বাইরে যাব কেন?

বাসবীর গলাটা চ'ড়ে যায় চট করে। কাছে আসে নিশীথ। হাসে। বলে—কাকে কি বলছো? তুমি বড় ভুল কর বাসবী।

—নিশীথ তোমার মনে কি আছে বল!

—কিছু না!

বাসবীর পিঠের কাছে দাঁড়ায় নিশীথ। একদিন, নিশীথ এমন করে পেছনে দাঁড়ালে, তার গায়ে নিজেকে সামান্য হেলিয়ে দিয়ে আলতো হয়ে থাকতে বড় ভালো লাগতো বাসবীর। এখন নিশীথ পেছনে এসে

দাঁড়ালে তার গা শিরশির করে। ঠাণ্ডা হয়ে যায় হাত, মনে হয় যে হাত দুটো আলগোছে কাঁধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করছে সে হাতদুটো অজানিতে তার গলায় উঠে এলে-ও আসতে পারে। ভরসা কি!

নিশীথ বলে—কিছু না, কোনো মতলব নেই। তুমি জানোনা বাসবী, বুড়্‌ঢা আর আমি একসময় দার্জিলিং-এ একসঙ্গে ছিলাম। না গেলেই হবে না। তুমি কিন্তু খুব ভাল পোষাক ক'রো, লক্ষ্মীটি।

বাসবী ঘুরে দাঁড়ায়। নিশীথের চোখে চোখ তুলে বলে—সত্যি বলছো ত! দেখ তোমার কথাতেই কিন্তু যাচ্ছি আমি···

—নিশ্চয়। মিথ্যা ত' আমি তোমার কাছে বলি না বাসবী।

এই মিথ্যাটা-ও খুব সুন্দর করে বলতে পারে নিশীথ। অন্তত এমন করে বলতে পারে, যে বাসবী তাকে বিশ্বাস করে সহজেই।

এমনদিনে নিশীথ ভীষণ তৎপর হয়ে ওঠে। —একি বাসবী, তুমি সকালে পরিজ খাওয়া ছেড়ে দিলে কেন—তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

শঙ্করকে ডেকে বকাবকি করে। বলে—জানিস্ আমি পাঁচতালের মানুষ। মা-কে তোরা একটু দেখিস্‌না।

গরমজল আসে। মুখে ভাপ নেয় বাসবী। ঈষতুষ্ণ জলে স্নান করে সুন্দর হয়! শাদা বেনারসী ও সবুজ সিল্কের জামা পরে যখন এসে দাঁড়ায়—তখন নিশীথ বলে—নিজেকে ত' দেখতে পাচ্ছ না বাসবী ঠিক যেন সবুজ পাতায় ঘেরা শাদা গোলাপের মতো দেখাচ্ছে।

তারপর নিশীথ কথার ছলে বলে—বাসবী, তুমি প্রিয়া বসুকে চেন?

—কোন প্রিয়া বোস?

—মণ্টু বোসের স্ত্রী। মণ্টু বোস—ধানবাদের—যে মারা গেল বিলেতে। স্টেট্‌সম্যানে পড়লে না খবরটা?

—মনে পড়েছে। বেশ তো, তাতে কি?

—প্রিয়াবোসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তুমি আমাকে।

—নিশীথ!

নিশীথ বলে—মন্টু বোস সুইসাইড করেছিল জানো ত ?

—তাতে তোমার কি নিশীথ ? ও, এই তোমার মনের কথা ? এই জন্যে সাজতে বলা আমায় ? ছি ছি নিশীথ—কখনো কি তুমি পরিষ্কার হতে পারো না ? সোজা কথা বলতে পারো না ? না, নিজে যা করো করবে। আমি যাবোনা তোমার সঙ্গে।

—বাসবী !

অক্ষম হতাশায় কাঁপতে থাকে বাসবী। খুলে ফেলে খোঁপা – ছড়িয়ে ফেলে চুল—গলার গহনা ফেলে দেয় খাটে—শাড়ীর আঁচল ঘুরিয়ে খুলে ফেলে শাড়ী।

নিশীথ এগিয়ে এসে ধমক দেয় রুক্ষ কণ্ঠে—কি হচ্ছে ?

—না, যাব না আমি !

নিশীথের হাত এবার বেশ স্থির লক্ষ্যে নেমে আসে বাসবীর ঘাড়ের পরে। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে বাসবী। নিশীথ তার মুখ চেপে ধরে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাসবীকে খাটের ওপর। বন্ধ করে দরজাটা। খাটে বসে হাঁপাতে থাকে বাসবী। নিশীথ কাটা কাটা কথায় হুকুম করে

—চুল বাঁধ, ড্রেস কর—

অপমানে কাঁদে বাসবী। নিশীথ কাপড় নতুন করে বের করে দেয়। বলে—আর ন্যাকামি ক'রো না বাসবী। সহ্য হয় না।

মাটি-ও ফাঁক হয়ে যায় না, বা অন্য কোন অলৌকিক উপায়ে লজ্জা নিবারণ হয় না বাসবীর। সেই চুল ফিরে বাঁধতে হয়। পোষাক করতে হয় নতুন ক'রে। বেরুবার মুখে ড্রেসিং টেবিলটা হাতড়ে লিপস্টিকটা ছুঁড়ে দেয় নিশীথ খাটের ওপর। বলে—ঠোঁটটা ঘষে নাও।

এত ঘটনার পর পার্টি-তে এসে বাসবী অকারণ উত্তেজনার আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখে নিজেকে। আর নিশীথের উপর্যুপরি ইসারা ইঙ্গিত মেনে প্রিয়াবোসের কাছে ঠিকই এগিয়ে যায়। বলে—প্রিয়াদি, অনেকদিন পরে দেখা। আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার আলাপ করাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

নিশীথকে দেখেই প্রিয়াবোসের জহুরী চোখটা কুঁচকে ছোট হয়ে

আসে। নিশীথের মধ্যে বুঝি বা সে কিছুটা বিপদের আভাস দেখতে পায়। নিশীথ করজোড়ে নমিত হয়ে এগিয়ে আসে। বলে—আপনার আদিবাসীদের পুতুলের কথা কত যে শুনেছি—একদিন আসুননা আমার বাড়ীতে? অপূর্ব না হোক, কিছু সংগ্রহ আমারও আছে। দেখলে আপনার ভাল লাগতো।

—সত্যি?

চোখটা ছোট রেখেই প্রশ্ন করেন প্রিয়াবোস। বাসবী এবার সরে যায়। নিশীথ আর প্রিয়াবোস কোণের দিকে গিয়ে বসে।

ব্যুফে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বুড্‌ঢা গুহ বাসবীকে অনুরোধ করে—গরীবের হয়ে একটু স্বজনকে আপ্যায়ণ করুন না?

—বা, আমি খাবনা বুঝি?

—আপনাকে দেখতে আমি-ই আছি। কিন্তু এখন?

বুড্‌ঢা এমনভাবে আগেও ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে। বাসবী সে কথা নিশীথকে বললে নিশীথ বলেছে—ও সব পিউরিটান কথাবার্তা ছাড়ো। বুড্‌ঢা যদি একটু আন্তরিক হতে চায়, হতে দিও। বলো কি, লোকটা যাতেই হাত দেয়, তাতেই সোনা ফলে। ইম্ফল রোডে হাতীর কণ্ট্রাক্ট নিয়ে কি বাঘের খেলাটা খেললো বল তো?

এইরকমই কথা নিশীথের। আজ, দাঁড়িয়ে বুড্‌ঢার কথা শুনতে শুনতে বাসবী স্পষ্ট অনুভব করতে পারে—ঘাড়ের ওপর দাগটা তার এখনো ব্যথা করছে। কেমন যেন বে-পরোয়া হতে সাধ যায়। খুব হেসে ঈষৎ ঝুঁকে বলে

—আমার কিন্তু নালিশ আছে বুড্‌ঢাবাবু। আপনি আমাকে মোটেও যত্ন করছেন না। কই, আপনার সেই ঘোড়াকেনার গল্প তো শুনলামই না। ব্রাউনের বৌ নাকি আপনার ঘোড়া ভাঙিয়ে নিচ্ছিল গত রেস-এ? সত্যি?

বাসবীর কথা শুনে বুড্‌ঢা যেন ধন্য হয়ে যায়। বলে—আমি সর্বদাই আপনার কাছে কাছে আছি মিসেস তালুকদার—আপনিই দেখতে পান না আমাকে।

বাসবী আর বুড্‌ঢা এককোণে দাঁড়িয়ে সামান্য কথার সূত্র ধরে ধরে হেসে আকুল হয়। বাসবীর হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

বুড্‌ঢা-র এই হল ঘরের আইডিয়া আমেরিকার ফ্যাসন ম্যাগাজিন থেকে নেওয়া। স্বাভাবিক কাঠের রঙের দেওয়াল, মেঝেতে কার্পেটে গাছের পাতার আলোছায়ার আলপনা। বারশিংগা হরিণের মাথা টাঙানো সারি সারি। তার ভেতর থেকে আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ে। দেওয়ালে রেডইণ্ডিয়ানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিকারের পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র সাজানো। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে এককোণে কাঁচের কোন একটি বাঘকে জড়ানো সাপের সুবৃহৎ মডেল। এমনভাবে আলো সাজানো আছে, যে বিভ্রম হয়—সাপটা হয়তো বা সত্যিই পেঁচিয়ে ধরছে বাঘটাকে।

এই সব কিছুর ওপর আলোর নরম আভা পড়ে। কথাবার্তার গুণ্ গুণ্, হাসি—বাইরে থেকে ব্যাঙের বাজনা ভেসে ভেসে আসে।

ছন্দপতন যে একেবারে হয় না, তা নয়। পেছনের দিকে ছড়ানো ছেটানো চেয়ারগুলোতে বসে থাকে তারা, যারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত অথবা কোন কারণে অসহজ বোধ করছে। ভিভিয়ান বুড্‌ঢা গুহ-র উপরোধে বড্ড বেশী মদ খেয়েছে। তার পাশে বসে চিত্রিতা শুধুই বলে—ওঠো, ডার্লিং, বাড়ী চলো। রাত হচ্ছে না?

ভিভিয়ান ততই বলে আমেজী গলায়, ছোট ছোট ক'রে স্বগতোক্তির মতো—শয়তান! শয়তান ওকে ভর করেছে। দেখেছো চিত্রিতা, হাসছে কি রকম? প্রিয়াবোসের সঙ্গে? ইস্, এখানে কতজন আছে ওর মুখোসটা খুলে দেয়না কেউ? কেউ পারে না? আমাকে একটু নিয়ে যাবে চিত্রিতা? দিদির নাম ক'রে আমি লোকটাকে শিক্ষা দিই ভালভাবে? ভাবতে পারো?

ভিভিয়ানের মা বলে চলেন মিসেস বাসুদেবকে—ঐ বদ্‌মায়েসটাকে বিয়ে ক'রে মৈত্র-র মেয়ে কি রকম বদলে গিয়েছে দেখেছো? ঐ লোকটা! সত্যি মিসেস বাসুদেব, ওর জন্যে আমার মেয়ে চলে গেল সেই লাহোর। আর ফিরবে না। বলো, ভাল লাগে কিছু?।

বাসবীর হাতে গলায় কানে হীরের ঝলকানি মিসেস রায়ের চোখ এড়ায় না। স্বামী না কি নিত্য নতুন সেট কিনে দেয় ওকে। এই সবই তাঁর মেয়ের হতে পারতো, এ কথা যত মনে করেন, ততই মিসেস রায়ের মন খারাপ হয়ে যায়।

অন্যদিকের কোণার টেবিলে বসে শিল্পী সুগত মিত্র বার বার বাসবীকে দেখে, আর বুড্ঢা-র বোন বিশাখার সঙ্গে গল্প করে। বলে

—এমন পরিবর্তন আমি দেখিনি, জানো?

—কি সুগত?

—ঐ বাসবীকে বিয়ের আগে দেখেছি। ওর বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে কিছু পোর্ট্রেট আঁকাতে। বাসবীকে মডেল করে আমি আমার শকুন্তলা সিরিজ এঁকেছিলাম, জানো?

—কোন্‌টা? যে ছবিগুলো সরযূদেবী কিনেছিলেন?

—হ্যাঁ, সেই চারখানা। কিন্তু সেই বাসবীর সঙ্গে এই বাসবীর এতটুকু মিল নেই। আমি নজর কবে দেখছিলাম বিশাখা—চেহারা অক্ষুণ্ণ রেখে এমন করে ভেতরটা পালটে ফেলতে কারুকে দেখিনি আমি। এইরকম খেলো পোষাক! আমি ভাবতে পারি না।

—তার চেয়ে তুমি আমাকে দেখ সুগত। আমার সামনে বাসবীকে বার বার দেখলে আমার হিংসে হবে না?

—তুমি হিংসে করবে বাসবীকে? না, বিশাখা, তুমি বুঝতে পার কিনা জানি না, বড় হতভাগ্য বাসবী। ঐ মানুষটি—ঐ নিশীথ তালুকদাব—

—তুমি কেমন করে জানলে?

সুগত মিত্র ছাইদানীতে সিগারেটটা জোর করে ডুবিয়ে নেভায়। বলে

—নিশীথকে জানি না। তবে শিলিগুড়ির ললিতা বসুকে জানতাম। তার কথা আমি ভুলতে পারি না বিশাখা। কালো রং—কিন্তু অমন মুখ আমি দেখব না।

—কি যে বলছো সুগত বুঝতে পারছি না আমি। ললিতাকে জানতে, তার সঙ্গে নিশীথের কি?

—কিছু না। বিশাখা, ছুনিয়াটা বড্ড ছোট। আমার ছবির শকুন্তলা এমন করে বদলে গেল।

—তুমি বড্ড মদ খেয়েছো সুগত। তাই আজে বাজে বকছো!

সুগত আর কথা বলে না। তবে নিশীথের স্ত্রী বাসবী তালুকদারের দিকে চেয়ে চেয়ে যেন বোঝে, তার জীবনের প্রথম প্রেম ললিতা কেন আত্মহত্যা করেছিলো। ঐ লোকটার মধ্যে কি আছে? নিশীথ একটা গোলাপের কুঁড়ি নাড়াচাড়া করছে। সুগত চেয়ে চেয়ে ভাবে—নিশীথের আঙুলের ছোঁয়া লেগে ঐ ফুলের পাপড়িগুলো যদি শুকিয়ে ঝরে পড়তো, সে-ই যেন মানাতো বেশী। সেটাই যেন স্বাভাবিক হতো। কি আছে নিশীথের মধ্যে? কেন মেয়েরা এমন করে তাকে জড়ায়, আর বদলে যায় তার পরে-ই!

সুগত মিত্র-র মাতাল মাথা সে প্রশ্নের কোনো দিশা পায় না।

তবে ভিভিয়ান, মিসেস রায়, বা সুগত-র মনের কোনো উত্তাপ নিশীথকে স্পর্শ করে না। প্রিয়াবোসকে আমন্ত্রণ তার সম্পূর্ণ হয়।

বাড়ী ফিরে বাসবীকে আদর করে নিশীথ। অবমাননার সে শেষ অধ্যায়কে ভয় করে বলে-ই বাসবী যেন পার্টি ছেড়ে আসতে চায় না। নিশীথ বলে—চলো, বাসবী চলো।

বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায় বাসবী নিজের ঘরে। কিন্তু নিশীথ তার চেয়ে দ্রুত। এমন একটি নিখুঁত নিটোল সন্ধ্যার পর—মনটা যখন নিশীথের সত্যিই খুশী -আর বাসবী যখন এমন বাধ্য মেয়ের মতো ব্যবহার করেছে—তখন নিশীথ কেমন ক'রে বাসবীকে তার কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারে?

উত্তেজনার শেষে অবসাদ ও ক্লান্তিতে বাসবীর শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে। নিশীথ বলে—তুমি ক্লান্ত বাসবী—আমি তোমায় সাহায্য করছি। তুমি ভাবছ কেন? বাসবীর পোষাক বদলে দেয় নিশীথ—শাড়ী ভাঁজ করে তোলে। গহনা খুলে দেয়। গরমজল তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয়। তারপর সুরু হয় আদর আর অপরাধের স্বীকৃতি। ঘাড়ের

পেছনে ক্রীম ঘষে দেয় নিশীথ। আলতো আঙুলে, যেন ছোঁয়াতেই ব্যথা লাগবে বাসবীর।

এখন বদ্ধঘরে, নীল আলোর আবছায়া—নিশীথের কথাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে এক অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করে—ভালবেসে যেন কোনো জন, প্রেমিকজনকে নিশানা দেবার জন্যে কণ্ঠহার ছিঁড়ে মুক্তা ফেলে দিচ্ছে। সযত্নে—সন্তর্পণে—যেন একটি মুক্তাও হারিয়ে না যায়। নিশীথের কথাগুলি সেই মুক্তার মতো লাবণ্যময়।

—বাসবী, শোন, কাছে এসো। কি হয়েছে? লেগেছে? এসো হাত বুলিয়ে দিই আমি। কি হয়েছে? রাগ করেছ? এমন অবুঝের মতো কর কেন? বাসবী?

যে নিশীথের হাতে তার এত লাঞ্ছনা, সেই নিশীথকেই জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা কেমন করে চায় বাসবী? মন তার বিদ্রোহ করে যে আত্ম-সমর্পণে—দেহ কেন তারই উত্তাপে গলে গলে পড়ে মোমের মতন?

শেষ রাতের আগে আঁধার শেষবারের মতো নিবিড় কালো হয় আকাশে—নিজের দুই সত্তার দ্বন্দ্বে কালো হয়ে যায় বাসবী। নিথর হয়ে চুপ ক'রে থাকে।

আর নিশীথের সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানা আবার যেন স্বচ্ছ হয়ে ওঠে বাসবীর চোখে। তবে সে চোখের মধুর বিভ্রম নয়। জানালার ওপারে আর একটা দিন আসছে। স্বচ্ছ হয়ে আসছে আকাশ-ও।

ঘুমের ওষুধ খায় বাসবী উঠে গিয়ে। জলের গ্লাস থেকে জল ছিটিয়ে দেয় চোখে মুখে মাথায়। তারপর—চোখের পাতার আঁধারে অনেকগুলো বেদনার তীর বিঁধিয়ে ওষুধের কাজ সুরু হয়। ঘুম নামতে থাকে চোখে।

বাসবীর অসম্বৃত শরীরটার ওপর চাদর টেনে দেয় শঙ্কর। চেয়ে দেখে, মেয়েটার চোখের নিচে মোটা হয়ে কালি পড়েছে। ঘুমন্ত বাসবীর মুখখানা কেমন অসহায়। দেখে মমতা হয় শঙ্করের।

এমনি করেই কেটে চলে দিন। প্রিয়াবন্ধুর সঙ্গে নিশীথের পরিচয়টা

শেষ অবধি কোনো পরিণতিতে পৌঁছয় না। মাঝখান থেকে বাজি মেরে যায় বুড়ো গুহ। নিশীথের তাড়নায় বাসবী মিছে-ই বুড়োর সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে মরে। নিশীথ প্রিয়াবসুকে তার ডাক্তারের কথা বলে কবজা করতে চেষ্টা করে। নিশীথের ঐকান্তিক চেষ্টায় সুন্দর একটা কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয়েছিলো। প্রিয়াবোসের স্বামী মণ্টু বোসের অগাধ টাকা। কলিয়ারীর ব্যাপার, মার খাবার কথা ওঠে না। স্ত্রীকে সবই দিয়েছিলেন তিনি, নিজেকে দিতে পারেন নি। মণ্টু বোসের জীবনটা অভিশপ্ত। হৃত পৌরুষ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাচীন চীনে দাওয়াই গণ্ডারের শিং-এর চূর্ণ আর জার্মানীর ইহুদী ডাক্তারের বেনামী ইন্‌জেক্‌শন—কোনো কিছুই বাদ দেননি মণ্টু বোস। তবু কিছু হলো না।

সকলেই ভেবেছিলো প্রিয়াবোস তারপরে-ও স্বামীকে আঁকড়ে থাকবে না। বিবাহ বিচ্ছেদ ক'রে স্বচ্ছন্দে সে টাকাপয়সা নিয়ে সরে যেতে পারবে। কেলেঙ্কারীর ভয় করবে মণ্টু বোস—মামলার দরকার হবে না।

কিন্তু প্রিয়াবোস সকলের ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করলো। সে হলো প্রাকবিবাহ যুগের মোনালিসা। তার স্তাবক গোষ্ঠি তার হাসি, কথা, বা ভ্রূ এলিয়ে দেবার বিশিষ্ট ও অন্যান্য ভঙ্গিমার কোনো কিনারা খুঁজে পেত না। প্রিয়ার ব্যাপারে, তার দুর্বোধ্যতা-ই ছিলো প্রধান আকর্ষণ।

দেখা গেল মোনালিসা-রা চিরদিন-ই রহস্যের সুদূর কিনারে বাস করে। প্রিয়া বোস স্বামীকে ছাড়লো না, অশান্তি করলো না—বরঞ্চ বিলিতী ডিগ্রী লাগানো অনুসন্ধিৎসু এক উঠ্‌তি ডাক্তারকে সর্বদার জন্য নিয়োগ করলো। মণ্টু বোসের বাড়ীতে হলো ডক্টর দাশ-এর লেবরেটরী। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো মানুষের আদিম অধিকার নিয়ে। পরীক্ষার পাত্র হলো মণ্টু বোস।

ডাক্তারটি সুদর্শন না হলে-ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ। আকর্ষণ আছে।

লোকে অবিশ্যি বললো, বুঝেছি সব। বুঝিনি কি? প্রিয়া বড় চালাক মেয়ে—এক স্বামী ভক্তির ঢিলে ডাক্তার পাখীটিকে মারলো।

কিন্তু লোকে অমন বলবে-ই। সে সব কথায় কান দেয় কি সুখী মানুষ?

তারপর এ দেশে বানরের গ্ল্যাণ্ডে ওষুধ পরীক্ষার পথে নানান বিপত্তি। অগত্যা অপারগ হয়ে প্রিয়া আর মণ্টু বোস স-ডাক্তার বিলেতে গেল। প্রিয়াকে ঠাট্টা করে বললো অবশ্য কেউ কেউ—প্রিয়া, তুমি যে সেকালের হিন্দু মেয়েদের মতো স্বামিভক্তি দেখালে। অবাক করলে! কি সব গল্প আছে না মাইথোলজিতে?

প্রিয়া তেমনই বনলতা সেনের মতো চেয়ে রইলো। স্বল্প হাসির মূর্চ্ছনা টেনে বললো

—কি জানো, মানুষ তো একটা সঙ্গীও চায়? ওকে একটু সঙ্গ যদি দিতে পারি, বন্ধুর মতো।

কিন্তু শেষ অবধি মণ্টু বোস আত্মহত্যা করলো।

নিশীথের অক্লান্ত চেষ্টায় জানা গেল, যে ব্যাপারটা ঘটলো ডক্টর দাশ-এর গোলমালে। অবশ্য মণ্টু বোস মারা যাওয়াতে সংসারে যে খুব ক্ষতি হলো, তা নয়! তবু যারা উৎসাহী, পরিশ্রমী, তথ্যনিষ্ঠ, তারা এরই পেছনে কার্য কারণ খোঁজে। নিশীথ প্রিয়াবোসকে জানালো, ফেরবার জাহাজের অভাবে যে ডাক্তার দেশাই ওখানে আটকে পড়েছিলো, সে যেন কি সব গল্প ছড়াচ্ছে এদেশে এসে। ডক্টর দাশ আর প্রিয়াবোস-এর সহযোগিতাতে-ই না কি সম্ভব হয়েছে ইন্‌জেক্‌শনের গোলমাল। সামান্যতম গোলমাল। ইন্‌টারভেনাস বলে-ই বিপদ হলো। আরো কি, ডক্টর দাশ না কি দেশাই-কে চিঠি লিখেছিল একটা, যার কয়েকটা লাইনের মানে দ্ব্যর্থক—গোলমেলে—কেমন যেন। অবশ্য দেশাই সে চিঠিটা দিতে পারে নিশীথকে। দেশাই লোকটা তো ভাল নয়—আবার টাকা চাইছে।

প্রিয়াবোস-এর মোনালিসা চরিত্রের বাধা পেরিয়ে নিকট হয়ে কথা কইতে অবশ্য নিশীথের বেশ কিছু কাঠ-খড় পুড়লো। প্রিয়াবোস সহসা এক আদিবাসীদের পুতুল প্রদর্শনী খুলে বসলেন। সে প্রদর্শনী থেকে একশো টাকা খরচ করে নিশীথ একটা বেঁটে পেটমোটা সর্প-দেবতার

বিশ্রী মূর্তি কিনলো। প্রিয়াবোস-এর কলিয়ারীর অনাথ ছেলেদের স্কুলের জন্য স্যালভেশান আর্মি-র নিলাম থেকে কম্বল কিনলো কয়েক ডজন।

কা কস্য পরিবেদনা। প্রিয়াবোস তার বক্তব্য শুনে বললেন—কি কাণ্ড! ঐ রকম লোক নাকি ডক্টর দাশ? লোকটাকে তাহ'লে ধরিয়ে দেওয়াই উচিত। না না, আমি কমিশনার-কে ডাকি—আপনি বরঞ্চ জানান একটু, মিস্টার তালুকদার। কে লোকটা? দেশাই? আমাদের খেমজী দেশাই? ভালই হলো। দেশাই না সরকারী কাজ নিয়েছে? না না, ডক্টর দাশ-কে আমাদের শাস্তি দেওয়া উচিত। পুওর মণ্টু, মণ্টুকে তো আর ফিরে পাব না। তবু, আর যেন সে এমন করতে না পারে—অন্তত লাইসেন্সটা তো কেড়ে নেওয়া উচিত। দাঁড়ান নিশীথবাবু—ফোন করতে দিন আমাকে। আমি বুড্ঢাকে ফোন করি একটা। আমাদের এন্‌গেজমেণ্টের কথা বলেছি? বুড্ঢা শেষ অবধি—না নিশীথবাবু, মুখে আমরা যা-ই বলি—একজন পুরুষমানুষ ছাড়া চলে কি? বলুন?

বলে কাছে ঘেঁষে বসলেন প্রিয়া বোস। নিশীথ মনে মনে মুণ্ডপাত করলো দেশাই আর দাশ-এর। কেমন যেন মনে হলো কেয়া চ্যাটার্জি তাকে জব্দ করলো। কেয়াই এই যোগাযোগের মূলে ছিলো গোড়া থেকে। দাশ হচ্ছে কেয়ার বন্ধু। মনে মনে নিজেকে, আর প্রিয়া বোসকে হাজারটা অভিসম্পাত দিয়ে উঠলো নিশীথ। প্রিয়াবোস পাখির মতো জ্বল জ্বলে চোখে তাকিয়েছিলেন। পায়ের কাছে দুটো শিক্ষিত এ্যালসেশিয়ান বাঘের মতো বসেছিলো। তাদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বিয়েতে নেমন্তন্ন করবো। আসা চাই কিন্তু! এখনো অবিশ্যি শোকের সময় যায় নি।

বুড্ঢা গুহ-র বাড়ীতে একথা নিয়ে কম আলোচনা হলো না। বিশাখা গুহ শেষ অবধি সুগতকে বিয়ে করতে রাজী করিয়েছে। সে বললো দাদাকে—জানো বুড্ঢা—তোমার—বন্ধু ঐ বাসবীর স্বামী নিশীথ—নো গুড। সুগত বলছিলো কোন এক ললিতার কথা।

বুড়্চার মতো মানুষ-ও ললিতার কথা বলতে সংযত হলো। বললো—সে কাকে বলছো? নিশীথকে আমি জানি না? ললিতার কথা আমি জানি।

—কি ব্যাপার বল তো?

—বলতে পারব না বিশাখা।

বুড়্চা বলতে পারলো না। বলতে পারলো না, যে সেই সরল নিষ্পাপ মেয়েটিকে ভালবেসেছিলো নিশীথ। অন্তত ললিতা তা-ই বিশ্বাস করেছিলো। বুড়্চা তখন কাঁচা টাকা পেয়েছে বাপ মরতে। গিয়ে বসেছে দার্জিলিং-এ। নিশীথ তালুকদার তাকে, তারই পয়সায় জগৎ চেনাচ্ছে। দুনিয়ার হালচাল গতিবিধি শিখছে বুড়্চা নিশীথের কাছে। সেই সময় নিশীথ তাকে বলে—নিয়ে আসবো একটি মেয়ে। দেখবেন! কি সব সাঁয়লী আর জ্যেঠি-র পেছনে ঘুরছেন।

ললিতা জানতো, সে যাচ্ছে বেড়াতে। সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে। সঙ্গে নিশীথের আরো বন্ধুবান্ধব থাকবে।

কার্যকালে দেখা গেল শুধু তারা দুইজন। অন্যরা আসেনি—এ্যাক্সিডেন্ট। কি করা যাবে—তারা এল না। দার্জিলিং পৌঁছে ললিতা শুনলো গাড়ী বিগড়ে গিয়েছে—এ্যাক্সিডেন্ট। রাতটা নাকি থাকতেই হবে হোটেলে।

ললিতা কেঁদে কেটে বললো—টেলিগ্রাম করো একটা নিশীথ। বাড়ীতে সকলে ভাববেন না?

—নিশ্চয়।

বলে নিশীথ সান্ত্বনা দিলো ললিতাকে।

তারপর যা হলো, বুড়্চা আজও যতবার ভাবে, ততবার-ই মাথা তার হেঁট হয়ে যায়। ঐ একটা জায়গায় লজ্জা ও মনুষ্যত্বের একটুখানি যেন কেমন করে টিঁকে আছে তার। সেই হোটেল···সেই দার্জিলিঙের বৃষ্টিঝরা রাত···ভয়ে কাঁপছে ললিতা থর থর ক'রে—বুড়্চাকে ঘরে পাঠিয়ে নিশীথ বুঝি গিয়ে বসেছিলো অন্য কামরায় আগুনের পাশে।

পরদিন নিশীথ যে ললিতাকে নিয়ে বাড়ী ফেরে, সে একটা

ভাঙাচোরা সর্বনাশ। বুড্‌ঢা বোসের নোটের তাড়া নিশীথের পকেটে ঠিকই ছিলো। খচ্‌ খচ্‌ করছিলো থেকে থেকে।

বাড়ীতে টেলিগ্রাম করা ছিলো। আজন্ম পরিচিত নিশীথ, যে নামে যশে ললিতার ভাবী স্বামী—তার সম্পর্কে ললিতার বাড়ীর একটা প্রশ্রয়ও ছিলো। তাই তিরস্কার বা শাসন তেমন পর্য্যায়ে ওঠেনি।

নিশীথ পরের দিন-ই কলকাতা আসে। আর দুই মাসের মাথায়, চূড়ান্ত এক বিপদে হতাশ ও মরিয়া হয়ে ললিতা করে আত্মহর্ত্যা। সবিতা বলেছিলো—দিদি, নিশীথদা'কে কেন জানালি না? কেন এ কাজ করলি?

ললিতা মরতে মরতে বলেছিলো,—সবিতা, নিশীথ-ই এই কাজ আমাকে দিয়ে করালো।

বেলেডোনার ডোজে ভুল ছিলো না, তবে ক্রিয়া হয়েছিলো দেরী ক'রে। সবিতার চোখের দিকে চোখ রেখে ললিতার চোখ থেকে শেষ অবধি শুধু জল-ই পড়েছিলো। মুখে কথা ছিল না।

নিশীথের সম্পর্কে বুড্‌ঢার মনটা তাই এক জায়গায় বিষিয়ে ছিলো। যেন নিশীথ তাকে বাধ্য করেছিলো এমন ঘৃণ্য বা হেয় কিছু করতে, যা বুড্‌ঢাও হেয় মনে করে।

নিশীথকে বিপদে ফেলতে পারতো বুড্‌ঢা। কিন্তু বাসবীর মুখখানা যেন তাকে নিবৃত্ত করলো। হাসতে হাসতে, কথা কইতে কইতে, হঠাৎ বাসবী যেন সব ভুলে যেত। সব কিছুর সূত্র যেন হারিয়ে যেতো তার কাছে। মুখে নেমে আসতো এক মর্মান্তিক হতাশা, এক পরাজিত ভগ্ন হৃদয়ের ছাপ। চারিদিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বার বার মনে করতে চেষ্টা করতো বাসবী, বলতো—আচ্ছা, আমি কি বলছিলাম বলুন তো?

বাসবী-র অবমাননা করেনি বুড্‌ঢা। বরঞ্চ প্রিয়াকে-ও বলেছে—আমি সম্ভ্রম করি মহিলাকে। তবে নিশীথের বৌ—মরতে ওকে হবেই। ওর সঙ্গে বাস করা চলে না।

কার্যকারণ না জানা থাকলেও নিশীথ যে হঠাৎ জব্দ হয়ে গেছে, প্রিয়াবোসের কাছে-এ কথাটা বেশ ছড়ায়। প্রিয়া আর কিছু বলে

না। শুধু বলে—নিজেকে বড় চালাক ভাবে নিশীথ তালুকদার। কিন্তু…

এইখানেই কথার সূতো ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে প্রিয়া বোস। চল্লিশ পেরিয়ে-ও নিটোল যৌবনা এক মোনালিসা। কথার সূতো-তে ইঙ্গিতের ঘুড়িটা উড়িয়ে উড়িয়ে কোন্ আকাশে নিয়ে যায়, সে খেয়াল আর করে না প্রিয়াবোস। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে গিয়ে ফোন করে ধানবাদে শ্রমিক বিক্ষোভের খবর নেয়।

বাসবীর কানে অবশ্যম্ভাবী ভাবে সব কথা আসে। জ্যোতিপ্রভা নিজে গাড়ী করে বলতে আসেন। বলেন—পুরুষ-মানুষদের কাজের জগত আলাদা। তুমি কেন বুড্ঢা গুহ-র মতো একটা লোকের সঙ্গে নিশীথ ছাড়া একলাই ঘোরাফেরা কোরছো? ওদের সমাজ জানো না? এখন যে বুড্ঢা বিয়ে করছে তোমার রমা মাসীর মেয়ে প্রিয়াকে? কথাটা কতদূর ছড়াবে, বুঝতে পারছ? নিশীথ আমাকে বললো…

—কি বললো?

—বললো, যে সে এসব কথা কিছুই জানে না। তুমি-ই নাকি বুড্ঢার সঙ্গে…ওর কথা-ও নাকি শোন না! বললো, মা, একবার গিয়ে খুব করে বকে দেবেন তো? মোটে শুনতে চায় না।

বাসবী রাগে দুঃখে, কথা কইতে পারে না। জ্যোতিপ্রভা গাড়ী থেকে আচার বড়ি—সংসারের জিনিষপাতি নামিয়ে দিয়ে যান। বাড়ী ফিরে অসিতকে বলেন—কি জানো, ওরা অন্যভাবে সংসার করে। আমাদের সঙ্গে মেলে না। বাড়ীতে সবই আছে। কিন্তু কেন যেন উড়ো উড়ো ভাব। আসলে নিশীথ অত লোকজন রেখে, অযথা আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছে তোমার মেয়ের।

আবার বলেন—কিছুটা বদলে গিয়েছে বাসবী। না নিজে এসে থাকে, না আমাদের যেতে বলে। মালবীর যাওয়া তো একেবারে পছন্দ করে না।

নিশীথের কাছে বাসবী বলে,—এমন ক'রে ঘরে বাইরে তুমি আর

আমাকে কত অপদস্থ করবে নিশীথ? এবার তুমি অন্য কিছু করো। চলো অন্য কোথাও যাই।

নিশীথ বলে—কি বলছো কি, জানো? কেয়া আমাকে কি রকম মুস্কিলে ফেলে রেখে গিয়েছে? হাজার পাঁচেক টাকা ছাড়া আমি ওর স্বামীর মুখবন্ধ করতে পারব?

—আমি দেব তোমায় টাকা।

—কোথা থেকে দিচ্ছ?

বাসবীর নিজের এ্যাকাউণ্টে লাল ঢ্যারা পড়েছে। নিশীথের নানান প্রয়োজনের কাছে সে টাকা কি! বাসবী সকরুণ হাসে। বলে—বাবার কাছে বলব।

—কি বলবে?

—বলবো, যে নতুন করে জীবন সুরু করতে চাই। সাহায্য করতে বলবো। মাথা আমার কাটা যাবে নিশীথ—তবু সে লজ্জা আর আমাকে নতুন করে কোন্ কলঙ্ক দেবে? যদি জানতাম…

—কি জানতে?

—যে তুমি নতুন করে, তোমার গত জীবনটা ভুলে আবার সুরু করবে?

মাথার চুল মুঠো করে ধরে নিশীথ। বলে—বাসবী, বুঝবে না তুমি। জীবনে যদি আমার মতো অভিজ্ঞতা তোমার হতো। মা-র স্নেহ জানি না। তাঁকে তো দেখিনি—বাবা একটা অপদার্থ। তাঁর যা ব্যবহার…

আত্ম-করুণার মোহে পড়ে নিশীথ এখন তার বাপ, মা, ও সমগ্র পরিবারের নিন্দা সুরু করবে, ভাবতেই খারাপ লাগলো বাসবীর। বললো—

—সে সব কথা থাকনা কেন নিশীথ। এ টাকা আমি চাইলে বাবা দেবেন। তবে এখন আমি আর চাইতে পারবো না। ছি ছি, এইবার চাইবো, তাই ভাবতেই যে মাথা কাটা যাচ্ছে। ঐ একটা জায়গা—

—আহা, বিয়ের পর আর মেয়েদের বাপের বাড়ী কি!

—তুমি কি বুঝবে নিশীথ, না না—আমিই যাবো। তোমাকে যেতে হবে না। আর, তুমি কি আমাকে শেষ করতে চাও, মা বাবার কাছে গিয়ে আমার সম্পর্কে কেন বানিয়ে বানিয়ে কথা গুলো বল ? তাঁরা কি ভাবেন ? মালবী বড় হচ্ছে না ?

বাসবী টাকা চায় শুনে অসিত মৈত্র কিছু বলেন না। বলেন না, যে ইতিমধ্যেই নিশীথ টাকা নিয়েছে তাঁর কাছ থেকে বার তিনেক। প্রত্যেক বারই ধার হিসেবে। একবারের টাকা শোধ করেছে। আর দেয়নি। তাঁর যা আছে, সবই পাবে বাসবী ও মালবী। তবু তাঁর নীতি-তে বাধে। মেয়েকে দেখেন নজর করে। সর্বনাশা এক যুদ্ধ এসে দেশের নীতি ও নৈতিকমান বিধবস্ত করে দিয়ে গেছে। আশ্চর্য কি যে তার ঢেউয়ের ঝঙ্কার অনেক ঘর ভাঙবে ? এই তো তাঁর মেয়ের চেহারায়, ব্যবহারে উগ্র একটা জীবনের ছাপ। বুড্ঢা গুহ-র সঙ্গে অযথা কি রকম মিশলো। মেয়ের জন্যে মনটা ব্যথিত হয়। বলেন

—বাসবী, তোর শরীর তো ভাল দেখি না। চল, কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসি।

—তা হয় না বাবা।

—কেন হয় না ?

—তা হয় না।

আহত হন অসিত মৈত্র। আর কথা বাড়ান না। বাসবী বোঝে যে বাবাকে সে আহত করলো। বুঝেও কিছু বলতে পারে না মুখে। ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকে। মনে মনে হাজারবার ঠেলে আসে কথা। বলতে চায় বাসবী

—ছোটবেলার মতোই শক্ত হাতে চেপে ধরো আমাকে। যেতে দিওনা কোথাও। জীবন সম্পর্কে কিছু-ই শেখাওনি কেন, কেমন করে আমাকে এতরকম জটিলতার মধ্যে ঠেলে দিলে ? আমি যে মরে যাচ্ছি। প্রতিনিয়ত মর্মে মর্মে শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি। ধরো আমাকে দুই শক্ত হাতে। বুঝতে দাও, যে গত কয়টা বছর এক দুঃস্বপ্ন মাত্র।

মুখে বলতে পারে না। কথাগুলি ভাষা পায় না বলে—পিতাপুত্রীর মাঝের বিচ্ছেদটা সেই বোবা কথায় ঢেউ খেয়ে খেয়ে বড় হতে থাকে। উঠে পড়ে বাসবী।

এ ঘর ও ঘর, নিজের পড়ার ঘর ঘুরে ঘুরে দেখে। পড়ার ঘরে তারই টেবিলের পাশে মালবীর টেবিল।

মালবী লিখে রেখেছে—দিদির টেবিল। হাত দেওয়া নিষেধ। মালবীর হাতের বড় বড় লেখা দেখে বুকফেটে চোখ ফেটে জল আসে বাসবীর। তার বিছানা, আলনা সব তেমনই সাজানো। এমন কি তার প্রাইজে পাওয়া ফুলদানীতে আজ-ও ফুল রেখে যান মা। এইসব জায়গায় ছিলো বাসবী। ছিলো একজন। সে জন মরে গিয়েছে।

সে মরে গিয়েছে! তাই এরা এমন করে তার সব কিছু ব্যবহারের জিনিষ পত্র সাজিয়ে সাজিয়ে রেখেছে? জ্যান্ত নেই সে এদের কাছে?

মালবী স্কুল থেকে আসে। বাসবী তাকে জড়িয়ে আদর করে। চুল বেঁধে দেয় নতুন ঢঙে। মালবীর স্কুলের কথা শোনে।

তারপর নিচে নিশীথের গাড়ীর হর্ণ বাজে। মালবীর মুখখানা সকরুণ হয়ে যায়। মুখে বলে না কিছু।

বাসবী দুই হাতে তাকে বুকে জাপটে আদর ক'রে চলে আসে নীচে। অন্তর দিয়ে বলে—এইখানে আমি ছিলাম। এইখানে আমার জীবনের এতগুলো দিন কেটেছে। সে ভালবাসায় শক্তি নেই কোন? সে ভালবাসা আমাকে শক্ত দুই হাতে ধরে রাখতে পারে না কেন? কেন আমাকে চলে যেতে হয়?

এ কথা-ও মুখে ফোটে না। নিচে গিয়ে গাড়ীতে ওঠে বাসবী। গদীতে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। শুধু কি রাস্তায়-ই আঁধার? সেই আঁধার কেটেই চলেছে গাড়ী? না—আরো আঁধার আছে। এক অন্ধকার বাসবীর জীবনমরণ অতিক্রম করে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে ছায়ার নাম নিশীথ তালুকদার। সে ছায়ার নিয়ত

অনুসরণ থেকে বাসবীর মুক্তি কোথায়? মুক্তি নেই—একেবারে মৃত্যু পর্যন্ত্য মুক্তি নেই।

এতই যদি দুঃখ তার, তবে সেকথা সে তার বাবাকে বলে না কেন? বলে মুক্তি চায় না কেন?

নিশীথ বাসবীর অন্তরের মর্মস্থলে ধরে আছে লোহার পাঞ্জায়। বাসবী নিশীথকে ভয় পায়। বাসবীর সাহস নেই। সে কিছু বলতে পারে না।

॥ ৬ ॥

পাঁচহাজার টাকা অসিত মৈত্রে-র কাছে এমন কিছু নয়। তবু এক-কথাতে-ই দিয়ে দিলেন তিনি। দেখে ভাল লাগলো নিশীথের। আর সেখানেই মরলো বাসবী। ব্ল্যাকমেইল করবার গণ্ডীটা এমন করে ছোট হয়ে আসবে, তা ভাবেনি বাসবী। নিশীথ যে ভাবেনি, তা বলা যায়না। অন্তত বাসবী এ কথা ভাবতে পারে না। যে নিশীথের অন্যান্য সব কাজের মতো তাকে বিয়ে করবার পেছনে-ও কোন পরিকল্পনা ছিল না।

মাস দুইতিন চুপচাপ কাটে। মিড্‌ল রোড-এর বাড়ী যার কাছে মর্টগেজ সে-ই গুজরাটি ভদ্রলোকের বাঙালী ম্যানেজার শুধু মাঝে মাঝে আসেন। মরামাছের মতো চোখ করে চেয়ে থাকেন নিস্পলকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশীথের দিকে। কথা বলেন কম। শোনেন বেশী। নিশীথের জবরদস্তিতে শিকদারের কাছে বসে থাকে বাসবী। কথা বলে। বলে গান শুনবেন মিসটার শিকদার? নতুন রেকর্ড? টেবিলটেনিস খেলবেন?

গান বেজে বেজে ফুরিয়ে যায়। টেবিলটেনিসে রুচি নেই শিকদারের। টেবিলে বসে মুখোমুখি গল্প করে চলে বাসবী। অর্থহীন কথার জালবুনে চলতে চলতে শ্রান্তি নামে অঙ্গ ঢেলে।

তবু এ জীবন যেন সহনীয়। নিরন্তর সে উত্তেজনার চেয়ে ভালো। মানুষ হয়ে আলোয় অন্ধ এক পতঙ্গের মতো শুধু নিশীথকে কেন্দ্র করে দেয়ালে দেয়ালে মাথাঠুকে মরার চেয়ে ভাল।

প্রিয়াবোস্‌-এর ঘটনার পর থেকে একটু যেন স্তিমিত হয়ে থাকে নিশীথ। আনাগোনা করে ঘনঘন আলিপুরের বাড়ীতে। বাসবীকে বলে—বাবা বলেছিলেন বাইরে চলে যেতে। কলকাতা থেকে দূরে। ওঁর চেনাজানা আছে। যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। একটা এরোড্রামের জন্যে রাস্তার কণ্ট্রাক্ট। মন্দ নয়। শহরের জীবনে—বুঝলে বাসবী? আমার-ও যেন ক্লান্তি এসেছে। আমি ক্লান্ত। জানলে?

নিশীথ যদি তাকে তার মনোজগতের ছাড়চিঠি দেয়, তা'হলে বাসবী-ও চিন্তা করে খানিকটা সুখ পায়। সে বলে—আচ্ছা, আমি যদি একটা কাজ করি—কোথাও কাজ নিই? ভালো হয় না? আর এতবড় বাড়ীতে সত্যিই আমাদের ত' দরকার নেই। ইচ্ছে করলেই আমরা স্বচ্ছন্দে ছোট একটা বাড়ীতে চলে যেতে পারি।

বাসবীর কাজ করবার কথাটা এমনই অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় নিশীথের, যে সে কথার কোনো জবাব-ই দেয়না সে। বাড়ী বদলাবার কথাটার-ই জোরে প্রতিবাদ করে। বলে—কি বলছো! তোমাকে যেমন করে রাখা উচিত তেমন রাখতে পারি কোথায়! এর চেয়ে ছোট বাড়ী হলে কি চলে? লোকে কি বলবে?

খুব দ্রুত, সামনে পেছনে না তাকিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলে যেমন লাগে, বাসবীর-ও হয় সেই দশা। প্রথমটা যেন এই নিরুদ্বেগের জীবনটায় অভ্যস্ত হতে-ই সময় কেটে যায়। কত রাতে ঘুম ছিল না চোখে, কত দনে বিশ্রাম ছিল না—রাত হ'তে ঘুমের ওষুধ খেতো আর পায়চারী করতো বাসবী—তার স্নায়ুজগতে এমনই এক ঝড় তুলে রেখেছিল নিশীথ।

এখন, বাইরের উত্তেজনা কম আসতে ধীরে ধীরে যেন শান্ত হতে থাকে বাসবী। শান্ত হয় বলে-ই যে নতুন করে সংসারে আকর্ষণ হয়, বা জীবনটা ভালো লাগে, তা নয়। ভালোলাগে চুপচাপ পড়ে থাকতে। কোন-ও কাজ না করে—ঢাকাবারান্দায় ডিভানে শুয়ে শুয়ে বই পড়তে। স্নানের সময় বয়ে যাক, খাওয়ার সময় বয়ে যাক—বাসবী উঠতে চায় না। দেহমন দিয়ে এই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন অবসর আস্বাদ করতে ভালো লাগে তার।

দিন কেটে যায়। কিন্তু রাত কাটতে চায় না বাসবীর। সন্ধ্যা হলে বাগানের বড় বড় গাছগুলো যেন আঁধার ঘন করে তোলে। কালো কালো বাদুড়গুলো ডানা ঝটপট করে উড়ে যায় আকাশে। কেমন যেন গা ছমছম করে বাসবীর। বাতির আলোয় ঘরের সবটুকু কোণা আলো হয় না। আঁধার যেন কোণায় কোণায়, খাটের তলায় গুঁড়ি

মেরে থাকে। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসতে চায় না চোখে। মনে হয় চোখের পাতা শুকিয়ে গেছে। চোখ বুঁজতে পারবে না সে। কেমন যেন বারবার মনে পড়ে কাউল সাহেবের কথাগুলো।

—তালুকদার, শাস্তার মৃত্যুর খবর যেদিন জানবো, সেইদিনটাকে ভয় ক'রো তুমি। সেদিন আমি তোমার উপর শোধ নেব তালুকদার? ব্ল্যাকমেইল সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধ তা জান?

বারবার মনে পড়ে প্রিয়াবস্থ-র চোখ। ঠাণ্ডা চাহনী, ঈষৎ ছোট হয়ে গেছে চোখের মণি। তাকে বলছে প্রিয়াবস্থ—বাসবী, তোমাদের বাড়ীর একটা ট্রাডিশন আছে বলে জানতাম। কি করে বিয়ে করলে নিশীথকে? কি আছে নিশীথের মধ্যে? চেহারাটা ছাড়া? দয়া, হ্যাঁ দয়া হচ্ছে বাসবী তোমার জন্যে।

মনে পড়ে নিশীথের খাতিরে সে বুড়্ঢা গুহ-র সঙ্গে কাটাচ্ছে সন্ধ্যা। তার সামনে নিঃসঙ্কোচে মদ খাচ্ছে বুড়্ঢা গুহ। সে আর বুড়্ঢা হাসছে। কি এমন হাসির কথা বলেছে বুড়্ঢা গুহ? সে হাসছে চেঁচিয়ে—হিস্টিরিয়ার হাসি।

হিস্টিরিয়ার হাসি? তাই হবে। নইলে এত হাসি আসছে কোথা থেকে? মদ খাচ্ছে বুড়্ঢা। সে তো খায়নি। তবে সে এত হাসছে কেন? তার জামার পেট, পিঠ কাটা। অনাবৃত দেহ। পাতলা শিফনের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দেহের রেখাগুলো। বুড়্ঢা গুহ তাকে দেখছে। বুড়্ঢা গুহর চোখে এত করুণা কেন? সে-ও কি দয়া করে বাসবীকে? সে কেন বলছে—মিসেস তালুকদার, আপনি আর এমন করে আসবেন না। নিশীথ আপনাকে বারবার পাঠায় কেন? চলে যান বাড়ী। সুগত, এঁকে পৌঁছিয়ে দেবে!

—না না—

সে বলছে। সে বলছে—আপনার বন্ধু আমাকে নিতে আসবেন। বলে গেছেন।

নিশীথ আসছে না। বুড়্ঢা-র বাড়ীতে ডিনারের ঘণ্টা পড়ে। খাবার টেবিলে চলে যায় ওরা। বাসবী বসে আছে নিচের ঘরে।

সেই নিচের ঘরে। সেই ঘর। সেই তীর ধনুক আর শাণিত বর্শা সাজানো দেয়াল। আর্টিস্ট সুগত বসে বসে তাকে সঙ্গ দিচ্ছে। সুগত-ও মদ খেয়েছে। আবোল তাবোল কথা বলছে। বারবার বলছে—আমার ছবির শকুন্তলা এমন করে বদলে গেল? এমন নিঃশেষে? আপনি চলে যান মিসেস্ তালুকদার। চলে যান যেখানে হোক। পালিয়ে যান। নইলে আপনি বাঁচবেন না। মরে যাবেন।

বাসবী কথার জবাব দিতে পারছে না ক্লান্ত সে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে পিঠ। ক্লান্তিতে ভেঙে যাচ্ছে শরীর। বাসবী শুধু চেয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কাঁচের কেসে সাপটার দিকে। মস্তোবড়ো কালো আর বাদামীতে আঁজি কাটা শরীরটা—চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। দেখতে ভয় করছে বাসবীর, ঘেন্না করছে, তবু হত্যার ভয়াল ঐ বাহনটাকে না দেখে যেন তার উপায় নেই। -

মনে পড়ে সে সব কথা। মনে পড়ে আর দুই চোখের পাতায় যেন কে ছুঁচ দিয়ে বিঁধতে থাকে। ঘুমোতে পারে না বাসবী। অন্ধকারটা চোখের সামনে যেন অসুখী অতৃপ্ত কতকগুলো মুখের চেহারা নেয়। অন্ধকারটা তার দিকে জিঘাংসু চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে। ভয় পায় বাসবী। ভয় পেয়েছে, সে কথা স্বীকার করতে বাধে। ঘুমের ওষুধ খায় শেল্‌ফ-টা হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে।

তারপর উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ জোর করে বুঁজে ভাবতে চেষ্টা করে —ঘুমোব। আমি এখন ঘুমোব। ঘুমপেয়েছে আমার।

ঘুমের ওষুধ-ও বেইমানী করে বাসবীর সঙ্গে। আর পারে না বাসবী। উঠে যায় নিশীথের কাছে। বলে—কিছুতে ঘুমোতে পারছি না। কি করি বলত?

—সোনেরিল বা সোনালজেন নেই?

—খেয়েছি। ঘুমোতে পারছি না।

আয়নায় নিজের ছায়াটা দেখতে পায় বাসবী। শীর্ণ মুখ। ফর্সা রঙ। এখন রঙের সাহায্য ব্যতিরেকে ঠোঁট সাদা, চোখের নিচে কালি, গলার শির উঠে আছে। লম্বা বেনীটায় কেমন অস্বাভাবিক

দেখাচ্ছে। দেখে দেখে তার দয়া হয়। নিশীথের একটু দয়া হয় না? বাসবী কুণ্ঠিত হেসে বলে—কি করি বলতো?

নিশীথের কি যেন মনে হয়। বলে

—বাসবী ঘুমের ওষুধ এত খেয়েছ, যে কাজ হতে চাইছে না শরীরে। আমার মনে হয় ইঞ্জেকশনে কাজ হবে।

—কোথায় পাব?

—চলো।

যে বাসবীকে দুইহাতের মধ্যে ধরে রাখতে এত আগ্রহ নিশীথের, যে বাসবী কাঁদলে-ও তাকে মুক্তি দেয় না নিশীথ, এখন সেই বাসবীর জন্যে যেন এতটুকু আকর্ষণ নেই নিশীথের। বাসবীকে সে ধরে নিয়ে আসে, বিছানায় শুইয়ে দেয়—যেন যে কোন ইঁটকাঠের একটা শরীর বাসবী—বাসবী যেন রক্ত মাংসের মানুষ নয়। বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে সেফ্ খোলে নিশীথ। লোহার পাল্লার শব্দটা যেন বাসবীর কান আর মাথায় ঘা মারে। নিশীথ নিয়ে আসে সিরিঞ্জ।

ভয় করে বাসবীর। ভয় করে নিশীথকে দেখে—ভয় করে কাঁচের সিরিঞ্জে বর্ণহীন টলটলে ওষুধটা দেখে—ভয় করে ছুঁচটার ওপর আলো ঝলকাতে দেখে। ভয় করে আর ভয়ে অসাড় হয়ে থাকে বাসবী। কথা বলতে পারে না।

নিশীথ বাসবীর হাতটা তুলে খুব অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ইঞ্জেকশান দেয়। ছুঁচ ফুটবার সে সামান্য বেদনাটা মিলিয়ে যায়। নিশীথ এবার মুখ নিচু করে বলে

—ঘুমোও বাসবী। চোখ বোঁজ।

কি অপরিচিত গলা। যেন কোথায় কোন্ দূর থেকে কথা কইছে নিশীথ। বাসবীর গলাটা জড়িয়ে আসছে, তবু সে বলে

—অত আস্তে কেন কথা কইছ নিশীথ?

নিশীথের গলাদিয়ে সম্মোহন ঝরে ঝরে পড়ছে। নিশীথের গলা যেন ঠাণ্ডা একটা পালকের মতো কপালে বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে তাকে। নিশীথ বলে

—জোরে কথা কইলে তোমার যে ঘুমটা ভেঙে যাবে বাসবী। তাই আস্তে কথা কইছি।

তারপর সত্যিই ঘুম নামতে থাকে। ঝুরো ঝুরো বরফের মতো নিঃশব্দে তাকে ঢেকে ঢেকে ঝরতে থাকে ঘুম। ঘুমিয়ে পড়ে বাসবী।

ঘুম ভাঙে পরদিন বেলা বারোটায়। ঘুম ভাঙে একটা জড়তা নিয়ে। নিশ্চিন্ত বিশ্রামের পর প্রফুল্ল মনপ্রাণের আরাম পায় না বাসবী। কেমন যেন মনে হয় অন্যায় করেছে সে। মনে হয় যা করেছে তাতে ভালো হবে না।

ক-দিন যায়। ঘুমের চেষ্টা করে আর দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে। তারপর আর পারেনা বাসবী। নিশীথকে জড়িয়ে ধরে আলুথালু পোষাকে, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বলে—ঘুমোতে পারি না নিশীথ রাত হ'লে আমার ভয় করে কেন?

—চেষ্টা কর বাসবী।

—পারি না নিশীথ। দাও তোমার ইঞ্জেকশন। এমন কেন হয়? নিশীথ এ তুমি আমার কি করলে?

ইঞ্জেকশন দেয় নিশীথ। বাসবী গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। ঘুম আসতে আসতে ভাবে—কাল ঠিক চলে যাব আলিপুরে। থাকব না এখানে। এখানে থেকে এ রকম হচ্ছে।

ক'দিন যায়। আলিপুরের বাড়ীতে মৈত্রসাহেবের খাস কামরায় বসে বসে কথা কয় নিশীথ। নিঃসঙ্কোচ স্বীকারোক্তি সব। ভুল করেছে জীবনে। ভুল করেছে স্বর্ণমৃগ ধরতে গিয়ে। বলে

—আপনি আমার-ও পিতা। বলতে লজ্জা নেই, সবকিছুর মূলে ছিলো বাসবীর প্রেম। বাসবীকে ভালোবেসে আমি যেন দিশেহারা হলাম। মনেহলো তাকে সুখে রাখতে হবে। সে যে ভাবে বাসকরে অভ্যস্ত—আপনি জানেন, আমি নষ্ট যা করেছি, ক্ষতি করেছি আমার-ই নিজের। আর কারু ক্ষতি আমি করিনি। নিজের জালে নিজে-ই

জড়িয়েছি আমি। কারুকে দায়ী করছি না। তার সে দুঃখ-ও দুঃখ নয়। ব্যাপার হয়েছে, বাসবী······

—বাসবীর কি হয়েছে ?

মুখে আনতে পারে না নিশীথ। চুল মুঠো ক'রে ধরে একবার পায়চারি করে নেয় ঘরে। তারপর ঘুরে এসে টেবিলে দুইহাত রেখে ঝুঁকে পড়ে বলে

—বাসবীর কি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিলো কখনো ?

—বাসবীর ? না। কখনো নয়। কি বলছো নিশীথ !

নিশীথ লাজুক ও অপ্রতিভ হাসে। বলে

—হয়তো আমিই দায়ী—মানে বিয়ের পরে অত্যধিক উগ্রজীবন, হৈ চৈ, বেশী করেছি ওকে নিয়ে। কিন্তু ··

—বল, নিশীথ !

—কিন্তু, ও যেন জীবনটাকে বেশী ভালবেসে ফেলেছে। মানে··· ও···কি রকম করে জানিনা মানে···চুপচাপ থাকতে পারে না। হৈ চৈ করে। ঘুমোতে চায় না—ঘুমের ওষুধ ছাড়া···অনেক অসংলগ্ন কথা বলে···যাতে মনে হয় ওর বোধহয় নার্ভটা খুব···এই আর কি !

গম্ভীর হয়ে যায় নিশীথ। বলে—চেষ্টা করছি। চেষ্টা করছি আমি—ডক্টর পালিতের সঙ্গে কথা বলেছি···ফোন করলেই জানবেন আপনি···এই তো ওষুধ, টনিক প্রেসক্রিপশন দেখছেন না ?

বাসবীর জন্যে নিশীথের এই আন্তরিক উদ্বেগ দেখে অসিত মৈত্রের মনটা নরম না হয়ে পারে না। তিনি বলেন—ব'সো। ব্যস্ত হয়ো না। ডক্টর পালিতকে দেখাতে হয় কালই নিয়ে আসি বাসবীকে। এখানে কদিন ওর মা-র কাছে থেকে, ওর-ও ভালো লাগবে। একটু জায়গা বদলালে-ই ভালো। আর, আমি কিন্তু আরো ভাবছি নিশীথ।

—বলুন !

—আমার খুব ইচ্ছে তুমি চলে যাও শেখপুরা। টুর্নী নদীর বাঁকে চমৎকার বাড়ী পাবে। জায়গা হিসেবে ভালো। পালামৌ রেঞ্জ এ আর, এখানে তো দেখলে—নতুন করে আরম্ভ করো। নতুন করে···

নতুন পরিবেশে। কি বয়স হয়েছে তোমার। তুমি তো অল্পবয়সী। নতুন নতুন কাজের কথা শুনলে আমার-ই আজ-ও ইচ্ছে করে চলে যেতে। আমার খুব বিশ্বাস, বাসবীর মন প্রাণের উন্নতি হবে। ভালো লাগবে।

—সে তো আমি বলেছি—আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো। সে কথা আমাকে বলবার দরকার কি?

মনটাকে যতবার কঠিন করেন অসিত মৈত্র, নিশীথের ব্যবহারে তা যেন ভেঙে ভেঙে যায়। এখন যেন মনে হয় না এ সেই নিশীথ, যে তাঁর মেয়ের জীবনটা তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছে। মনে হয় যথেচ্ছাচারী খেয়ালী তাঁরই এক সন্তান, অপরাধ করে অকুণ্ঠে পিতার কাছে এসেছে হৃদয়ের সকল কথা উজাড় করে দিতে। তিনি বলেন

—ব'সো। বাসবীর মধ্যে একটু কেমন কেমন ভাব আমার স্ত্রী-ও লক্ষ্য করেছেন। শোনো, গগনভাই-এর লোকটা, সেই শিকদার—কি বলছে সে? তোমার বাড়ীটার কাগজপত্র সব ঠিক আছে তো? কিনেছো কোন্ বছর?

কথা হয়। কথা হয় দুইজনের মধ্যে পিতাপুত্র-র মতো। মাঝে উঠে গিয়ে নিশীথ জ্যোতিপ্রভার কাছে আবদার জানিয়ে আসে। বলে

—রান্নাবান্না শেষ করেছেন? চলুন চীনে খাবার কিনে নিয়ে গাড়ী করে যাই ব্যারাকপুর। বাগানে বসে বেশ খাওয়া দাওয়া হবে। যত রাত হোক, আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে যাব। মালবী ফেরেনি?

—মালবী গিয়েছে পিয়ানো শিখতে। এই এলো বলে।

জ্যোতিপ্রভা মনের মতো কাজ পেয়ে খুসি হয়ে চলে যান। নিশীথ এসে বসে। কাগজপত্র বিছিয়ে কথা বলে মৈত্র-র সঙ্গে।

চারিদিকে নজর আছে নিশীথের। মৈত্র-র সঙ্গে কথা কইতে কইতে ছাইদানী এগিয়ে দেয়। পেছনের জানালা দিয়ে রোদ আসছে দেখে সযত্নে বন্ধ করে দেয়। এই সব ছোটখাটো আন্তরিকতার ব্যবহার স্পর্শ করে মৈত্র-র মনকে।

ব্যারাকপুরে সকলে মিলে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা বারোটা বেজে যায়। গত দু'দিন, তিন রাত বাসবী নিজের ওপর জোর ক'রে ক'রে ইন্‌জেক্‌শন্ নেয়নি। কাল রাত থেকে ঘুমের জন্যে মরে যাচ্ছে সে। নিশীথ কোথায় রাখে তার ইন্‌জেক্‌শন্? চাবী খুঁজে পায় নি বাসবী।

বাবা মাকে দেখে সে যেন অবাক হয়ে যায়। বাধ্য হয়েই মন দিতে হয় অভিনয়ে। পরম সুখী ও তৃপ্ত এক গৃহিনীর অভিনয়ে। হেসে হেসে মালবীকে কাছে টেনে নেয় বাসবী। বলে—মা, সবই তুমি রান্না করে এনেছ কেন? আমি কিছু করব না?

অসিত হাসতে হাসতে বলেন—নিয়ে এসো না, কি কি আছে?

বাগানে সতরঞ্জি বিছিয়ে বেশ পিকনিকের মতো খাওয়া দাওয়া হয়। মালবীর চুল নেড়ে দিয়ে বাসবী বলে

—পার্ক ষ্ট্রীটে চুল কাটিয়ে মেমসাহেব হয়েছিস্? খুব সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু।

মালবী চুল নেড়ে বলে—জানো দিদি, স্কুলে মিস্ গার্ট্রুড্ বলছিলো কি?

—কি রে?

—বলছিলো আমি নাকি ঠিক তোমার মতো দেখতে। পুরণো মিস্ যাঁরা আছেন না? তাঁরা সবাই ঐ কথা বলেন।

—বলেন বুঝি?

কেমন আনমনা হয়ে যায় বাসবী। মালবীর মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি তার চলে যায় কোথায়, কোন্ সুদূরে। মনে পড়ে তার নিজের ঐ বয়সের কথা। সেই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ সুখের জীবন—কোথায় কোন সুদূরে স্বপ্নকথা হয়ে গেল। সেই সব দিন?

—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইলো না

সেই যে আমার নানারঙের দিনগুলি॥

এও যেন সেই গানেরই মতন। সোনার খাঁচায় সুখী নিরুদ্বিগ্ন জীবন তার কবে ছিল? যেন মনে করতে পারে না বাসবী।

পলকের চেয়েও কম সময়। কিন্তু তার মধ্যেই যে যা দেখবার

দেখে। বাসবীর ক্লান্ত করুণ দৃষ্টি আকাশের সীমান্তে এক ঝাঁক রঙীন পাখীর মতো-ই তার পলাতকা সুখের দিনগুলিকে খোঁজে। এক হৃদয় ভাঙা নিশ্বাস ছাড়া আর কোন অনুভূতি হয়না বাসবীর।

মৈত্র আর জ্যোতিপ্রভা দেখেন মেয়ের শঙ্খের মতো রঙ ফিকে হয়ে গেছে। শাড়ীর শাদা রঙের সঙ্গে মিশে গেছে যেন। চোখের নিচে কালি। গলায় নীল শিরা জেগে উঠেছে।

মালবী শুধু ছুটে বেড়ায় এয়ারডেল কুকুরটাকে নিয়ে ঘাসের ওপর। গড়িয়ে পড়ে বল লুফতে গিয়ে। ভাল ফ্রকটায় মাটি লেগে যায়। মুখখানা স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ঝলমল করে।

মনের ভেতরে কেন যেন দুঃখের সুর একটা বাজে জ্যোতিপ্রভার। কি যে মনে হয়, তা বলতে পারেন না।

যত দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে হেলে পড়ে ছায়া—ততই অস্থির হয় বাসবী। চোখ দুটো তীব্র হয়ে ওঠে। দৃষ্টি ফিরে ফিরে নিশীথকে অনুনয় করে। বিদায় নিয়ে অসিত আর জ্যোতিপ্রভা গাড়ীতে ওঠেন সন্ধ্যাবেলা। নিশীথ ফিরে আসে। বাসবী বারান্দা থেকে অধীর পায়ে নেমে এসে নিশীথের হাত ধরে। বলে—শীগগির চলো। মরে যাচ্ছি আমি। কেন এমন করে কষ্ট দিচ্ছ?

—ঘরে চলো বাসবী।

—তুমি ইচ্ছে করে দেরী করছো। আমার কষ্ট হচ্ছে। কই, বের করো ওষুধ। তুমি জান না? ওষুধ ছাড়া আমি ঘুমোতে পারি না?

নিশীথের সামনে দাঁড়িয়ে বাসবী হাঁপাতে থাকে। তারপর কেমন একরকম অপ্রকৃতিস্থ হাসি হাসে। হেসে বলে—ভাবছো বানিয়ে বলছি? বানিয়ে বলছি না। কাল রাত থেকে কেবল মনে হচ্ছে, খাটের নিচে গুঁড়ি মেরে বসে আছে কে! কেমন সবুজ রঙের একটা ছায়া যেন—সবুজ···আজ বাইরে বসে ঘাসের সবুজ দেখে চোখ আমার জ্বলে যাচ্ছিলো নিশীথ। তবে কি জানো?

নিশীথের পাঞ্জাবীর বোতাম ধরে কাছে এসে খুব হাসে বাসবী। বলে

—কি, জানো ? বাবা মা—কারুকে বুঝতে দিইনি।

জ্যোতিপ্রভার ব্যাগ পড়েছিলো। তাই ফিরিয়ে নিতে এসে অসিত মৈত্র কাঁচের দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে সব কথা শোনেন। সবটুকু দেখেন। দেখেন বাসবী কেমন টলমল করছে দুই পায়ে দাঁড়িয়ে। দেখেন বাসবীকে সযত্নে খাটে শুইয়ে দিচ্ছে নিশীথ। মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

ফিরে এসে স্ত্রী-কে কিছু বলেন না। তবে ডক্টর পালিতকে রাতে ফিরেই ফোন করেন। পালিত জানান যে নিশীথের কথা সত্যি। জানান যে মিসেস তালুকদারকে দেখেছেন তিনি। শুনেছেন যা, তাতে তাঁর-ও মনে হয়েছে যে পরিবেশ ও মানুষজনের বদল হলে-ই অনেকটা উন্নতি হবে। নার্ভাস ধরণের মেয়ে—এ রকম হতে-ই পারে।

আর একটা বিষয়ে মনস্থির করেন মৈত্র। মেয়ে জামাই ছাড়া তাঁর-ও যখন কেউ নেই—তখন মালবীর অংশ অক্ষুণ্ণ রেখে নিশীথের টাকা পয়সার প্রয়োজনটা-ও তাঁকেই দেখতে হবে। মর্টগেজের ব্যাপারটা দেখে শুনে নিশীথকে ভারমুক্ত করতে হবে। নিশীথের সুখেই বাসবীর সুখ। বাসবীকে সুখী করতে হলে নিশীথের সুখদুঃখের ভাগও নিতে হবে তাঁকে।

জ্যোতিপ্রভা কিন্তু অন্য কথা বলেন। বলেন—বাসবীর একটি সন্তান হলো না! স্নেহপ্রবণ মেয়ে তো! একটি সন্তান হলে ও সুখী হতো। ভাল হতো। মেয়েদের সুখশান্তির জন্য প্রয়োজন হয়।

জ্যোতিপ্রভার সঙ্গে সঙ্গে-ই মনে পড়লো—একদিন তিনি বলেছিলেন বাসবীকে। বলতেই বাসবী কি রকম চটে উঠলো। বললো —সন্তান ? আমি চাই না। আমাকে ওসব কথা বলো না।

জ্যোতিপ্রভা কি জেনেছিলেন বাসবীর অন্তরের কথা ? কত দুঃখে সে ঐ কথা বলেছিলো ?

অসিত মৈত্র নিশীথের সব দায়ভার তুলে নিচ্ছেন কাঁধে, আর মিটিয়ে দিচ্ছেন গগনভাই-এর দেনা, একথা জেনে বাসবী আশ্চর্য হয়ে গেল। অসিত মৈত্র আনন্দ করে জানাতে গিয়ে মেয়ের ব্যবহারে আঘাত

পেলেন। বাসবী ডক্টর পালিতের চেম্বার থেকে এসে বসেছিলো বাড়ীতে। অসিতের কথা শুনে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো—কি করছো? নিশীথকে সব টাকা তুমি দিয়েছ? কেন দিয়েছ? কে বলেছিলো তোমাকে টাকা দিতে?

—কি বল্‌ছিস খুকি? এরকম হয়ে যাচ্ছিস কেন দিন দিন?

—তুমি ওকে চেননি। তোমার কাছ থেকে টাকা নিলে? তোমার টাকা নেবার কোন অধিকার আছে তার? কেন তুমি তাকে টাকা দিলে? সে তোমার কে?

অসংলগ্ন শোনালো কথাগুলো। অসিত মৈত্রের মনে হলো খাপ-ছাড়া এই কথাগুলো বলে বাসবী যেন নিজেকেই প্রকাশ করছে। হলে-ই বা তাঁর মেয়ে। উচ্ছৃঙ্খল কোনো স্বেচ্ছাচারিতা নিশ্চয় তার ভেতরে একটা ভাঙচুর এনেছে। নইলে এ-সব কথা সে বলে কেমন করে? এ তো অকৃতজ্ঞতার কথা। বিশ্বাস ভঙ্গের কথা। তিনি বলেন

—কেন দিয়েছি তা তুই যদি না বুঝিস্ খুকি, আমি তোকে বোঝাতে পারব না। চ্যাঁচামেচি করিস্ না। শান্ত হ'।

—আমাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন বাবা?

—কি দরকার ছিলো?

—বুঝেছি। আমার চেয়ে ওকে বিশ্বাস করেছো বেশী। কিন্তু কেন? এমন কাজ কেন করলে? কেন আমাকে জানালে না?

সুসংবদ্ধ চিন্তা বা গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতা বাসবী একেবারেই হারিয়েছে। তাই অযথা ক্ষোভ ছাড়া আর কোন কিছুই প্রকাশ করতে পারে না সে।

বাড়ী ফিরে বাসবী নিশীথকে চেপে ধরে। বলে—কেন, কেন তুমি আমার বাবার কাছ থেকে টাকা নেবে? কেন তাঁর কাছে গিয়ে এইসব মিথ্যে অভিনয় করছো? তাঁরা তোমাকে জানেন? ছি ছি নিশীথ, মানুষের শরীর নিয়ে চলাফেরা কর, অথচ মনুষ্যত্বের কিছুই কি বাকি নেই তোমার মধ্যে? সবটাই কি ফাঁকি?

নিশীথ আজ অনেকদিন পরে আহত হৃদয় এক প্রেমিকের ভূমিকা নিয়ে অবনত হয়ে পড়ে বাসবীর কাছে। নিচু হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে

—শোন, শোন আমার কথা। এতদিন এত কথা শুনেছ, আজ এ কথা তোমাকে শুনতেই হবে। ছাড়ব না আমি।

বাসবী শুনবে না, নিশীথ শোনাবে। সে টানাপোড়েনে নিশীথই জেতে। বাসবীকে তুলে আনে ঘরে। বলে—চাও যদি, খুলে দেখাব সব। এবার আমাকে বিশ্বাস করতেই হবে বাসবী। আর কয়টা দিন-ই বা আছে! এক মাস বাদে-ই এ বাড়ী বন্ধ করে আমরা চলে যাচ্ছি শেখপুরা। তুমি আর আমি। আমি অবশ্য আগেই একবার ঘুরে আসব। বাবা ঠিক করে দিয়েছেন। আর বাবার কাছ থেকে এ টাকা ত' আমি নিইনি বাসবী। তিনিই জেদ করেছেন। তবু জেনো, আমি ধার ব'লে নিয়েছি। কণ্ট্রাক্টটা হলেই দিয়ে দেবো আস্তে আস্তে। তোমার খুব ভালো লাগবে বাসবী। তোমাকে ত' সেখানকার কথা বলিনি।

বাসবী বিশ্বাস করতে পারে না। তা বোঝে নিশীথ। বলে—জানি বিশ্বাস করতে পারছ না। কেমন ক'রে পারবে? তোমার বিশ্বাস আকর্ষণের মতো আমি তো কিছু করিনি বাসবী। যা করেছি সব ভুল।

বাসবী নয়, আজ নিশীথ-ই কাঁদে। হাঁটু গেড়ে বসে—বিছানায় মুখ ঘষে। বলে—আমার মরে যাওয়া উচিত বাসবী। তবু পারি না। পারি না—তোমায় ভালবাসি বলে।

স্বীকৃতি আর ক্ষমা—এই পালা চলে দুই তিন দিন ধরে। বাসবীকে ইঞ্জেকশন দিয়ে নিশীথ বলে—

—ইঞ্জেকশন তোমাকে আজও দিচ্ছি বাসবী—কিন্তু ইঞ্জেকশনের ওষুধ, ছুঁচ সব আমি ফেলে দেবো। ডক্টর পালিতের কথা মনে নেই তোমার? সব নতুন করে…নতুন জায়গা…নতুন মানুষ · তোমাকে তাতে-ই ভালো করে তুলবো আমি।

তিনদিন বাদে রাতে উঠে যায় বাসবী। অন্তর্দ্বন্দে ক্ষত বিক্ষত হয়ে কি হবে? আসলে নিশীথ ছাড়া গতি নেই তার। বেদনার সে কালীদহে ডুবে সে কালি মেখেছে—জেনেছে মৃত্যুর স্বাদ। তাই আবার না মরে তার উপায় কি? নিশীথের কাছে উঠে যায় বাসবী। গায়ে হাত দিয়ে বলে—শোন, শুনছ? কই, কবে যাচ্ছি আমরা বললে না ত?

বাসবীর এই কথার পর নিশীথ তাকে টেনে নেয় কাছে। বাসবীর ঘাড়ের কাছে মুখ ডুবিয়ে বলে—বাসবী! বাসবী! বাসবী!

কেন যেন, বাসবীর মনে হয়—শীতল কালো কোনো জলের আবর্ত্তে সে ডুবে ডুবে যাচ্ছে। চেষ্টা করলেও উঠতে পারবেনা সে। তলিয়েই যেতে হবে।

॥ ৭ ॥

শেখপুরা থেকে বাসবীর যে চিঠিগুলি আসে, তাতে আস্তে আস্তে যেন একটা আশা আনন্দের সুর-ই বেজে বেজে ওঠে। বাসবী লেখে

—এখানে এসে মানুষটা বদলে গিয়েছে। জানলে মা; সারা-দিনরাত শুধু কাজ আর কাজ। রাস্তাটা হচ্ছে এখান থেকে একমাইল দূরে। ভোরবেলা বেরিয়ে যায় চা খেয়ে—দুপুরের খাবার পাঠিয়ে দিতে হয়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল পাঁচটা। সেই স-ব লীকু, সব মানুষ চলে যাবার পরে।

আমাদের বাড়ীটা সুন্দর। চারিপাশে শালগাছের বন। দিনরাত গাছের পাতার ঝরঝর-মর্মর শব্দ। বড় ভালো লাগে। মানুষ যে নেই, সেটাই যেন ভালো লাগে বেশী। মানুষের মধ্যে ত' ছিলাম-ই।

আমি এখন অনেক ভাল আছি। আর, একটা কথা লিখব মা; হয়তো তোমার কাছে আমাকে গিয়ে থাকতে হবে ফাল্গুন মাস থেকে। তার আগে শীতকালে একবার আসবে না এখানে? খুব ভাল লাগবে কিন্তু। রোহন্ সিং দেশ থেকে এসেছে কি? তাকে পেলে তোমরা গাড়ি করে-ও আসতে পার। রাস্তা তো আছেই।

আমার জন্যে বাবাকে ব্যস্ত হতে বারণ ক'রো। মালবীকে ভাল-বাসা দিও। বাসবী।

সুখবরটা লিখতে ইতস্তত করে বাসবী। কিন্তু না লেখবার-ই বা কি আছে? নিশীথকে এখনো জানায়নি। মা-কে জানালো আগেই।

নিশীথ কিন্তু আনন্দে লাফিয়ে ওঠে না। বা বাসবীকে অভিনন্দন জানায় না উচ্ছ্বসিত হয়ে। বলে—তোমাকে এমন করে বিব্রত করতে আমি চাইনি বাসবী। আমার মনে হয়…

—কি মনে হয় নিশীথ;

—এখনো এই ভাবে আটকে পড়বার সময় হয়নি আমাদের। সবে এলাম এখানে। কি হবে না হবে—টাকার কথাই ধরো না কেন!

সকরুণ চোখে চেয়ে থাকে বাসবী। ক্ষণিক পূর্বের রক্তোচ্ছ্বাস গাল থেকে মিলিয়ে যায়। মুখ হয়ে যায় সাদা। সে কম্পিত গলায় বলে

—কি বলতে চাইছো নিশীথ ; আমি ত' বুঝতে পারছি না।

নিশীথ একবার পায়চারি করে নেয় ঘরে। তারপর সামনে এসে বলে

—মীমাংসার ভারটা আমি তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম বাসবী। মাতৃত্বের এ দায়কে যদি বোঝা মনে করো —মুক্তি দিতে পারি তোমায় —বিজ্ঞানের যুগ। আর, যদি মনে করো যে না···সহ্য করতে পারবে তুমি···

—চুপ করো নিশীথ !

অনেকদিন বাদে তার বুকে যন্ত্রনা হয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুম আসে না চোখে। নিশীথের-ই উত্তরাধিকার নতুন করে সৃজন করা ? সে কথা ভাবলে মনে হয়, ঐ সর্বনাশের পথই ভালো। আবার অন্য বিবেচনা-ও ত' আছে। ফিরে যদি নতুন করে সুরু-ই করা গেল জীবন তবে সে জীবন মুখর হোক একটি শিশুর কলতানে। একটি স্নেহপুত্তলিকে হৃদয়ের সকল ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে তৃপ্ত হোক স্নেহপিপাসু অন্তর।

কিন্তু নিশীথ যদি পিতৃত্ব-কে দায় মনে করে ? সে-ও যে বড় দুঃখের কথা। কিন্তু তবু নিশীথের কাছে, অন্তত এই ক্ষেত্রে পরাজয় মানবে না বাসবী। কিছুতে-ই নয়। এই এক প্রেমে সকল তৃষ্ণার নিবৃত্তি হবে তার।

অনেকদিন বাদে রাতে ঘুম আসে না বাসবীর। ঘুম আসে না, মনে হয় আঁধারটা যেন আজকের রাতে হাঙরের মত হাঁ করে আছে। সেই মুখের মধ্যে সারি সারি তীক্ষ্ণ দাঁতের মধ্যে শুয়ে আছে বাসবী। এদিক বা ওদিকে নড়লেই বিপদ হবে। আরো মনে হয় আঁধারটা যেন ধীরে ধীরে হাঁ-টা ছোট করছে।

ভয় করে বাসবীর। ঘুম আসতে আসতে রাত ফুরিয়ে যায়।

বাসবীর পাশে শুয়ে নিশীথ তালুদারের ক্লান্ত চোখে-ও কিন্তু ঘুম আসেনা। ঘুম আসে না অনেক কথা মনে ক'রে। সেখপুরা এরোড্রোমের রাস্তাটার কথা মনে করে। হ্যাঁ হচ্ছে বটে রাস্তাটা। সেখপুরার ভু-অঞ্চলের লাল কাঁকর পাথরের বুক চিরে জাগছে একটা পথ। কালো কালো মানুষগুলো মেয়েমরদে মিলে কোদাল গাঁইতি শাবলে হাত চালাচ্ছে। বারোআনা—আটআনা রুজিতে সম্ভব করে তুলছে একটা স্বপ্ন। এখনো এ পথের প্রয়োজন তাদের ছিল না। গৃহাঙ্গনে সযত্ন পালিত হাঁসমুরগীর ডিম—আর শাকসব্জীর সামান্য বেসাতি নিয়ে তারা হাটে যেতে পারতো বিসর্পিল রাঙা ধূলোয় বিলীন এক মেঠো পথ ধরে। কিন্তু প্রয়োজন অন্যলোকের। যোগাযোগ হবে শহরের সাথে এয়ারোড্রোমের। বড় বড় ট্রাক ও লরী চলাফেরা করবে এই পথে। গোরাসৈন্যরা কখনো মজা দেখে গরু ছাগল ও মানুষকে চাপা দেবে। কখনো ডিম মদের সন্ধান করতে গিয়ে ঢুকে পড়বে সাঁওতাল পল্লীতে। কাজের কথা বলতে বলতে দৃষ্টি দিয়ে লেহন করবে নিটোল যৌবন সাঁওতাল মেয়েদের। তাদের কর্মরত শরীরের অনাবৃত অংশটুকু দেখবে ভালক'রে। তারপর হয়তো লেনদেন চলবে আঁধারে অঞ্চলে—গাছেব ছায়ায় গা মিশিয়ে শীষ দিতে দিতে চলে যাবে স্ফুর্তিবাজ জনি-রা। তারপর এইসব দিন চলে গেলে—অনেক পরে-ও দেখা যাবে এখানে সেখানে—নীল চোখ কটা রং—সোণালী চুল শিশুদের। তাদের মায়ের সঙ্গে তাদের চেহারার দুরন্ত পার্থক্য সহজেই বোঝা যাবে। তবে এইসব জবালা বা সত্যকামকে কেউ পরিচয় জিজ্ঞাসা করে ব্রহ্মবিদ্যায় দীক্ষিত করবেনা এই যা সান্ত্বনা।

না। নিশীথের তাদের কথা মনে হয় না। এই জায়গায় কোনো আঞ্চলিক বা সামগ্রিক বৃহৎ সমস্যার কথা ভেবে পীড়িত হয় না তার মন। তার মন শুধু গুহাবাসী এক সাপের মতো-ই শীতল পিচ্ছিল, অদ্ভুত সব পথ ধরে ধরে চলাফেরা করে। মনে হয় বাসবী তার সকল পরিকল্পনা নষ্ট করে দিচ্ছে। এত কষ্ট করে আসতে, বা এই কাজ

করতে বয়ে গিয়েছিল তার। সে নিশীথ তালুকদার দিনের আলোতে যে কম ঘের হয়—গায়ের চামড়া যার বন্ধঘরে ইলেক্‌ট্রিকের আলোর উত্তাপে ফ্যাকাশে—সে কেন শোলাটুপী পরে দাঁড়িয়ে কুলী-কামীনদের কাজ দেখবে? সে কেন এয়ারোড্রোমের ইঞ্জিনীয়ারকে শুনিয়ে শুনিয়ে সাবকণ্ট্রাক্টার-কে বলবে।

—ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবেন না। সব ফাঁকি দিতে চাইলে নিজেই আপনি ফাঁকে পড়ে যাবেন মিস্টার বোস। আমাদের জাতটা এইজন্যে মার খাচ্ছে ঘরে দোরে, জানলেন? ফাঁকি—সব বিষয়ে ফাঁকি! ফাঁকি দেবেন কেন? রাস্তাটা যে হচ্ছে সেটা কি আপনার ঐ বিলিতী বেরীকোম্পানী ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যাবে? আপনার দেশেই তো থাকবে। বুঝতে চাননা কেন?

রাস্তাটার কাজে ফাঁকি নেই কোথাও। সেদিকে নিশীথ কড়া নজর রেখেছে। কিন্তু এর মধ্যে-ও কি নিশীথের আরো পরিকল্পনা নেই? সে কি অনেক দূরের কথা ভাবেনি?

সে বুঝেছে, যে হাতের মুঠোর পাখীটা বনের অনেক পাখীর চেয়ে ভালো। সেটা তার নিজের। পোষ মানালে পোষ মানবে।

বাইরের অনেক ঝুটঝামেলার চেয়ে অসিত মৈত্র-কে হাতে রাখা তার পক্ষে অনেক বেশী দরকার। কেননা অবশ্যম্ভাবী নিয়মে অসিতের টাকা তার হাতেই আসবে। সে প্রতিশ্রুতি পেলে, সে-ই বা কেন এর তার পেছনে ছুটে ছুটে মরবে? প্রয়োজন কি? সে করেছে বটে নানান কাজ। সবই টাকার জন্যে। টাকা ছাড়া কি হয় জগতে? সবচেয়ে দরকার টাকা। টাকা-ই দিতে পারে তাকে প্রভাব, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। টাকার রূপালী স্বপ্ন দিনরাত চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছিলো বলেই না শিলিগুড়ির এক গরীব উকীলের ছেলে হয়ে-ও সে এতখানি উন্নতি করতে পেরেছে? দু-খানি মাত্র ঘর ছিলো তাদের। একটা ঢালাবিছানায় ভাইবোনদের সঙ্গে শুতে হতো তাকে। নোংরা দরিদ্র, ছোটদের কাঁথায় বিশ্রী ভাপ্‌সা গন্ধ। মা-র হাতে পায়ে হাজাধরা। হলদে মুখ, চোখের নিচে ফোলা—মাথায় চুল নেই—দুইহাতে শাঁখার

সঙ্গে ব্রোঞ্জের চুড়ি ছুই গাছা করে। তার বাবার কাছ থেকে রুক্ষ ব্যবহার পেতেন মা। শুধু কি মা—তারা সবাই। মা শুধু চোখের জল ফেলতেন আর বাবা মারলে পরে লুকিয়ে কাছে এসে ব্যথার জায়গায় হাত বোলাতেন। সেই মা-র বিষয়ে-ও তার ঘেন্নার শেষ ছিলনা মনে মনে। কেননা বাবা যখনই ডাকতেন—উঠে যেতেন মা। সংসারের অন্যসব কাজে যেমন বাধ্য ছিলেন তিনি, তেমনি বাধ্য-ভাবেই বছরের পর বছর উকীলবাবুর বংশ বৃদ্ধি করে চলতেন।

ঘৃণা করা খারাপ ? নিজের বাবাকে, মা-কে, নিজের পরিবেশকে ? কে বলে সে কথা ? যে বলে সে মূর্খ। জীবনভরে শুধু ঘৃণা-ই করেছে নিশীথ। ঘৃণা করেছে যার সঙ্গে যখন মিশেছে। মানুষগুলোকে ব্যবহার করেছে সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে যেমন মানুষ উঠে যায়—নিশীথ তেমনই মানুষগুলোকে ভুলে গিয়েছে—তাদের ওপর ভর করে একধাপ ওপরে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে।

ঘৃণা করতে পেরেছিল বলে-ই না আজ নিশীথের পক্ষে সম্ভব হলো এইরকম স্তরে উঠবার ? বাকি ছিলো সমাজের ছাড়চিঠি। বাসবী হলো সেই ছাড়চিঠি।

অসিত মৈত্র-র কাছে তার অকপট স্বীকারোক্তি ছিলো—সে ভুল করেছে স্বর্ণমৃগের পেছনে অযথা ধাওয়া করে। স্বর্ণমৃগ কোথাও থাকে না। স্বর্ণমৃগ এক দানবের ছলনা মাত্র। সে সৎভাবে পরিশ্রম করে একটা সহজ সরলজীবনে ফিরে আসতে চায়। বাঁচতে চায় নতুন করে।

তাই, অসিত মৈত্র-র কাছে নিজেকে পরিষ্কার করবার জন্য, তাঁর বিশ্বাস অর্জন করবার জন্য, এই রাস্তার ভার নিয়ে এসেছে নিশীথ। রাস্তাটা সে শেখপুরার এয়ারোড্রোমে ঢুকিয়ে দিচ্ছে না। সিধে সড়ক কাটতে চাইছে অসিত মৈত্র-র হৃদয়ের ভেতরে।

তাতে বাধা হলো কিসে ? নিশীথের মনের চোখে শাদায় কালোয় সার বেঁধে একটা ছবি ফুটে ওঠে। ধূসর এ্যাস্‌ফল্ট রোড-এর ওপর কর্মনিরত চলমান সাঁওতাল কুলীকামিনদের মিছিল নয়। সাদা কাগজে কালো হরফে চ্যাটার্জির চিঠি। অসিত মৈত্র-র উইলের খবর। কেয়া

ছাড়া সলিসিটর নন্দীর ঘর থেকে খবর বেরুত কি করে? অসিত মৈত্র-র টাকাকড়ির অর্ধেক পাবে বাসবী। বাসবীর পর পাবে নিশীথ। আর, যদি বাসবীর কোনো সন্তান হয়, তা'হলে সে-ই পাবে সব, নিশীথের পরিবর্তে। নিশীথ মাসে মাসে টাকা পাবে মাত্র, অথবা একটা থোক টাকা—যেটাতে সে রাজী হয়। আর···তখন-ও টাকার কিছু কিছু অংশ যাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

চিঠির নিচে কেয়া লিখেছে—মনে হচ্ছে, তোমার স্বীকৃতিগুলো বড় বেশী আন্তরিক হয়ে গিয়েছিলো। মৈত্র মূর্খ নন্ নিশীথ। অনেকদিন আগে ট্রেমার কোম্পানীর সে জোচ্চুরি ঐ মৈত্র-ই ধরে ছিলেন। তোমার ব্যবস্থা কি, কেমন করেছেন, সবই তো জানলে। এবার আমরা কামনা করছি তোমার একটি ছেলে হোক নিশীথ। বন্ধুজনের কামনা—ভুল বুঝোনা যেন।

নিশীথের মনে হয় বাসবী এতদিনে তারসঙ্গে চূড়ান্ত এক বিশ্বাস ঘাতকতা করলো। তার যা জীবন, তাতে একটি শিশু, একটা প্রতি-বন্ধক ছাড়া কিছু-ই নয়। মূর্ত প্রতিবন্ধক একটা। কি করে নিশীথ? কোনদিকে যায়।

নিজেকে বড় অভিশপ্ত মনে হলো নিশীথের। তবে শেষ চালে এমন করে হেরে যেতে-ও রাজী নয় সে।

বাসবী বেশ প্রফুল্ল-ই ছিল ইদানীং। কিন্তু কালকের পর যেন মনটা খারাপ হয়ে গেল তার। কোন কিছু-ই ভাল লাগলো না। সকালে নিশীথ বেরিয়ে গেলে পরে বসে রইলো দুই হাত কোলে করে। সাঁওতাল দুটি মেঝেন্ মেয়ে তার বাড়ীতে কাজ করে। বড় ভালো লেগেছিল বাসবীব এ বাড়ীটা। নতুন কাঠের বাংলো। নতুন নতুন গন্ধ একটা চারিদিকে। আসবাব পত্র বলতে গেলে নেই। উপকরণ নেই—বাহুল্য নেই। শহরের জীবন থেকে কিছু টেনে আনেনি বাসবী। সেখানকার জীবন সেখানেই ফেলে রেখে এসেছে। এখানে সবই নতুন। মেঝেন্ মেয়ে দুটি গান করে করে কাজ করে। কাজের মধ্যে কেমন করে যেন ওরা আনন্দ খুঁজে পায়। বাসবী বাইরে জাফরি

কাটা বারান্দায় বসে এক মধুর আলস্যে মনবিছিয়ে দিয়ে চেয়ে থাকে। পাখী ডেকে ডেকে বাতাস মুখর করে। কাঠবিড়ালীর ত্রস্ত আনাগোনা দেখা যায়। শালপাতায় বাতাস বয়ে শব্দ হয় ঝরঝর্ মরমর—যেন এ-ও এক সমুদ্র। শান্ত গুঞ্জরণে ঘুম এনে দিচ্ছে বাসবীর চোখে, শান্তি এনে দিচ্ছে বাসবীর মনে।

আজ বাসবীর কিছু ভালো লাগলোনা। সারাদিন বসে রইলো চিবুকে হাত রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো যার আগমনের সংবাদ-ই শুনতে চায় না নিশীথ, সে অবাঞ্ছিত অতিথিকে সে কি করে সম্মান দেবে? তারপর মনে হলো, জীবনে সুখের এই একটি অঙ্কুর সম্ভাবনা—একে বিনষ্ট হতে দেবেনা সে। তারচেয়ে সে চলে যাবে আলিপুরে। না হয়···না হয় সেখানেই থাকবে। নিশীথ যতদিন না তাকে প্রয়োজনীয় মনে করে নিজের জীবনে? যেদিন নিশীথ তাকে ডাকবে, সে দিনই সে চলে যাবে।

রাতে খাওয়ার পর ঘরে এসে বাসবী টেবিলে টুকি টাকি জিনিস গোছাতে গোছাতে বললো

—শোন, সবদিক ভেবে দেখছি, আমি বরং আলিপুরে চলে যাই।

—বাসবী!

—না, নিশীথ! বারণ ক'রো না। এখানে তো তুমি ভালই থাকবে—আমি তো তোমার কাজে এমনিতে-ও লাগবনা—আমি চলে যাই মা বাবার কাছে। তাঁরা তো তাড়িয়ে দেবেন, না গিয়ে দাঁড়ালে!

—এ কথা কেন বলছো বাসবী?

—বুঝতে পারছ না নিশীথ?

চেয়ে থাকে বাসবী। এমন সকরুণ, এমন সুন্দর দেখায় তাকে, যেন সে মানুষ নয়, অলৌকিক কিছু, যেন একটি ভগ্ন হৃদয়ের মূর্ত্ত ছবি। ঠোঁটটা ঈষৎ কাঁপে, চোখ টলটল করে জলে। বাসবী বলে

—তোমার কাছে যদি বা অবাঞ্ছিত হয় সে আমার কাছে ত' তা নয়

নিশীথ! আমি বাবা মা-র কাছেই থাকব। এখন থেকে না হয় তাই থাকলাম। মনে হয় তোমাকে এর বেশী কিছু চাইলে শুধু বিব্রত-ই করা হবে।

—সে কথা ত' আমি বলিনি বাসবী!

—তুমি শুধু তাকে পরিচয়টুকু দিও নিশীথ। তার বেশী তোমার কাছে আমি চাইব না। কোনদিন-ও নয়। বিব্রত করবো না—বিরক্ত করবো না—তুমি তোমার নিজের মতো ক'রে বাঁচ নিশীথ। আমাকে মাঝে রেখে আর ভুলের বোঝা বাড়াব না।

সহসা শরীরটা টলে যায় বাসবীর। ঘুরে যায় মাথা। নিশীথ তাকে জড়িয়ে ধরে। আজ অনেকদিন বাদে কাঁদতে থাকে বাসবী। ছোট কোনো মেয়ের যেন সাধের পুতুল ভেঙে গিয়েছে, তেমনই গভীর মর্ম বেদনার কান্না। বাসবীর চোখের সবটুকু জল আজ নিশীথের বুকেই ঝরে।

নিশীথ আজ বাসবীকে ছাড়ে না। বার বার সান্ত্বনা দেয়। বলে —যা বলেছি ভুলে যাও বাসবী। স্বার্থপরের মতো ছোট ছোট কথা বলেছি? আমি যদি বা স্বার্থপর হই, তুমি কেন নিষ্ঠুর হবে বাসবী?

—তুমি কেন অমন কথা বললে?

—কি বললাম? ভুলে যাও বাসবী—যেতে চাও, আলিপুরে আমি পৌঁছে দেব। আমি নিয়ে যাব কলকাতা। শোনো, কাল-ই লিখে দেব মা-কে। এখন তো তোমাকে থাকতেই হবে ওখানে বাসবী! কত যত্ন দরকার হবে—আমি কি পারব সব? লিখে দিয়ে আমরা চলে যাব সুবিধা মতো। কেমন?

বাসবী জবাব দেয় না। প্রাণ মন ভরে কাঁদে বাসবী। মনে হয় এই কান্নাতে-ই তার শান্তি।

ক'দিন বাদে কলকাতা থেকে দুইখানা চিঠি আসে। বাসবীর চিঠিতে থাকে আশীর্বাদ ও শুভকামনা। নিশীথকে চিঠিখানা দেখাবে বলে আঁচল ঘুরিয়ে চলে যায় বাসবী। মনটা তার এখন খুব ভাল। কদিন পরেই চলে যাবে। ছোট্ট সংসার গুছিয়ে গুছিয়ে রাখে।

নিশীথের চিঠিটায় কাজের কথা শুধু। মৈত্র লেখেন—'খুব খুশী হয়েছেন শেরিডান সাহেব তোমার কাজে। গগনভাই-এর কি ক্ষতি হয়ে গেল জানো বোধ হয়? ঐ ব্যাঙ্কের সঙ্গেই ওর কারবার ছিল। ডক্টর পালিতের কাছে কাল গিয়েছিলাম। তুমি লিখেছ, বাসবী বন্ধ জায়গায় ভয় পায়—দরজা বন্ধ থাকলে' বা কোন বন্দী হবার অনুভূতি হলে চেঁচিয়ে ওঠে। ডক্টর পালিত বলেন—এটা হচ্ছে claustrophobia অর্থাৎ বর্তমান সভ্যতায় সবচেয়ে পরিচিত অসুখ। এটা যে অসুখ, তাই অনেকে জানে না। হঠাৎ মাঝপথে লিফ্‌ট বন্ধ হয়ে গেলে, বা নতুন রং করা দরজা জানালা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ চেঁচিয়ে ওঠে ভয় পেয়ে—বিচার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে—এটাই হলো অসুখ। তা' বাসবীকে যখন নিয়েই আসছো…কবে আসবে? জানিও আগে-ই।'

রাত হয়েছে। ছুটে চলেছে ট্রেন। বাসবী ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশীথের চোখে ঘুম নেই। ট্রেনটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে? কোন পরিণতির দিকে? শেষ অবধি এ-ই হবে? হেরে যেতে হবে নিশীথকে? হেরে যেতে হবে বাসবীর কাছে? এতো বাসবীর কাছেই হলো এই পরাজয়। বাসবী পাবে টাকা—আর বাসবীর পরে পাবে বাসবীর সন্তান। নিশীথ? নিশীথ যে এত কষ্ট করে জাল ফেললো, গুছিয়ে নিতে চাইলো জীবনটাকে—সে শেষ অবধি অসিত মৈত্র-র দয়ার দান নিয়ে খুশী থাকবে? ভাবতে পারে না নিশীথ। ভাবতে পারে না, আর মনটা তার জ্বলে জ্বলে যায়। এতটুকু নয়—ভেঙে ভেঙে নয়—নিশীথ সবটা চায়। সব কিছু চায়। কিন্তু বাসবী…

ফার্স্ট্‌ক্লাস গাড়ীর দরজাটা হাঁ করে খোলা। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটে উড়িয়ে নিচ্ছে কামরা। বাতাস এত ঠাণ্ডা কেন? আর, ঐ শব্দ আসছে কোথা থেকে? টুর্নী নদী। টুর্নী নদী এখানে গিয়ে মিশেছে দারাবতীর সঙ্গে। দুই পার্বত্য নদী মিশে এক প্রশস্ত জলপ্রবাহ গর্জন করে ছুটে চলেছে আরও পূবে। টুর্নী ব্রিজ ঐ কাছে আসছে। ছোট ব্রিজ। রেলিং নেই। তবে খাড়াই তার খুব।

অনেক নিচ দিয়ে ফুলে ফেঁপে মাতাল হয়ে চলেছে টুর্নী। একে মাতাল নদী, তাতে অকাল বর্ষণের জল পেয়েছে। টুর্নী এখন শুধু নিজের আনন্দে অধীর হয়ে নিজেই চলছে না, ক্ষ্যাপাহাতে ভেঙে ভেঙে আনছে শাল-মহুয়া কেঁদ গাছের ডালপালা। নিশীথের মনে পড়ে বাসবী এই ব্রিজ দেখতে চেয়েছিলো। সে ডাকে, বাসবী! বাসবী! বাসবী!

উঠে বসে বাসবী। ঝোড়োবাতাসে উড়ে যাচ্ছে নিশীথের কপালের চুল। নিশীথের মুখ দেখা যায় না। নিশীথ বলে,

—তুমি যে ব্রিজ দেখবে বলেছিলে?

বাসবী উঠে দাঁড়ায়। নিশীথ বলে—এসো এখানে এসো।

—ভয় করে।

—ভয় কি বাসবী, আমি আছি!

এগিয়ে আসে বাসবী। দাঁড়ায় দরজার সামনে। নিশীথের হাতে ধরে—নিজেকে সামলে।

আর, যে কথাটা নিশীথের অবচেতনে সাপের মতো দংশে চলেছিলো সেই কথাটাই ঝলকে ওঠে মাথার মধ্যে। বাসবী শরীরের ভর ছেড়ে আলগা হয়ে ছিলো বলেই সামলাতে পারেনা নিজেকে। তবু নিশীথের মুখ দেখতে দেরী হয় না তার।—নি··শী...থ! —বাসবীর চীৎকারটা হাসিয়ে যায় ঝোড়ো বাতাসে। নিশীথের ধাক্কায় বাসবীর শিথিল দেহটা ব্রিজের কিনারে বাড়ি খেয়ে হারিয়ে যায় নিচের অন্ধকারে। টুর্নীর ক্ষ্যাপা জল লক্ষ হিংস্র বাহু তুলে ধরে নেয় বাসবীকে।

ট্রেণের স্পীড বাড়ে—তীব্র বাতাস তীক্ষ্ণ চিৎকার ট্রেনের—সে যেন কোনো মরণোন্মুখ অতিকায় জানোয়ারের মরণ আর্তনাদ।

ট্রেণের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মাতালের মতো কাঁপতে থাকে নিশীথ। কি হলো? তবে এ-ই কি তার মনে ছিলো?

ব্রিজ ছেড়ে এসে ট্রেণ ছুটে চলে গতিবেগ বাড়িয়ে। একপাশে পাহাড়—অন্যপাশে খাদ। জনমানবের ঠিকানা নেই বিশমাইল এদিকে

ওদিকে। চেন ধরে ঝুলে পড়ে নিশীথ। হঠাৎ ধাক্কা পেয়ে সচেতন হয়ে, তারপর গতিবেগ কমাতে কমাতে থেমে যায় ট্রেণ।

ইতিকথার পরের সে পর্ব বড় মর্মান্তিক। ট্রেণ থামলেও নিশীথের কামরায় পৌঁছুতে অনেক সময় লাগে গার্ডসাহেবের। লাইনের পাশে আলগা পাথরের স্তূপ। পা পিছলে খাদের মধ্যে পড়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। অনেক সাবধানে এসে পৌঁছন গার্ডসাহেব।

শোকে উন্মাদ নিশীথ শুধু তার অনুরোধ জানিয়ে চলে—ট্রেণ পিছিয়ে নেওয়া যায় না? আমার স্ত্রী যে পড়ে গেছে—আপনারা করতে পারেন না কিছু?

রাত সেখানেই কেটে যায়। নিশীথকে নামিয়ে নেওয়া হয় মৌসমীয়া স্টেশনে। আর্জেন্ট টেলিগ্রাম যায় কলকাতায়। নিশীথ টাকার ব্যাগ, ঘড়ি সব নামিয়ে দেয় স্টেশন মাষ্টারের টেবিলে। বলে —লোক আনুন – যা দরকার হয় খরচ করুন—আমার স্ত্রীকে এনে দিন আপনি···অন্তত তাকে দেখতে তো পাব?

অসিত-ও এসে পড়েন। কিন্তু আর কিন্তু করবার থাকে না। টুর্নী ব্রিজ-এর দুই মাইল পর থেকে সুরু হয়েছে খাদ। ছয়শো থেকে হাজার ফিট গভীর খাদ। একেবারে খাড়াই—অতলস্পর্শ সে অন্ধকার। আর সে খাদের অপর দিকে উঁচু পাহাড়। খাদটা চলেছে সাত মাইল ধরে। খাদের পাড়ে গভীর জঙ্গল। এর মধ্যে যদি পড়ে যায় বাসবী—তার বাঁচা যেমন অসম্ভব তাকে উদ্ধার করা আরো অসম্ভব।

তবু অজস্র টাকার লোভে সাঁওতালরা যায় কিছুদূর। এসে তারা জানায় কোথাও কোনো নিশানা নেই। শুধু সুগভীর এক খাদের ওপরে আকাশে উড়ছে চক্রাকারে শকুনি।

শুনে নিশীথ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় অসিতের পায়ের কাছে।

॥ ৮ ॥

শোকার্ত পিতামাতার হৃদয় এ মর্মন্তুদ সংবাদে-ও ভেঙে পড়বার অবকাশ পায় না। শোকে পাগল হয়ে যায় নিশীথ। গাড়ী থেকে নেমেই হাসিমুখে জ্যোতিপ্রভাকে বলে—যান, এগিয়ে যান, বাসবী গাড়ীতে আছে।

তারপর-ই সিঁড়ির মুখে বধূবেশে বাসবী আর তার ছবি দেখে চেঁচিয়ে ওঠে—বাসবী! বাসবী! এ কি করলে তুমি?

আবার অজ্ঞান হয়ে যায় নিশীথ। জ্ঞান ফেরে কিন্তু চেতনা বুঝি ফেরে না। বিড়বিড় করে শুধু-ই কথা বলে চলে নিশীথ—ট্রেণের দরজা কেন অমন করে খুললে? কি হয়েছিল? কি হয়েছিল বাসবী? তুমি যে আমার হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলে? কি হলো বাসবী?

বলে, আর অজ্ঞান হয়ে যায়। নিজেরা কাঁদবেন কি বুকে পাষাণ দিয়ে অসিত নিশীথকে-ই সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ডাক্তারকে হাত তুখানি ধরে বলেন—ডাক্তারবাবু, আমার যে মেয়ে গেল, তাকে তো আর ফিরে পাব না। একে কেমন করে সামলে তুলি বলুন?

এ তো শুধু উদ্বেগ নয়—এ যে পাপক্ষালন তাঁর নিজের-ও। বাসবীর সম্পর্কে নিশীথের ভালবাসা সম্পর্কে মনেমনে সন্দেহ ছিল তাঁর—আজ নিশীথের অবস্থা দেখে বারবার যে বুকটা ফেটে যাচ্ছে তাঁর? বাসবী কি এমনি করে শোধ নিলো? নিজে চলে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল? যে নিশীথ-ই তাকে ভালোবেসেছিলো, পিতৃত্বের অন্ধ অভিমানে সে ভালবাসা দেখতে পাননি অসিত!

জ্যোতিপ্রভা কিন্তু সে-ই যে মুখ ফিরিয়ে মালবীকে বুকে টেনে উপুড় হয়ে পড়লেন বিছানায়—মুখ তুললেন না আর তিনদিন। অজ্ঞান-ই হয়ে ছিলেন—শেষ অবধি গ্লুকোজ দিতে হয়েছিলো।

তারপর উঠলেন বটে, কিন্তু এ যেন অন্য মানুষ। সেই স্নেহে মমতায় মাখা মাতৃমূর্তি যেন জ্বলে গিয়েছে। আর নিশীথের ওপর মন বিরূপ হয়ে গেল তাঁর। নিশীথের দিকে তিনি চাইতে পারলেন না। নিশীথ তাঁর মেয়ের অনেক মনোদুঃখের কারণ হয়েছে, এ যেন তিনি মর্মে মর্মে জানলেন।

তারপর একদিন অনেক রাতে—একা একা পায়চারি করছেন যখন জ্যোতিপ্রভা বারান্দায়—তখন মনে হলো বাতি জ্বলছে ভেতরেব ঘরে। খস্ খস্ পায়ের শব্দ। কৌতূহলে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে বাসবীর স্টাডিতে। কে সেখানে এত রাতে?

গিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন জ্যোতিপ্রভা। বাতিদানে মোমবাতি ধরে দরজার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে নিশীথ। বাতি তুলে অনিমেষে তাকিয়ে আছে দেয়ালে বাসবীর ছবির কাছে। বাসবীর ছবি। বুকে পিঠে চুল ছড়ানো—কোঁকড়া চুলে ঘেরা একখানি সুকুমার ঢলঢলে মুখ। ঢাকাই শাড়ী পরে এমনিই চেয়ে আছে। নিশীথ আরো কাছে যায়। বলে—কেন! কেন আমাকে ঠকালে? যদি মনে এ-ই ছিলো, তবে পলক আগে কেন আমার সঙ্গে অত কথা বলেছিলে? আমার হাতে মাথা রেখে ঘুমোলে? আমি যে তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম বাসবী। বল, কথা বল! বল—স্বপ্নে এসে এত কথা বল, এমন করে হেসে হেসে চাও মুখের দিকে—এখন যে এত ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না বাসবী? আমি, আমি নিশীথ—আমি ডাকছি তোমায়।

জ্যোতিপ্রভার চোখ দিয়ে রুদ্ধঅশ্রু ঝরতে থাকে। এর উপর বিমুখ হয়েছিলো তাঁর মন? কি আছে এর? শুধু তাঁর মেয়ের ক'রে একহৃদয় প্রেম ছাড়া?

এগিয়ে যান তিনি। কাঁধে হাত রেখে বলেন—নিশীথ! শোবে চলো!

ঘুরে দাঁড়ায় নিশীথ। হাতের বাতিদানটা পড়ে যায় তার। আঁধার

হয়ে যায় ঘর। তারপর মাটিতে ভেঙে পড়ে জ্যোতিপ্রভার হাঁটুতে মাথা ঘসে বোবা একটা কান্নায় গুমরে ওঠে নিশীথ।

জ্যোতিপ্রভার অনুতপ্ত অশ্রু নিশীথের মাথায় ঝরে ঝরে পড়ে। নিশীথ জানে, যে তাকে ক্ষমা করলেন জ্যোতিপ্রভা।

শোকের প্রথম আঘাত প্রশমিত হলে, নিশীথ চলে যেতে চায় মিড্‌ল রোডের বাড়ী। একদিন সকালে বলে—আমার এবার চলে যাওয়া দরকার। অনেকদিন ত' হলো!

অসিত বলেন—ও বাড়ী তুমি চাও ভাড়া দাও, নয় বেচে ফেলো। তুমি এখানেই থাকবে নিশীথ।

জ্যোতি-ও সেই কথাই বলেন। আসলে নিশীথের মধ্যে দিয়ে তাঁরা বাসবীকে-ই যেন ফিরে ফিরে অনুভব করেন। তাঁদের সমস্ত কাজ তাঁদের জগৎটা-র সবকিছু যেন অবান্তর হয়ে গিয়েছে। সত্যি শুধু বাসবী। বাসবীকে ঘিরে-ই চলেছে তাঁদের সবকিছু। সকাল থেকে রাত অবধি। সে এই ফুল ভালবাসতো, সে এমনি সময়ে গান শুনতে ভালোবাসতো, এই বাগানটি তার বড় প্রিয় ছিল—মা-কে বাবাকে সেবা করতে সে বড় ভালবাসতো—মালবীকে নিত্যি নতুন জামা পরাতে ভালবাসতো—এই সব কথা, এই সব স্মৃতির চারিপাশে গুঞ্জরণ করে মন।

নিশীথের ঘরে তবু রাতে আলো জ্বলে। দরজা বন্ধকরে একা বসে প্রেতচক্র করে নিশীথ। বলে—আমিই মিডিয়াম। এসো, বাসবী এসো—প্ল্যাঞ্চেট করবার জন্যে সোসাইটির খোঁজ করে। বড় বড় বই পড়ে। জার্মানী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ। পড়ে পড়ে মুখস্থ করে। রাত জেগে জেগে চেহারা হয় পাগলের মতো। ঘরে বাসবীর ছবি রেখে চেয়ে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

দেখে শুনে অসিত জ্যোতিপ্রভাকে বলেন— চলো আমরা কিছুদিন বাইরে থেকে আসি। ঘুরি দেশে দেশে। যেখানে ভাল লাগবে সেখানে থাকব। কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

জ্যোতির গালবেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। বল্লেন—তাই তো ভেবে-ছিলাম। কে জানতো এমন করে ?……

নিচের বাগান দিয়ে মালবী বাস থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে আসছে। চেঁচিয়ে গান করছে

—'রঙ্গে ভঙ্গে বায়ু বহিতেছে……

…গুঞ্জিছে গুন্‌গুন্ ভ্রমরা ফুলে

সুন্দর মধু ঋতু আইলরে !

মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায় সে যখন ঐ মালবীর মতোই তেরো বছরের মেয়ে ছিলো, তখন এমনি করে এ-ই গান গাইতে গাইতে আসত। মনে পড়ে যায়, স্কুলের সব খবরাখবর আগে এসে মা-কে বলতো। কথায় কথায় বলতো—মা জানলে ? মা বুঝলে ?

মালবীকে দেখলে হঠাৎ যেন বাসবীর-ই আদল এসে যায়। মনে পড়ে যায়—যার কথা মনে পড়ে যায়, সে এখন কোথায় ?

জ্যোতি অসিতের হাতে হাত রাখেন। বলেন—সে-ই ভালো। সে আসবে সে থাকবে বলে ঘর সাজিয়েছিলাম ! তার সে চিঠিখানা যে আমার মর্মে গাঁথা হয়ে আছে। চলো, কোথাও চলে যাই। কি আমাদের পিছটান বলো ? কিছু নেই। যেদিন খুসী ফিরবো। এই ঘরদোর যেন তার সঙ্গে জড়ানো। চলো, অন্য কোথাও যাই।

—অন্য কোথাও গেলেই কি আর তাকে এড়াতে পারবে জ্যোতি ? সে তো কোথাও যায়নি— সে যে আমার তোমার মর্মের মধ্যে রয়েছে। তা নয় ! তবে নিশীথকে যা দেখছি…বড়রকম অসুখ না হয়ে পড়ে।

তাই ঠিক হয়। বেরিয়ে পড়েন মৈত্র-পরিবার, নিশীথকে সঙ্গে নিয়ে।

নিশীথকে যারা সহ্য করতে পারেনি— নিশীথের সঙ্গে বাসবীর বিয়ে হবার পর যারা মৈত্রবাড়ীর সংশ্রব ত্যাগ করেছিলো—বাসবীর শোচনীয় মৃত্যুর পর তারা-ও এলো একে একে। শুধু তো বৈভব নয়, স্বভাব, আভিজাত্য, ভদ্রতা, সকল দিক দিয়ে-ই মৈত্রপরিবার ছিলেন জনপ্রিয়। সবই করেছেন তাঁরা, সমাজে-ও কম যাতায়াত করেননি। তবে যেটা সকলে শ্রদ্ধা করতো, সেটা হলো, মৈত্র-রা তাঁদের বাঙালী আভিজাত্য

ছাড়েননি। জ্যোতিপ্রভার আতিথ্যের নাম ছিলো সমাজে। বাঙালী রান্নাবান্না, মিষ্টান্ন তৈরীতে তাঁর জুড়ি ছিল না। বাসবী বরাবর-ই কনভেন্টে পড়া মেয়ে—কিন্তু তার নিজস্বরুচির সৌরভ যেন তাকে সতত ঘিরে থাকতো।

আসন্ন এই যাত্রার প্রাক্কালে এলেন ভিভিয়ানের মা। মিসেসরায় জ্যোতিপ্রভার হাত ধরে বসে রইলেন। দুজনের-ই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো টপটপ করে। বাসবীর সম্পর্কে মর্মাহত হয়েছিলেন মিসেস রায়। তাই বলে, এমন মৃত্যু-তে শেষ হয়ে যাবে তার জীবন, তা তো চাননি ?

এলেন একে একে অনেকেই। সবিতা এসে জ্যোতিপ্রভার কাছে ফুলে ফুলে কাঁদলো।

সুগত শিল্পীজনের-ই মেজাজের পরিচয় দেয়। বিশাখাকে বিয়ে করে পাব্লিসিটি অফিসে বড় চাকরীতে বহাল হয়েছে সে। টাকার কথা না ভেবে সে সরযূদেবীর কালেক্শান থেকে শকুন্তলার ছবি একখানা কিনে আনে। তার ছবি সরযূদেবী যে দামে কিনে-ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী দামে-ই তাকে ফিরে কিনতে হয়। সুগত মিত্রের কম্প্লিমেণ্ট সহ সে ছবিখানা পৌঁছে যায় মৈত্র-বাড়ী।

শকুন্তলার মডেল ছিলো বাসবী। বাসবীর বয়স তখন সবে আঠারো। দেহে যৌবন এসেছে কিন্তু মন যেন তখনো প্রভাতের পুষ্পকাননের মতো-ই পবিত্র, সরল—সেখানে সব ক-টি ফুল-ই পূজার ফুল—কুন্দ-রঙ্গন-অপরাজিতা। বসন্ত সমাগমে সে কানন তখনো মুঞ্জরিত হয়নি।

ছবিখানি দেখে অসিত ও জ্যোতিপ্রভার যেন কৃতজ্ঞতার সীমা রইলো না। এক হাতে গাছের ডাল ধরে চেয়ে আছে বাসবী। পুষ্পিত শাখার মতোই সুন্দর মুখখানির শোভা। ঘাসীসবুজ রঙের নরম একখানা শাড়ীর আঁচল কাঁধ ছেড়ে লুটিয়ে পড়েছে। ডান কাঁখে এক চিত্রিত কলস। তার থেকে জল ঝরে ঝরে পড়ছে একটি শিশুতরুর গোড়ায়।

সুগত আসেনি। ফোনে তাকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন অসিত। বললেন—ধন্যবাদ জানাই—আশীর্বাদ করি আপনাকে—আপনি যেন সুখী হন, সার্থক হন জীবনে।

সুগত-কে অনেকটা শাসনে এনেছে বিশাখা। তবু আজ সুগত নতুন করে বোতল ভাঙলো একটা। বললো—ব'সো বিশাখা। সঙ্গী হও। শুধু চোখে কেমন করে বুঝবে কেমন লাগে?

বিশাখা-ও খুসী হয়েছে সুগত-র ব্যবহারে। বাসবী মৃত। সে সকল দ্বেষ-বিদ্বেষের অতীতে চলে গিয়েছে। সুগত-র আচরণে যদি শোকার্ত মৈত্র দম্পতি আনন্দ পান, সুখ পান—সে তো ভাল কথা।

সুগত যেন আনমনা হয়ে গেল কি ভেবে। আমেজে প্রফুল্ল হয়ে উঠলো না। অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কোন সুদূর চিন্তার মধ্যে যেন ডুবে রইলো। তারপর মুখ তুলে ঈষৎ হাসলো। বললো—বিশাখা, দেখেছো একটা মজা?

—কি?

—বাসবীর মৃত্যুর মধ্যে-ও কতটা মৌলিকত্ব আছে?

—বুঝলাম না।

—বুঝছি কি আমিই? বোঝাবার চেষ্টা আরো অসম্ভব। কিন্তু শিল্পী তো আমি, রঙে রঙ মিলিয়ে ভেবে ভেবে দেখছি, এটাই যেন নিশীথ তালুকদারের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেলো বেশী। নিশীথের সঙ্গে যখন যে জড়িয়ে পড়ে, শেষটাই সে অতল আঁধারে তলিয়ে যায়। কেমন যেন হয়ে যায়। বাসবী যদি পাগলামি করে আত্মহত্যা-ই করবে······

—আত্মহত্যা বলছো কেন?

—কি বলব বিশাখা? কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ শুনলাম বাসবীর হয়েছে এক বিদঘুটে অসুখ। আবার এত কিছুর পরে···সেই কোন্ দূর দেশে···কেমন যেন লাগে। তবে এটাই ভাল। অর্থাৎ স্বাভাবিক। কোন দুর্গম খাদের তলায় কোন ভয়ঙ্কর মৃত্যু···একেবারে মুছে নিলো বাসবীকে।

—সুগত, আমার মনেহয়, বাসবীকে তুমি আজ-ও ভালোবাসো।

—ইদানীং বড় দুঃখে ছিলো। তুমি জানোনা।

—হ্যাঁ, মস্ত দুঃখ। হীরে ছাড়া পরতো না। বুঝতে পারে না বিশাখা। আর বোঝাতে চায়ওনা সুগত। বলে—বাসবীর কথা থাক বিশাখা। সত্যিই এ একটা ভাববিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।

নিশীথের সম্পর্কে তবু-ও যাদের সন্দেহ ছিল, তারা শেষ অবধি তাদের সে হীন ধারণা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। মিড্‌ল রোডের বাড়ী বেচে দিয়ে হাঁসপাতালে টাকাটা দিয়ে দেয় নিশীথ। দিয়ে দেয় বাসবীর নামে। কাগজে কাগজে বাসবীর ছবি বেরোয়। তার নিচে তার স্বামীর এই দানের কথা ফলাও করে লেখা হয়।

এবার বুড্‌ঢা গুহ-ও অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি হজম করে করে আসে মৈত্র-র বাড়ী। নিশীথকে জানিয়ে যায় তার সহানুভূতি। বাড়ী গিয়ে প্রিয়া-কে বলে—কি বদলে গিয়েছে তালুকদার, যদি দেখতে ?

তারপর যাত্রার দিন আসে। আলিপুরের বাড়ীর ঘরে ঘরে তালা পড়ে। চাবি থাকে শঙ্করের হাতে।

সকলে চলে গেলে পরে কাজ যা থাকবে, তা ঐ শঙ্করের। ঝাড়বে মুছবে সে। দেখাশোনা করবে চাকরদের। নিজে সে থাকবে ওপরে।

ভয় করবে না তোর ?

নিশীথের এ প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়ে শঙ্কর।

ভয় করবে না শঙ্করের। ভয় কাকে ? বাসবীকে তো ? বড়ঞ্চ রাতে জেগে শুয়ে থাকবে সে। যদি দেখতে পায় বাসবীকে, তো জিজ্ঞাসা করবে—বলে যাও, কেন এমন করলে ? কোন্ নতুন দুঃখে ? কোন্ নতুন অপমান ছিলো তার পেছনে ?

জিজ্ঞাসা করবে—মা, জীবনে ত' শান্তি জানোনি—এখন কি শান্তি পেয়েছ ?

শঙ্করের দৃঢ় বিশ্বাস মা তাকে ঠকাবেনা। আসবে-ই। জানিয়ে যাবে মনের কথা।

॥ ৯ ॥

ওদিকে জনস্টোনগঞ্জের মিশনরী হাসপাতালে জ্ঞান ফিরতে চায়না বাসবীর।

মরলে-ই যার ভাল ছিলো সে বাঁচলো কেন? বাঁচলো কেমন করে? নিজের মনকে জিজ্ঞাসা-ও করতে পারেনি বাসবী। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মাঝামাঝি জায়গায়—চেতন অচেতনের আলো আঁধারিতে যে যুঝেছে দুইমাস ধরে তাকে কথা কওয়াবার জন্য ডাক্তারের এত চেষ্টা সবই মিথ্যে হয়ে যায়। ডাক্তার বারবার বলেন—কথা বলুন, মনে করুন কে আপনি? কোথায় বাড়ী আপনার? এমন দুর্ঘটনা কেমন ক'রে হলো?

বসতে চেষ্টা করে বাসবী। দুর্বল মাথায় মনে আনতে চেষ্টা করে—কি করে সে এখানে এলো! মনে করতে যেতে-ই মনে হয়, চোখের সামনে ভেসে ওঠে আঁধার কালো জলের ঘূর্ণী। ডুবে যাচ্ছে সে—মনে পড়ে সমস্ত শরীর দিয়ে অসহ্য একটা যন্ত্রণা যেন তাকে বর্শা বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলছে। আর বলতে পারেনা বাসবী। দুই হাতের ঝাপটায় জল সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে সামনে থেকে। কিন্তু উত্তাল সে তরঙ্গ রোধ করবে এমন ক্ষমতা কোথায় তার? মা···মাগো! এই একটা নামই ডেকে আবার অজ্ঞান হয়ে যায় বাসবী।

বাসবীকে নিয়ে পুতুল খেলছে নিয়তি—নইলে ঐ খাড়াই থেকে নিচে প'ড়ে বাঁচতো কেমন করে সে?

ভবিতব্য। কিন্তু কার ভবিতব্য? তার, না নিশীথের, না অপর কোনো অদৃশ্য শক্তির নাম-ই ভবিতব্য? কেউ বলে দেয় না, বুঝিয়ে দেয়না বাসবীকে।

পড়েছিল বাসবী টক্কর খেয়ে। লোহার থামে আছাড় খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে—টুর্নীর ক্ষ্যাপা জলে। কিন্তু এমন আশ্চর্য কৌতুকবোধ

নিয়তির, যে জলে নয়, বাসবীর অজ্ঞান শরীরটা পড়লো ঝোপঝাড় ডালপালার একটা ছোটখাটো দ্বীপের উপর। লক্ষ বাহুতে তাকে নাচাতে নাচাতে টুর্নী চললো দারাবতীর দিকে। জীবনমরণ একাকার করা একটা আতঙ্কের অনুভূতি অজ্ঞান করে দিয়েছিল বাসবীকে।

দারাবতীর ধারে জন্‌স্টোনগঞ্জ। একদা অভ্রের খোঁজে এসে জন্‌স্টোন সাহেব পত্তন করেছিলেন একটি উপনিবেশ। কালের প্রকোপে মাটি থেকে অভ্রের স্তর আর মিললোনা। কলকাতার ক্লাইভ স্ট্রীট আর বিলেতে এই অভ্রের কারবার বন্ধ হলো। কিন্তু খোঁজ পেয়ে যে মিশনারীরা এলেন এখানে—তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাক্তার রামানুজ। এসেছিলেন বাইবেল হাতে—গলায় কালো সুতোয় রূপার ক্রুশ ঝুলিয়ে। কিন্তু নিজের রং কালো বলেই হোক, বা এই দেশের মানুষগুলোকে ভালবেসেই হোক, হাঁসপাতাল করবার দিকে ঢেলে দিলেন মনপ্রাণ। তাঁর মতো আরো কয়জন ছিলেন—তাঁরা দাঁড়ালেন পাশে। সাঁওতাল কুলীকামিনরা মাটি কেটে দেয়াল তুললো—তিনি নিজে শালপাতায় ঘর ছাইলেন। এমনি করে পত্তন হলো হাসপাতালের। এখন জনস্টোনগঞ্জ এক বর্ধিষ্ণু মিশনারী পত্তন। স্কুল আছে—শিক্ষাকেন্দ্র আছে—কারিগরী বিদ্যালয় আছে—আছে হাসপাতাল। সরকারের জমা নেওয়া শালবনের দরুণ ফরেষ্ট অফিসও এখানেই।

বাসবীর শরীরটা ডালপালায় আটকে বেধে গিয়েছিলো বাঁকের মুখে চড়ায়। বালির চড়ার উপর পড়েছিলো বাসবী।

স্থানীয় মেয়ে পুরুষে ধরে নেয়, কোনো মৃতদেহ হবে। সামনে এসে হাতে সোনার চুড়ি দেখে খুলে নেবার লোভে এগিয়ে আসে দু'তিনজন। কাছে এসে সবিস্ময়ে দেখে ক্ষতবিক্ষত সে নারীদেহে তখনও প্রাণের স্পন্দন আছে। ধীরে অতি ধীরে উঠছে নামছে বুক। দেখে তারা তুলে আনে বাসবীকে। ভদ্রলোকের মেয়ে—তাতে এমন করে আঘাত লেগেছে মুখে, কপালে, গলায়, হাতে—যে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাদের।

হাসপাতালে ডাক্তার নারায়ণ অবাক হয়ে যান। তাঁর সহকারীরা বলেন—ও লাস হয়ে-ই এসেছে। কতক্ষণ বাঁচবে ?

কিন্তু তাই বলে কেমন করে চুপ করে থাকবেন ডাক্তার নারায়ণ? নয় না-ই বাঁচবে—তা ব'লে তিনি চেষ্টা করবেন না ?

বাসবীকে বাঁচাতে গিয়ে দেখা যায় আঘাত শুধু বাইরে নয়, ভিতরেও লেগেছে। বুঝতে দেরী হয়না মাস দুইয়ের সম্ভাবিতা ছিল সে। বাইরের ক্ষত যদি বা সারলো। ভেতরে দাঁড়ায় সেপ্‌টিসিমিয়া। বিষিয়ে বিষিয়ে মরে যায় না কেন মেয়েটি—এই ভেবে অবাক হন ডাক্তার। অজ্ঞান দেহ, অচৈতন্য মন—তবু শরীরের ভেতর থেকে অদম্য প্রাণশক্তি দুর্জয় রোখে বাধা দিয়ে চলে মৃত্যুকে। আস্তে আস্তে ক্ষত শুকোতে থাকে' জ্বর বন্ধ হয়। একদিন মেয়েটি চোখ খোলে-ও।

এ পর্যন্ত-ই। তার পরেও কিছু জানতে চাইলে, কথা বললে—মুখ ঢেকে মেয়েটি শুধু বলে—না! না!

না! এই ছাড়া কোন কথা শোনেন না তার মুখে ডাক্তার নারায়ণ। যেন চেতন অবচেতন জুড়ে আতঙ্কের একটা করাল থাবা শুধু-ই এগিয়ে আসছে, আর সে শুধু ক্ষীণ কণ্ঠে দুর্বল হাতে বাধা দিয়ে চলেছে—না, না, না!

শুধু রোগ নয়। রোগিনীর বিষয়ে-ও আগ্রহ আছে ডাক্তার নারায়ণের। কে এই রোগিনী। কোথা থেকে এলো—কি এর ইতিহাস—সব জানতে ইচ্ছা করে।

আর নিজের ক্ষমতায় এখানে কতদিনই বা রাখতে পারবেন একে ? আরোগ্য লাভের পর ?—এ প্রশ্ন করে একদিন তাঁর সহকারী ডাক্তার ধমক খান। ডাক্তার নারায়ণ বলেন—যতদিন উনি আরোগ্য না হচ্ছেন—ততদিন কোন কথা-ই শুনব না আমি।

ডাক্তার নারায়ণ ডাক্তার রামানুজের সহকারী ছিলেন একদিন। খেয়ালী মানুষ। কারণে অকারণে মেজাজ খারাপ করেন। তাই তাঁকে আর চটাননা ডাক্তাররা।

বাসবী সেরে ওঠে। কিন্তু বিছানার সঙ্গে মিশে যায় যেন। ক্ষীণ

দেহ—চোখ বুঁজে থাকে ক্লান্তিতে—দেখে বুঝতে ভুল হয়ে যায় প্রাণ আছে কি নেই।

ডাক্তার নারায়ণ এবার নিজের জোর জানাতে স্বরু করেন। পাশে বসেন পেয়ালা নিয়ে। বলেন,

—অসুখ আপনার কিছু নেই। এই সুরুয়াটুকু খেলেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। শরীরে জোর চাই যে।

তাকিয়ে থাকে বাসবী তাঁর দিকে। তারপর বলে—দিন।

অবাধ্য সেই বিদ্রোহী ভাবটা কমেছে। এবার ডাক্তারের যত্নে আস্তে আস্তে জোর পায় বাসবী। মাথাটা তুলে বসে বালিশে হেলান দিয়ে। তারপর-ই শ্রান্তিতে বুঁজে আসে চোখ।

এইরকমই। বিনা প্রতিবাদে খায় পথ্য, ওষুধ। আর অন্যসময়টা চুপ করে থাকে। কারু সঙ্গে কথা কয় না। চেয়ে থাকে শুধু সামনের দিকে। একবোঝা চুলে জটা পড়ছে। যত্ন করে আঁচড়ে আঁচড়ে বেণী বেঁধে দেন নার্স। ডাক্তারের কথামতো হেসে কথা বলেন তার সঙ্গে। জবাব দেয়না বাসবী। চুলবাঁধা হলে শুধু বলে—ধন্যবাদ, নার্স।

আবার চুপ করে থাকে। কথা নেই তার। কোন কথা নেই। সব কথা মিটে গিয়েছে।

ডাক্তার নারায়ণ এবার জোর খাটান। বলেন—আমার ঘর অবধি হেঁটে আসুন আপনি। পারবেন।

মাথা ঘুরে যায়। অনভ্যস্ত পা টলমল করে। তবু হেটে যায় বাসবী। ডাক্তার নিজে তার ডানহাতটা ধরে আবার হাঁটিয়ে নিয়ে ঘরে বসান। বলেন,

—দেখুন না, কত কাগজ, কত বই, দেখতে ইচ্ছে করে না?

বসে থাকতে থাকতে এমনিই একদিন কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করে বাসবী। হঠাৎ পুরনো একখানা ইংরেজী কাগজ তুলে নেয় হাতে। চোখে পড়েছে তার ছবি।

তার ছবি? তার ছবি-ই তো! কাগজ কবেকার? কাগজ

তিনমাস আগেকার। বাসবী তালুকদারের স্মৃতিতে নিশীথ তালুকদার দশ হাজার টাকা দান করেছেন আসন্ন বিদেশ ভ্রমণের প্রাক্কালে। এই মহান চিত্তের পরিচয় পেয়ে কাগজের কর্তৃপক্ষ ধন্য ধন্য জানাচ্ছেন নিশীথ তালুকদারকে। মৃতা বাসবী তালুকদার স্বীয় স্বভাবগুণে জনপ্রিয়া, মধুর ভাষিনী, দয়াশীলা ছিলেন। কাগজ কর্তৃপক্ষ বাসবী তালুকদারের আত্মার শান্তি কামনা করে।

চেয়ে চেয়ে হরফগুলো নাচতে থাকে যেন। নাচতে থাকে আঙুল উঁচু করে। বলে—তুমি মরে গিয়েছ। তুমি আর নেই।

টলতে টলতে নিজের খাটে গিয়ে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে বাসবী। সব পরিচয়-ই যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন আর তার কোন্ প্রয়োজন রইলো? সে নেই। সে মরে গিয়েছে। অসিত ও জ্যোতিপ্রভার মেয়ে নেই—মালবীর দিদি নেই—আর নিশীথ? নিশীথের স্ত্রী বাসবী তালুকদার মরে গিয়েছে।

মরে গিয়েছে? তবে ভাল। বাসবীর মনে এতদিন কোন অনুভূতি, কোন চেতনা ছিল না—আজ প্রথম যেন একটা অনুভূতি, একটা সংকল্প মাথা তুলতে থাকে বাসবীর হৃদয় শ্মশানের ছাই থেকে। সে মরবে। বাসবী তালুকদার মরে যাবে। নিয়তির নির্দেশ দেখতে পাচ্ছে বাসবী। বাসবী নেই জেনে নিশীথ বড় নিশ্চিন্তে, বড় সুখে থাকুক। অন্য পরিচয় নিয়ে বাঁচবে বাসবী। তারপর—শক্তি সঞ্চয় করে—একদিন সে গিয়ে দাঁড়াবে। জগতের সামনে টেনে খুলে ফেলবে নিশীথের মুখোস।

নিদারুণ প্রতিজ্ঞার কথা। বাসবীর শূন্য হৃদয়ে গমগম করে—যেন শূন্য এক কক্ষে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কারু কণ্ঠ। বাসবী মনে মনে বলে—নিশীথ, আজ হতে আমি তোমার ছায়া হবো। অনুসরণ করবো তেমোয়। দিনে রাতে তোমার উপর প্রহরা রাখব। তারপর যত বিষ সঞ্চয় করেছি মনে। সব দিয়ে তোমাকে বেড়ে ফেলে কুকুরের মতো মারব। সেদিন কেউ তোমায় বাঁচাতে পারবে না।

সারাদিন খায়না বাসবী। ডাক্তারের সহস্র উপরোধে-ও নয়।

সন্ধ্যাবেলা মাথা তোলে। মুখ মোছে। ডাক্তার নারায়ণের ঘরে গিয়ে বসে। বলে—ডক্টর, আমার পরিচয় তুমি জানতে চেয়েছ বারবার—আজ বলছি আমার নাম এডিথ বিশ্বাস। আমার কেউ নেই—কোনো ঠিকানা নেই। ডাক্তার তুমি আমাকে প্রাণ দিয়েছো। সে প্রাণ আমি রাখব কি করে বল? ডাক্তার, তুমি আমাকে কাজ শেখাও।

কোনদিন-ও এত কথা বলেনি বাসবী। আজ তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকেন ডাক্তার। শীর্ণ দেহ, ক্ষতবিক্ষত মুখ, মানুষ নয়, যেন মানুষের ছায়া। তবু আত্মসম্ভ্রম, আভিজাত্য আর শিক্ষা-র একটা মিলিত ছাপ তাকে মর্য্যাদা দেয়। ডাক্তার বোঝেন, যে বাসবী পরিচয় এড়িয়ে গেল। বাসবী বোঝে, যে ডাক্তার বুঝলেন, সে মিথ্যা কথা বলছে—বুঝে-ও জিজ্ঞাসা করলো না তাকে কিছু।

কৃতজ্ঞ বোধ করে বাসবী। ডাক্তার কিছুক্ষণ ভেবে বলেন

—এখানে তো নার্সের কাজ—শিখবেন আপনি?

— পারব?

—পারবেন না? কেন? ব্যথা হলে হাত বুলিয়ে দিতে পারবেন না? জ্বর দেখতে পারবেন না? পথ্য দিতে পারবেন না? মেয়েদের পক্ষে এতবড় মহৎ কাজ আর কিছু আছে?

—তবে তা-ই করবো।

—এখনো নয়—আপনি আর একটু শক্ত হোন।

—আমাকে হাল্কা কাজ দিন আপনি। শরীর শক্ত এমনিতে-ই হবে।

ব্যাণ্ডেজ রোল করতে থাকে বাসবী। সামান্য কাজ। আঙুল চলে ধীরে ধীরে। তবু কাজ তো একটা।

নিজের হাতের দিকে চেয়ে থাকে বাসবী। বৃথা অশ্রু মার্জনা করেছে তার এই হাত। নিশীথের আক্রমণ ঠেকিয়েছে—আর কিছু করেনি।

এবার অক্ষমতা থেকে মুক্তি পাক হাত দুটো। সামান্য হলে-ও সামান্য কাজে-ই লাগুক। পরের জন্যে করুক এতটুকু।

জন্ম হোক এডিথ বিশ্বাসের। মরে যাক বাসবী তালুকদার। চলে যাক স্মৃতিভস্মের ওপারে।

মাথা তোলে এডিথ বিশ্বাস। বলে—কাল ওয়ার্ডনার্সের ঘরে আমি যাব ডক্টর ? দেখব তার কাজের চার্ট ?

—বেশ।

এডিথ বিশ্বাস বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। অজানিতে তার হাঁটা-ও বদলে গিয়েছে বুঝতে পারে না সে।

আজ আর কাঁপেনা পা দুখানা।

॥ ১০ ॥

মালবী যেমন বড় হয়ে উঠলো, বাসবীর সঙ্গে তার তফাৎ বোঝা গেল। মালবীর স্বভাবটা বহির্মুখী। গভীরতার অভাব নেই। তবে গভীরতা যা আছে তা মনের গহ্বরে। মনের ওপরটা যেন চঞ্চলচঞ্চল করছে সতত। সে খেলাধূলো ভালবাসে। বন্ধুদের সঙ্গে মিলে হৈ চৈ করতে তার ভারী ফুর্তি।

কিন্তু হাসিখুসির জীবন তার এখানে নয়। আলিপুরের বাড়ীর সীমানার বাইরে। কলেজের সকল উৎসব অনুষ্ঠানে সবাই মালবীকে চায়। তার মতো নাটক করতে কেউ পারে না। চট করে একটা একজিবিশান করতে গেলে প্রিন্সিপাল মালবীকে-ই ডেকে পাঠান। চ্যারিটি সো হলে স্টেজ থেকে নেমে এসে চাঁদার কৌটা হাতে দর্শকদের মধ্যে যদি মালবী ঘুরে বেড়াই তবেই ভরে ওঠে কৌটা। বন্ধুরা মালবীকে ঘিরে থাকে।

আলিপুরের বাড়ীতে পা দিলে-ই কেমন যেন চঞ্চল চরণ তার ধীর হয়ে আসে। আলিপুরের বাড়ী ঘেরা বড় বড় ঝাউ দেবদারু-র তলায় বাগানে অযত্নের ছাপ। নিচতলায় ঘরে ঘরে কাঁচের জানলা বন্ধ। যেন প্রাণ নেই বাড়ীটার কোথাও। দেওয়াল থেকে বাসবী চেয়ে থাকে শকুন্তলার বেশে। পাঁচবছর হয়ে গেল সে ঘটনার পর। শাড়ীর সবুজ রঙ ফিকে হয়ে এসেছে। বয়স হচ্ছে শকুন্তলার।

দিদিকে মালবী ছোটবেলায় ভালবাসতো অন্ধভাবে। দিদি ছাড়া সে কিছু জানত না। দিদির বিয়ে হয়ে যাবার পর দিনের পর দিন সে কেঁদেছে রাতে শুয়ে শুয়ে।

কিন্তু বিয়ের পরে দিদি কেমন যেন বদলে গেল। মালবীর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। সুদূর হয়ে গেল। মালবীর মনে তখন খুব অভিমান হতো, তারপর বয়সের স্ব-ধর্মে মালবী অন্য বন্ধুদের দিকে ঝুঁকে পড়লো। মালবীর বন্ধু হতে বেশীক্ষণ লাগেনা এই যা। স্কুলে

যখন যেতো' স্কুল বাসের ড্রাইভার থেকে সুরু করে দারোয়ান, মালী সবাই তাকে ভালবাসতো। বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে স্কুল বাগানের পেছনে মালী বৌ-য়ের কাছ থেকে আচার চেয়ে নিয়ে সে কমদিন খায়নি। রাখী পূর্ণিমার দিন, মালবীকে সবাই রাখী পরাতে আসতো। মালবী হাতখানা বাড়ীয়ে বলতো, বা রামসুকুল, তুমি আমাকে রাখী দিচ্ছ না? ড্রাইভার অমনই হেসে বের করতো চমৎকার রেশমী রাখী।

বাড়ী এসে মালবী বলতো—মা, ওরা সবাই আমায় রাখী পরিয়েছে। রামসুকুল, হরভজন, সবাই কি বলে জান? মালবী দিদি—তোমার কাছ থেকে শুধু বখ্‌শীষ নেব না। মিষ্টি খাওয়াতে হবে তোমাকে। নিশ্চয় নিশ্চয়। মা, ওদের জন্যে মিষ্টি ক'রে দেবে?

জ্যোতিপ্রভার সকল সখ সাধ যেন সেই একজন নিয়ে গিয়েছে। তিনি বিব্রত হয়ে পড়তেন। বলতেন—ডাক তো শঙ্করকে। বলে দিই।

মালবী অমনি বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। বলতো—বা, তা হবে না। আমি ওদের বলেছি মা খুব সুন্দর খাবার করতে পারেন। কেন মা, তুমি কেন বানিয়ে দেবে না?

নিশীথ এই সময় এসে মলেবীকে বোঝাতো। বলতো—চলো, আগে লিস্ট করি। কতজনকে খাওয়াতে চাও? এ সব কথা মা-কে বলো কেন? চলো যাই আমি আর তুমি। খেয়েছ কিছু?

মালবী নিশীথের পাশে বসে লিষ্ট তৈরী করতো। তারপর নিশীথ বেরুত মালবীকে নিয়ে গাড়ীতে। মজার মজার গল্প ক'রে মালবীকে হাসাতো। তু'জনে গিয়ে অর্ডার দিতো দ্বারিক ঘোষে।

ইস্কুলের বাস এলে মালবী চেঁচিয়ে বলতো—রামসুকুল, আমি গাড়ীতে যাব। তুমি চলে যাও।

পরে মালবীকে নিয়ে নিশীথ পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতো স্কুলে। লাল রেশমের থলি-তে খুচরো টাকা ভ'রে মালবীর হাতে দিয়ে বলতো—বকশীষ-ও দিও মালবী, ভুলে যেও না।

শঙ্কর বাস্কেটটা নিয়ে আসতো টিফিনরুমে। মালবী ভারী খুশী

হয়ে যেতো। শুধু কি মিষ্টি? কতরকম কেক, পেষ্ট্রি, স্যাণ্ডউইচ, মার্কেট থেকে কেনা আমের মোরব্বা, বড় বড় রসগোল্লা—শঙ্কর বলতো —এটা তোমার আর তোমার বন্ধুদের জন্যে। জানলে মালবী-দিদি?

সন্ধ্যেবেলা লাফাতে লাফাতে বাড়ী ঢুকে মালবী নিশীথের গলা ধরে ঝুলে পড়তো। —নিশীথদা—তুমি কি ভালো। তোমার মতো কেউ আমায় ভালোবাসেনা।

নিশীথদা না থাকলে মালবীর চলতো না। জ্যোতিপ্রভা ঠিক যে অক্ষম হয়ে পড়েছেন, তা নয়। তবে ধীরে ধীরে যেন অবসর গ্রহণ করেছেন। সংসারের খুঁটিনাটি-তে আর তেমন আনন্দ পান না। একজন যেন তাঁর সকল আনন্দ নিয়ে চলে গিয়েছে। মালবী তাঁর কাছে সঙ্গ চায়, দাবী করে, জেদ করে। মালবী ত' তার মতো নয়। একটা আবদার না রাখলে—তুমি আমায় ভালবাস না—বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে বসে।

অসিত বিব্রত হয়ে এসে পড়েন। বলেন—বড় হচ্ছিস আর ক্ষ্যাপামি বাড়ছে। কি দরকার আমায় বলতে পারিস না?

—না, তোমরা সবাই একদলে।

বলে রেগে চলে গেল মালবী। মাকে বলে যায়—তোমার অসুখ না হাতী—আমার সঙ্গে বেরুতে, বেড়াতে তোমার ভালো লাগেনা তা-ই বলো। ঠিক আছে, আমি-ও দেখো কি করি।

—কি করবি?

—তোমাদের কাছে থাকব না। সুমিতার মা আমায় কত ভাল-বাসেন। ওদের বাড়ী গিয়ে থাকব।

নিশীথ এসে মালবীকে ডেকে নিয়ে যায়। বলে—জন্মদিনের কার্ড নিয়ে আসি চলো।

বাইরে এসে-ও মালবীর অভিমানে ফোলা ঠোঁট যায় না। রেগে বসে থাকে সে। নিশীথ-ও চালাক কম নয়। চট করে ঢুকে পড়ে লাইট হাউসে। দেখিয়ে দেয় রবিনহুডের ছবি। ফেরবার সময়ে আইসক্রীম খাওয়ায়। বলে—আরো খাও, যতগুলো ইচ্ছে খাও।

দাঁতগুলো তো থাকবেনা মালবী। দাঁতগুলো তো তুলে ফেলতে হবে! সব তো পোকা পড়ে গিয়েছে। যত খুসী খাও। তারপর জন্মদিনের আগে সবগুলো দাঁত তুলিয়ে এখান থেকে ছবি তুলে নিয়ে যাবো।

মালবী তখন খুব কৃতজ্ঞ। তখন আর কিছু মনে থাকে না। কিন্তু রাতে শুয়ে বাবা গো! মা গো! দাঁত ব্যথা করে মালবীর। নিশীথ-ই হাসতে হাসতে উঠে এসে ওষুধ লাগিয়ে দেয় যত্ন করে। বলে—হল তো? শেষের পাইন এ্যাপ্‌ল-টা না খেলেই হতো না?

—তুমি তো দিলে।

—বাঃ! দিলেই খেতে হবে? এখন ব্যাথা করছে কার?

রেগে গিয়ে মালবী বলে—যাও, তুমি-ও ওদের দলে!

সত্যি জন্মদিনের আগে দাঁত তুলে মালবী ফোকলা হয়ে যায়। নিশীথ কম যায় না। সে মেট্রো থেকে সব ভাড়া করে এনে নিচের ঘরে সিনেমা দেখায় মালবীর বন্ধুদের। ঘরে ঘরে বেলুন টাঙিয়ে দেয়। জাপানী লণ্ঠন থেকে লালনীল কাগজের ল্যাজ ঝোলে। সমস্ত বাড়ীটা যেন কলকণ্ঠের হাসি গানে মুখর হয়ে থাকে।

জ্যোতিপ্রভা কেন এইসব আনন্দে আহ্লাদে মিশে যেতে পারেন না? কেন মনে হয়, এই সব সে ভালবাসতো। যার কাছে গিয়ে বললে এমন দিনে, সে সুখী হতো—সে আর কোন দিন-ও আসবে না। শরীর অসুস্থতার অজুহাতে চলে যান জ্যোতিপ্রভা ওপরে। শঙ্করকে বলেন ঘরের বাতি নিভিয়ে দিতে।

নিশীথ কিন্তু ভোলেনা। বাগান থেকে রাশি রাশি ফুল আনে। বাসবীর ছবিগুলির সামনে ফুলদানীতে রাখে। এমন দিনে শকুন্তলার ছবি-তে মালা দোলে। শাদা জুঁইফুলের গোড়ে মালা থেকে বাসবীর মুখখানি চেয়ে থাকে। ধূপের গন্ধ ভরে রাখে ছবির আশপাশের বাতাস।

উৎসবের সকল হৈ চৈ মিটে গেলে, সবাই চলেগেলে পরে মালবী পোষাক না বদলেই ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত হয়ে। মা-র খাটের পাশে

তার আলাদা খাট। ঘুমন্ত মালবীর পা থেকে জুতো খুলে নেয় নিশীথ। চুল থেকে ফিতে খুলে নেয়। হাতটা সোজা করে দেয়।

জ্যোতিপ্রভা বলেন—ওকে আদর দিয়ে দিয়ে নষ্ট করছো নিশীথ।

—আদর করবারই জিনিষ যে মা! ও কি করেছে বলুন?

মালবী উপুর হয়ে ঘুমোয়। মাথা ডানপাশে হেলানো। দেখে দেখে কেন বাসবীর কথাই মনে পড়ে? সে-ও এমনই দেখতে ছিলো এই বয়সে—সে-ও এমনি করেই ঘুমোত। সে ছিল ভীরু, সহজে ভয় পেত। এই বয়সে-ও সে বলতো·· মা, তুমি কিন্তু ছোট আলোটা জ্বেলে রেখো। আমার বড় ভয় করে মা—ঘুম ভেঙে গেলে।

ভয় কাতুরে ছিল সে সবচেয়ে

সে-ই খুলেছে আঁধার ঘরের চাবি?—কোথায় গেল তাঁর সেই ভীরু মেয়ে? সেখপুরা যাবার আগের দিন-ও যে এসে তাঁকে জড়িয়ে কোলে মাথা রেখে বসেছিলো! মালবীকে জড়িয়ে কাঁদছিলো। বারবার বলছিলো--মা, সেখানে তুমি নেই। আমার কিন্তু ভীষণ মন খারাপ করবে। তুমি কিন্তু আমাকে প্রতি হপ্তায় চিঠি লিখো। ভুলবে না।

মায়ের শূন্য হৃদয় কেমন করে ভরবে? বুকের ভেতরটা হু হু করে। জ্যোতিপ্রভা জানেন, সে শূন্য আর কোনদিন-ও ভরবেনা। কত ভাবতে চেষ্টা করেছেন—কত শান্তি স্বাস্ত্যয়ন করেছেন তিনি—বাসবী যেন তৃপ্তি পায়—শান্তি পায়। অপঘাতে মৃত্যুর অভিশাপ মাথায় নিয়ে সে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় না। কিন্তু তিনি যে জীবিত। জীবিত-কে শান্তি দেবার বিধান কোন শাস্ত্রে আছে?

বুকের ভেতরটা ব্যথা করে। জ্যোতিপ্রভা জানেন, এ ব্যথা তাঁর কোনদিন-ও সারবেনা। উঠে বসেন তিনি—ওষুধ খান। জল খান।

তাঁর ঘর থেকে নিশীথের ঘর চোখে পড়ে। স্পষ্ট দেখতে পান ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে নিশীথ। চেয়ে আছে সামনের দিকে। দেওয়ালে বাসবীর ছবি। নিশীথের হাতে পুড়ে যাচ্ছে সিগ্যারেট

তাঁর সাড়া পেয়ে নিশীথ-ও উঠে আসে। বলে—এ কি মা। আপনি ঘুমোননি? শরীর খারাপ লাগছে?

—কেমন যেন অস্থির লাগছে নিশীথ।

আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি মাথায়।

জ্যোতিপ্রভার মাথাটা ঈষৎ তুলে বালিসে হেলান দিয়ে দেয় নিশীথ। মাথাটায় হাত বুলিয়ে দেয়। আরাম বোধ করেন যেন জ্যোতিপ্রভা। বলেন—নিশীথ, রাত যে অনেক হলো বাবা, ঘুমোতে যাবেনা?

—এই তো, এবার যাব।

জ্যোতিপ্রভা বোঝেন, নিশীথের ঘুম আসছে না কেন। একই দুঃখের রাখীতে যে তাঁর আর নিশীথের হৃদয় বাঁধা। বলেন--রাত ক'রোনা আর। তুমি অসুস্থ হলে কি হবে বল তো?

—এই যে, যাই!

তারপর নিশীথ হঠাৎ বলে বসে—মা, লক্ষ্য করেছেন, মালবী কেমন তার-ই মতো দেখতে হয়ে উঠছে, তাই না?

—এই বয়সে যেন সেটা বেশী বোঝা যাচ্ছে। ছোটবেলায় তেমন বোঝা যেত না।

আন্তরিক ভালবাসা ও অনুরাগ, এই দিয়েই তো জ্যোতিপ্রভার মন জয় করেছে নিশীথ। জ্যোতিপ্রভা কিছুক্ষণ বাদে বলেন,

—নিশীথ, বেহালায় সেই স্বামীজি এসেছেন। তাঁর খোঁজ করবে বলেছিলে?

— যাব, কালই যাব।

ঘরে চলে যায় নিশীথ। চেয়ে থাকে বাসবীর ছবিখানার দিকে। এক ধরণের অহেতুক আতঙ্ক মাঝে মাঝে তার, নিশীথ তালুকদারের-ও মাথায় বাসা বাঁধে। যেমন মনে হয়, বাসবীর ঐ ছবিটা যেন যে কোন সময়ে জ্যান্ত হয়ে নেমে আসবে। চোখের পাতা নড়ে উঠবে—আর ঐ হাত দুখানা নেমে আসবে তার গলার ওপর।

রাতকে তাই ভয় করে নিশীথ। রাতে ঘরে বাতি জ্বেলে রাখে।

যে রাত্তে আতঙ্ক-টা বেশী হয়, সে রাতে ঘুমোয় না নিশীথ। বসে থাকে চেয়ারে। বসে থাকে বাসবীর মুখোমুখি। মুখোমুখি বসে থাকা যায়, কিন্তু পেছু ফিরতে নিশীথের আপত্তি। ভয়টা তাহ'লে নিরবয়ব একটা ভীষণ রূপ নেয়।

মাথাটা টনটন করে যখন, তখন ড্রয়ার টেনে ধরে উরুতে ছুঁচ বিঁধিয়ে একটা ইন্‌জেকশান নিয়ে নেয় নিশীথ।

ঘুম নামে। ঘুম নামে বৃহৎ একটা জালের ফাঁক দিয়ে আলো পড়লে যেমন দেখায়, তেমনি বিচিত্র নকশা কাটা ছাঁদে। একটা জাল যেন নামছে তার-ই দিকে। তাকে ঢেকে ফেলতে কি? না তো! জালটা যে তার-ই ফেলা। উন্মুক্ত সমুদ্রে দুঃসাহসী ধীবরের মতো অনেক দূরে ছড়িয়ে জাল ফেলেছে নিশীথ। তারই ফেলা জাল এখন গুটিয়ে আসছে। নিশীথ জানে তার ছোড়া জাল চিরদিনই তার পায়ে সাগর সেঁচে রত্ন এনে দেয়। সে জানে, এবার এই শেষ বারে-ও তার ব্যতিক্রম হবে না।

জ্যোতিপ্রভাকে আর অসিত-কে নিয়ে শুধু কি এক জায়গায়? কত জায়গাতে-ই যে ঘুরলো নিশীথ। নিশীথ আর নিশীথ। বছরের পর বছর কাটলো—নিশীথ হয়ে উঠলো মৈত্র পরিবারের প্রাণ। অসিত স্বীকার করতে বাধ্য হন, যে বাসবী না মরলে নিশীথকে তিনি চিনতে পারতেন না। তাঁর-ই বাড়ীর ছেলে নিশীথ—কিন্তু তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করে মাসে একটি টাকা-ও নেয় না। স্পেকুল্যেশনের নির্দোষ খেলায় মাঝে মাঝে কিছু টাকা পায়। তাতেই চলে যায় তার। পৃথিবীর সকল প্রয়োজন বড় কমিয়ে ফেলেছে নিশীথ। মদ সে কোনদিন-ও খায় না। সিগারেট, সেও কালে ভদ্রে। জামাকাপড়ে নেহাৎ মোটা চাল। শাদা পাজামা, গেঞ্জীর ওপর হাতকাটা পাঞ্জাবী, বা ফতুয়া। তা-ও জ্যোতিপ্রভা ক'রে দিলে-ই সে খুশী হয়। বলে—মা-র হাতে তৈরী জামা—এ যেন আশীর্বাদ। আমাকে যেন সর্বদা ঘিরে থাকে—জানলেন মা?

সে নিশীথকে আর চেনা যায় না। ছাটা চুল। শাদা পাজামা ফতুয়া পরনে। পায়ে পাতলা চটি। সংসারটা দেখাশোনা সে-ই করে। অসিতকে মাসে মাসে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। রক্তচাপ বাড়লো কি কমলো, ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না—খাবারটা বদলে দিয়ে দেখলে হয়—এই সব কাজ-ই তার। কোনদিন কি রান্না হবে, বাড়ীতে কোথায় সারানো মেরামতির কাজ আছে—বাগানটা পড়ে আছে অযত্নে—সেটাতে নতুন করে গাছপালা লাগানো দরকার —নিশীথ ছাড়া কে এ সব দেখে ?

মালবী বড় হচ্ছে। তার হাজার রকম দরকার। গরম জামা কাপড় ধুইয়ে আনতে হবে—সিল্কের শাড়ীগুলো লিণ্ডসে স্ট্রীট থেকে কাচানো দরকার—কলেজের বন্ধুরা খেলতে আসবে, ব্যাডমিণ্টন কোর্ট কাটিয়ে নিলেই হয় ? তার-ও নিশীথকে ছাড়া চলে না।

নিশীথের নিজের টাকা যা কিছু, তা-ও ঐ মালবী আর জ্যোতিপ্রভার জন্যেই খরচ হয়। জ্যোতিপ্রভার জন্যে নতুন কাশ্মীরি শাল কিনে আনে শীতে। মালবীর জন্যে নতুন শাড়ী, ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস র‍্যাকেট—ড্রাইভিং শেখায় নিশীথ মালবীকে স্টিয়ারিং-এ হাত পড়বার অনেক আগেই। চওড়া ঘড়ি কিনে এনে কব্‌জিতে বেঁধে দেয়। বলে—দেখবে কি করে চালাতে চালাতে ? তোমার ঘড়িটাতো একটা গহনা।

অসিত আর জ্যোতিপ্রভা নিশীথের এই সমস্ত সেবা, সমস্ত যত্ন, প্রতিবাদ করে আর ঋণের বোঝা ভারী করেন না। মনে মনে ভাবেন —মেয়েকে হারিয়ে ছেলে পেয়েছি। নিজের ছেলে হলে কি এমনটি করতো ?

আলিপুরের উঁচু পাঁচিল দেওয়া বাড়ীটায় এক অদ্ভুত জীবন যাত্রা চলে। অসিত ও জ্যোতিপ্রভা, নিশীথ ও মালবী—চারজনে যেন চারজনের পরিপূরক তারা। চারজনের কথা চারজনের মনে আবহ-সঙ্গীতের এক পরভূমিতে নিরন্তর বেজে চলেছে—সেই বাসবী-ই তার ছায়া দিয়ে এদের চারজনকে বেঁধে রেখেছে।

বাইরের লোকে এদের বুঝতে পারে না। মালবী ছাড়া আর কারু বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ নেই। মালবীর অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে কেউ-ই নেই। অথচ সকলের সঙ্গে-ই তার সাবলীল ও সহজ সখ্যতা।

পূর্ণ উনিশে মালবীও সুন্দর হয়ে উঠেছে। তবে মালবীর মধ্যে বাসবীর সে পেলব কোমলতা নেই। বাসবী ছিলো সুকুমার—বড় লাজুক ও ভীরু ছিলো ব্যক্তিত্ব। মালবী স্বীয় ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধির দীপ্তিতে আপনি সমুজ্জ্বল। যেন প্রস্ফুট এক সূর্যমুখী। নিঃসঙ্কোচে সূর্য্য থেকে তেজ আহরণ করে সে দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

মালবীর বাড়ী সম্পর্কে অসীম কৌতূহল তার বন্ধুদের। এক স্কুলে কলেজে পড়লে—একই সমাজে মিশলে যেমন হয়—মালবীর দিদির যারা বন্ধু ছিলো—তাদের ছোট বোনরা-ই মালবীর বন্ধু। চিত্রিতার বোন বিচিত্রা আর রুবিমল্লিকের ছোট বোন করবী তার বহুদিনের বন্ধু। বিচিত্রার বাড়ীতেই সন্ধ্যার এক আসরে সাংবাদিক রজতের সঙ্গে মালবীর পরিচয় হয়। প্রথম দিন সবাই কথা কইছিলো —কিন্তু মালবী একমনে টেবিল টেনিস খেলছিলো পাশের ঘরে। রজত হলো তার প্রতিদ্বন্দ্বী। বিচিত্রা ঠাট্টা করে বললো—রজত খুব সাবধান। টেবিল-টেনিসে যদি বা হারাতে পারো ওকে—তর্কে কিন্তু পারবে না। আমাদের কোনো গুণ নেই মালবীর কিন্তু অনেক গুণ। ও হচ্ছে আমাদের সকলের হয়ে একটা জবাব।

মালবী বলেছিলো—বিচিত্রা, বাজে কথা বলিস্ না।

—তুই কাজের কথা বল্।

টেবিল টেনিসের সে খেলায় কেউ হারলোনা বা জিতলোনা—তবে পরিচয় পৌঁছলো আলাপে।

তর্ক সুরু হলো পলিটিক্‌স থেকে সাহিত্য নিয়ে। যুদ্ধের আগে ছিলো এদের সমাজ উগ্র বিলিতিয়ানা। সাহেবরা চলে যাবার আগে এদের মনোগগনে শেষরাগে রঙিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের পরে দেশভাগ আর স্বাধীনতার প্রভাবে এখন এইসব সমাজে স্বদেশপ্রীতি

বড় উগ্র। মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ী মেয়েদের অঙ্গে। বাকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া, আর বিষ্ণুপুরের পেতলের কুনকে সবে ঘরসাজানোর উপকরণের মর্যাদা পাচ্ছে। কথা হয় কুটির শিল্প নিয়ে। মালবী বারবার বলে—আমাদের একটা মস্তো উত্তরাধিকার নেই? আপনাদের উচিত—এইসব গ্রাম আর গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। অর্থাৎ আমি বলছি—কাগজে শুধু কলম ভরালেই হবে না—দেশ আর দেশবাসীর সম্পর্কে অনেক খবর জানতে চাই আমরা।

রজত বলে—আপনার সাবজেক্ট কি?

মালবী হাসে। বলে—নেহাৎ-ই গন্ত। ইকনমিক্স নিয়ে বি. এ. পড়ছি।

মালবী চলে গেলে পরে রজত জিজ্ঞাসা করে বিচিত্রার দাদা বিনায়ক-কে। বলে—কে মহিলা? বেশ বুদ্ধি রাখেন।

বিনায়ক হেসে বলে—জার্ণালিস্ট, ওদিকে তাকিও না। অসিত মৈত্রের মেয়ে। একমাত্র সন্তান এখন। সে এক রহস্যপুরী। বাড়ী তো নয়, সেকালের দুর্গ একটা। কি যে ব্যাপার কেউ জানে না। আসলে কি জানো? মালবীর দিদি যাকে বিয়ে করেছিলো, লোকটা একটা ব্রুট। নিশীথ তালুকদার-কে বিয়ে করে ওর দিদির জীবনটা যাকে বলে frustrated, তা-ই হয়েছিলো। তারপর বাসবী তালুকদার মারা গেলেন এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায়। তারপর থেকে ওদের বাড়ীটা-ই বদলে গিয়েছে। মালবী-ও বাইরে যতই হাসিখুসী হোক, ভেতর থেকে সে ট্রাজেডির ছায়া ভুলতে পারে না। আর নিশীথ তালুকদার—

—তাঁর কথা কি বলছো?

বিনায়ক চতুর ভাবে হাসে। বলে—সে-ই তো এখন ও বাড়ীর সব। সে ছাড়া ও বাড়ীর কোনো কিছু হবার উপায় নেই। মৈত্র তার হাতে পুতুল।

বিচিত্রা বলে—দাদা, শুধু খারাপ দিকটা-ই ব'লোনা। নিশীথ তালুকদার স্ত্রী মারা যাবার পর একেবারে বদলে যায়নি?

—জানি না। এলীদি-র কথা ভাব!

—সে কথা থাক না?

—না না বিচিত্রা, আমি বলতে চায়—তোমরা অর্থাৎ মেয়েরা বড্ড সেন্টিমেণ্টাল—বড্ড ভাবপ্রবণ! নিশীথ তালুকদার বদলে গিয়েছে? হবে-ও বা। আমি কিন্তু অমন সহজ সরল কথা বিশ্বাস করতে পারিনা। একটা লোক চল্লিশ বছর বয়সে বদলে যেতে পারে? কেমন করে?

—কেন এত কথা বলছো দাদা? রজত কি তাদের জানে? না বুঝতে পারবে তোমার কথা? আসলে একটা কথা দাদা সত্যিই বলেছে রজত। নিশীথ তালুকদার ও বাড়ীতে-ই থাকে। মালবীর ওপর তার ইনফ্লুয়েন্স কম নয়।

—মলবীর জন্যেই দুঃখ হয়। অমন আগুনের মতো মেয়ে।

—বেশী বলছো দাদা!

—ঠিকই বলছি? রজত, মালবীর মতো মেয়ে খুব বেশী হয় না। তবে ছোটবেলা থেকে ঐ একটা ট্যাজেডির চড়া আবহাওয়ায় বাস করে করে তার মনটাও কঠিন হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে মেশা চলে—ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। সেখানে ঐ নিশীথ তালুকদারই কেমন করে যেন বাধা দিচ্ছে। দাঁড়াও, গলা ভেজাবার বন্দোবস্ত করি রজত।

বিনায়ক উঠে গেলে পরে বিচিত্রা বলে—কি জানো, দাদার মালবীর সম্পর্কে একটা দুর্বলতা আছে। মালবী সেটা বুঝলো না। দাদা তাই দুঃখ পায় মালবীর কথা উঠলে। চলো রজত, বারান্দায় বসি।

বারান্দায় বসে বিচত্রার অনেক কথাবার্তা শুনতে শুনতে রজতের মালবীর কথা মনে হয়। বেশ মেয়েটি। বেশ একটা সংস্কৃতির ছাপ আছে। তবে বিনায়ক-কে যে প্রশ্রয় দেয়নি মালবী, সে বোধ হয় তার রুচিতে বেধেছিলো বলে। বিনায়কদের বাড়ীর যা আবহাওয়া দেখছে সে—এরা নিরবছিন্ন একটা ফুর্তির হুল্লোড়-ই ভালবাসে। বিনায়ক-রা যুদ্ধের শেষ মৌশুমে কেমন করে যেন চালাক হয়ে বেশ কিছু পয়সা রোজগার করে নিয়েছে। বিনায়ক রঙীন ছাপের বুশসার্ট আর রঙীন

কর্ডের ট্রাউজার পরে। ছাঁটাচুল, ফর্সা রঙ, মোটা মানুষ। সে আর বিচিত্রা সকাল থেকে হুল্লোড়ে মেতে থাকে বেশী। চুপচাপ থাকতে যেন একমুহূর্ত-ও পারে না। আর কিছু না হোক তো চৌরঙ্গীতে বসে আছে কোন সরাইখানায়। Juke box-এ পয়সা ফেলছে আর গান শুনছে। বিচিত্রা সারাদিন এত কথা বলে অনর্গল, যে কোনো কথাটা-ই বিশেষ হয়ে উঠতে পারে না। আর, এদের সমাজটা এখন নতুন করে দেশী হবার সাধনায় আত্মহারা। সব কিছু-ই চড়া চড়া বিশেষণে ভূষিত। লাভ্‌লি কালীঘাটের পট—অপূর্ব ঢাকাই শাড়ী-ও, সাঁওতাল-দের এ বেতের ঝুড়ি কি চমৎকার—দেখেছো? আমার আসল বিষ্ণু-পুরী পাটি-টা দেখেছো? দেওয়ালে কি মানিয়েছে?—আমার নতুন তাঁতের শাড়ীটা? ও, লাভলি! খাঁটি ফরাসডাঙা, জানো রজত?

এই হলো এদের সমাজের বুলি। যেন রঙীন একঝাঁক পাখী হঠাৎ নতুন দেশের নতুন বাগানে গিয়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে। বিচিত্রা আর তার বন্ধু নিলীতারা সারাদিন দোকানে ঘুরছে। বলে—কি এ্যাড্‌ভেঞ্চার করলাম জানো না? দুইজনে গিয়েছিলাম একটা আশ্চর্য জায়গায়, ও, মৌলালী!

মৌলালী—এমন করে উচ্চারণ করে যেন ফ্রান্স বা ইটালীর কোনো অপরিচিত গ্রামের নাম বলছে। বলে—মৌলালীতে—ও, রজত! কি লাভ্‌লি সব রুপোর গয়না দশটাকাতে-ই দিতো তবে আমি কুড়িটাকা দিয়েছি। বলে, দেশের একটা শিল্প, ঠিক করিনি? আর এই পুতুল।

কেস্টনগরের পুতুলের অক্ষম অনুকরণে ছাঁচে ফেলা গয়লানী বা মাথানাড়া বুড়ো কিনে আনে এরা পাঁজা পাঁজা। সারাদিন কথা—হৈ-চৈ—একটার পর আর একটা আনন্দের পেছনে ছুটে চলা। চলো শিশির ভাদুড়ীর থিয়েটার দেখি—ও, গ্রেট অ্যাক্টর! জলসা হচ্ছে—ভিলায়েৎ খাঁ-র সেতার হচ্ছে—আর্ট একজিবিশানে যাচ্ছ না? চলো, প্লাজ! কমল সাইনালের ছবি, ওঃ অপূর্ব!

দেখে দেখে রজতের মনে হয়, যেন এদের নিজের ঘরে কিছু নেই।

এরা নিজেরা আনন্দ করে বাঁচতে জানে না। এরা জানে শুধু একটার পর একটা আনন্দের উপকরণ এনে ঘর বোঝাই করতে।

মালবী মৈত্র! চুল টান করে তুলে খোঁপা বাঁধা। তাঁতের শাড়ী, রঙীন জামার সাদা রুচিসম্মত পোষাক। একহাতে একটা কঙ্কন—একহাতে ঘড়ি। দুইকানে দুটো হীরে। হীরের চমক বেশী না মালবীর চোখ বেশী দীপ্ত? ভেবে পায় না রজত।

বাড়ী ফিরে মালবী খাবার টেবিলে নিশীথকে বলে—কাল থেকে নিচের ড্রয়িং রুম-টা খুলিয়ে দাও নিশীথদা। বন্ধুবান্ধবদের মাঝে মাঝে বাড়ীতে-ও ডাকা উচিত। তাই নয় কি?

অসিত বলেন -তোমার জন্মদিন উপলক্ষে-ই হোক ব্যাপারটা।

—জন্মদিন তো পরে। তার আগে একটু খেলার ব্যবস্থা করতে চাই। তুমি জানোনা বাবা, আমাকে ওরা এত ডাকে—এত নেমন্তন্ন নিয়ে বেড়াই আমি—আমার তো প্রতিদান দেওয়া দরকার মাঝে মাঝে?

নিজের ঘরে এসে মালবী চুপ করে ভাবে চিবুকে হাত রেখে। সে-ই হয় তো বাড়ীর এই আবহাওয়ায় তরঙ্গ আনছে একটা। কি করবে সে! দিদি, তার দিদি বাসবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন এ বাড়ীর সকল আমোদ আহ্লাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো। যা উচিত তা সব সময় কি করতে পারে মানুষ?

মালবীর তার্কিক মন অমনিই নিজের সঙ্গে-ই যুক্তির লড়াই সুরু করে। দিদিকে সে কি ভালবাসে না? দিদির সম্পর্কে মালবীর মনোভাব কি এ বাড়ীতে কেউ জানে না? এক নিশীথদা' হয়তো বুঝতে পারে। নিশীথদা-র কথা আলাদা। নিশীথদা-র সঙ্গে কি সকলের তুলনা হয়? নিশীথদা একটা ব্যতিক্রম। সে অনেকের ওপরে। নিশীথদা' তাকে বুঝতে পারে।

খাবার টেবিলে সে যে কথাটা বললো—তাতে অমনই বাবা মা-র চোখমুখে যেন কি রকম ভাব ফুটে উঠলো। তাঁরা যেন মনে করলো, অন্ততঃ তা-ই মনে হলো মালবীর। যে এতদিন যে জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা, তার মধ্যে বিক্ষোভ আনছে মালবী। তাঁদের চারজনে

নিজেদের মধ্যেই সম্পূর্ণ ছিলেন। মালবী তার মধ্যে নতুন মানুষ আনতে চায়। এ বাড়ীতে বাসবীর ছবি সাজানো ঘরের পর ঘরে—এ বাড়ীর মানুষদের মনে—মৃতা একটি মেয়ের স্মৃতি যেন পুঞ্জে পুঞ্জে ঘন হয়ে আছে। মালবী যেন তাকে উপেক্ষা করে বন্ধ ঘরের জানলা খুলে দিতে চাইছে!

ঠিক তা নয়। মালবীকে বোধহয় তার বাবা মা বুঝতে পারেন না। মালবী-ও তো মানুষ। স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে সে-ও ত বাঁচতে চায়। দিদির প্রতি ভালবাসায় তার মন প্রাণ বাঁধা। কিন্তু মাঝে মাঝে সে-ও বিরতি চায়। এতটুকু সূর্যের আলো না পেলে, শুধু মাটি আঁকড়ে, অন্ধকারে শিকড় চালিয়ে কি গাছ বাঁচতে পারে?

তার দিদির কথা মনে পড়ে মালবীর। জানলায় বসে গরাদে মাথা রেখে চেয়ে থাকে আঁধারের দিকে। দিদি তার জীবনে কি ছিল, কেমন করে বোঝাবে সে? চৌদ্দ বছরের বড়—দিদি ছিলো তার মা-র পরিপূরক। মা-র সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ এতই বেশী ছিলো, যে মা-র সঙ্গে সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠ হয়নি। তা ছাড়া, তার জন্মের পর উপর্যুপরি দুটি সন্তানের শোক পেয়ে জ্যোতিপ্রভা অসহ্য হয়ে পড়েন। মালবীকে রাখা হয়েছিলো নার্সের তত্বাবধানে।

কিন্তু মায়ের হয়ে স্নেহসুধাভরা দুখানি হাতে তুলে নিল কে তাকে? দিদি-ই তো। দিদি তার সহস্র আবদার সহ্য করেছে—মার খেয়েছে তার হাতে—তার দোষ ঢেকে ঢেকে নিজে বকুনি খেয়েছে মার কাছে। বকুনি খেলেই দিদির মুখখানা কেমন হয়ে যেত। চোখ ভরে যেত জলে, কিন্তু চোখ ছাপিয়ে পড়তোনা। ঠোঁট কাঁপতো, আর চেয়ে থাকতো দিদি মুখের দিকে। তবে বাবা বলতেন—বাসবীকে কেমন করে বক, জ্যোতি? অমন মুখখানি দেখলে মায়া হয় না?

মালবী যে বাসবীর প্রাণ ছিলো। কোথায় কোন নতুন ঢঙের জামা উঠলো—অমনই দিদি সেটি মা-কে বলে করিয়ে দিলো মালবীকে। মালবীর জ্বর হলো, তো বাসবীর স্কুলে কলেজে যাওয়া বন্ধ হলো। মালবীর টনসিল ছিলো বলে আইসক্রীম খেতে মানা ছিলো। মালবীর

বেশ মনে আছে দিদি-ও ছেড়ে দিলো আইসক্রিম। টনসিল অপারেশান হলে পরে মালবীকে চামচ করে আইসক্রিম গালিয়ে কে খাইয়েছিলো? সে-ও দিদি।

বিয়ের পর যেন দিদি কেমন দূরে চলে গিয়েছিলো—মা বাবা তা-ই বলতেন। মালবী ছোট, সে প্রতিবাদ করেনি—কিন্তু সে অন্তরে অন্তরে কেমন করে যেন বুঝেছিলো তার দিদি বড় দুঃখী। নিশীথদা-র মতো মানুষকে বিয়ে করে তবু তার দিদি দুঃখী কেমন করে হলো? আজ-ও বুঝে পায়না মালবী।

মাঝের বছর ক-টা বাদ দিয়ে আজ বড় হয়ে—যেন সে তার দিদিকে নতুন করে জানতে পারছে। দিদি ছিলো অন্যরকম। মালবীর যেন মনে হয় তার দিদি ছিলো জ্যোৎস্না দিয়ে গড়া। অমনই পাণ্ডুর, পেলব সুন্দর। অমনই অপার্থিব। তাই জ্যোৎস্নার মতোই মিলিয়ে চলে গেল।

নিশীথদা'কে-ও যেন নতুন করে জানছে মালবী। কি গভীর প্রেম তার দিদির জন্য। তার সঙ্গে তো মনের সবকথা-ই বলেন নিশীথদা। বলেন—জানো মালবী, সেখপুরা থেকে আসবার আগে তোমার দিদি যে কি সুন্দর দেখতে হয়েছিলো। কি সুন্দর সেরেছিলো শরীরটা—কেমন হাসিখুসী হয়েছিলো। অবশ্য বন্ধঘর—বন্ধদরজা—মানে বন্ধ আছে সে কোথাও এই মনে হলে-ই চেঁচিয়ে উঠতো। তবে সেটা যে অমন সাংঘাতিক হবে······

গলাটা যেন হারিয়ে যায় নিশীথদা-র। আস্তে বলেন—আমি বুঝতে পারিনি মালবী। আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি···

চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে নিশীথদা-র আজ-ও! বলেন—কম চেষ্টা তো করিনি মালবী! থিওসফিক্যান রিসার্চ সোসাইটি-তে গিয়েছি—বসে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিছু বলতে পারেননি তাঁরা। তুমি বল মালবী, এমন করে নিঃশেষ হয়ে গেল তোমার দিদি কি করে? সে যে আমাকে বড্ড ভালবাসতো—তুমি ত' জাননা মালবী, কলকাতায় আসবে বলে সে কি আনন্দ তার···।

আবার জল গড়িয়ে পড়ে চোখের কোলে। মালবী বলে—সে কথা থাক নিশীথদা'! তুমি অমন করে কষ্ট পেওনা। আমি সহ্য করতে পারি না।

মালবীর কাছে নিজেকে উজাড় করে দিতে না পারলে নিশীথ বাঁচে না। সে বলে চলে—দিনের পর দিন চলে যায়—দেখতে দেখতে সাতটা বছর তো গেল প্রায়—রোজই ভাবি—বুকের জ্বালাটা এবার কমবে। আর সহ্য করতে হবে না। কই, জ্বালা তো এতটুকু জুড়োয় না মালবী! জানো? সেইজন্যে, শুধু সেই জন্যে আমি প্রেতকাজ করতে চাইনি গয়া গিয়ে। মনে হয়েছে করবোনা তার পিণ্ডদান—মানবোনা সে সব সংস্কার— যদি থাকে মৃত্যুর পরে কিছু—তবে আসুক তোমার দিদি—দেখা দিক আমাকে!

নিশীথকে থামাতে পারে না মালবী। মালবীর কাঁধের ওপরেই ভেঙে পড়ে নিশীথ। কাঁধে মুখ গুঁজে বলে—কিছু নেই! সব ফাঁকি মালবী—সব মিথ্যে! কিচ্ছু জানেনা ঐ সব বিলিতী পণ্ডিতে-রা। প্ল্যাঞ্চেট আর মিডিয়াম—সবই মিথ্যে।

আজ, মালবীর এইসব চিন্তার সূত্র ধরে যখন তার ঘরে ঢোকে নিশীথ—সহসা চমকে যায় মালবী। উঠে দাঁড়ায় ত্রস্তে। বলে—তুমি!

নিশীথ-ও দাঁড়িয়ে যায়। শাদা হয়ে যায় তার মুখ। আলো আঁধারিতে কে দাঁড়িয়ে? সে বলে—বাসবী।

গলা শোনা যায় না প্রায়। মালবী সুইচ টেপে। তীব্র আলোয় ভরে যায় ঘর। নিশীথের সে বিহ্বলভাব তখনো কাটে না। এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে মালবী। বলে--কি হলো, কি হলো নিশীথদা?

নিশীথের বিহ্বল ভাবটা কাটতে থাকে। বলে—মালবী, তোমাকে, তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি অমন করে জানালার ধারে বসো না। তোমাকে ঠিক বাসবীর মতো দেখাচ্ছিলো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে মালবী। নিশীথ পা মেপে মেপে এগিয়ে আসে। তারপর মালবীর চিবুক তুলে ধরে বলে—আর, যদি ব'সো, তবে এমন করে আলো জ্বেলে আমার চমক ভেঙে দিও না।

অদ্ভুত লাগে মালবীর। সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। নিশীথ নিজেকে সামলায়। বলে—আমার মনে যে মুখ সর্বদা....আমি না হয় তাকেই দেখলাম। কিন্তু তুমি ? তুমি কেন চমকে উঠলে মালবী ?

মালবী বলে—আমি যে তোমার কথা-ই ভাবছিলাম নিশীথদা ! তাই আমি চমকে উঠলাম।

—আমার কথা ? আমার কথা কি ভাবছিলে মালবী ?

এ যেন চিরপরিচিত নিশীথদা নয়। এ যেন কোনো অপরিচিত জাদুকর। সম্মোহন ঝরে পড়ছে তার চোখ থেকে। মালবী সেদিকে চেয়ে থাকে। বলে—ভাবছিলাম, যারা তোমাকে জানেনা, তারা তোমার উপর কি অবিচারটা-ই করে !

নিশীথ তবু চেয়ে থাকে। মালবীর সে চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা মনে হয়, এ নিশীথকে সে যেমন নতুন দেখছে—নিশীথ ও তাকে নতুন দেখছে। মনে হয় নিশীথ যেন সহসা, এই মুহূর্তে বুঝলো মালবী আর সে মালবী নেই। তার উনিশ বছর বয়স হয়েছে।

নিজের সম্পর্কে এর আগে মালবী এমন করে সচেতন হয়নি।

॥ ১১ ॥

বছর ক-টা এডিথ বিশ্বাসকে-ও বদলে দিয়ে গিয়েছে। জনস্টোন-গঞ্জের হাঁসপাতালের সে এডিথ বিশ্বাসকে আজ চেনা মুস্কিল। ছয়-বছর পেরিয়ে সাতে পড়লো। এডিথ বিশ্বাস আজ-ও ডাক্তার নারায়ণকে প্রতিদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। কৃতজ্ঞতা যদি পুষ্প হতো, তবে ডাক্তার নারায়ণ বোধহয় নিত্যনতুন ফুলে ঢেকে যেতেন। এডিথের কৃতজ্ঞতা তেমন নয়। তেমন করে সে করতে পারেনি কিছু ডাক্তার নারায়ণ-কে। কিন্তু তার জীবন দিয়ে বুঝিয়েছে তার কৃতজ্ঞতা।

ডাক্তার নারায়ণের পক্ষে-ও এডিথ একটা আবিস্কার। তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় ঠিক এই রকম কারুকে তিনি জানেননি।

এ কথা তিনি বুঝতে ভুল করেননি, যে এডিথ তার নিজের পরিচয় চেপে গেল। যে সব গহনা সে খুলে ফেলে—তারমধ্যে হাতের শাঁখা আর লোহা-ও ছিল। ডাক্তার নারায়ণ জানেন, এ হলো বাঙালী হিন্দু-মেয়ের সধবার চিহ্ন। আর মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত শরীর হলে ও সীমন্তে সিঁদুরের ক্ষীণ চিহ্ন তবু দেখা গিয়েছিল।

এ-ও বুঝলেন তিনি, যে আসল নামটা সে বলেনি। সেইদিন তাঁর দিকে চেয়ে—প্রথম যে নাম তার মনে এলো, সেই পরিচয়-ই সে দিলো।

তারপর এডিথ কাজ শিখলো তাঁর কাছে। তাঁর চেষ্টায় পরীক্ষা দিলো ডিস্ট্রিক্ট হেল্‌থ বোর্ড থেকে। ডাক্তার নারায়ণ তাকে বললেন—আমি তো চিরদিন থাকবনা আপনার সঙ্গে সঙ্গে। এতটুকু পরিচয় যে আপনার দরকার হবে। নইলে আপনি কাজ করবেন কি করে?

তাঁর চোখের দিকে চেয়ে রইলো এডিথ। তারপর বললো—ডক্টর, আপনি যা বলবেন, তা-ই করবো আমি। আমাকে দুইবার বলতে হবে না।

পাশ করলো এডিথ। নারায়ণ তার জন্যে পাটনায় চাকরীর খোঁজ-ও এনেছিলেন, কিন্তু সে রাজী হলো না। বললো—বেশী টাকার দরকার নেই আমার। আমাকে যদি প্রয়োজন থাকে আপনার, আমি কোথাও যাব না। আর যদি মনে করেন অপ্রয়োজনীয়…

অপ্রয়োজনীয় কোথায়? এডিথ যে কবে তাঁর অন্তরের গভীরে আসন করে নিয়েছে স্বীয় মহিমায় তা কি এডিথ জানে? না, সে কথা কোনদিন তিনিই জানাতে পারবেন? কোনদিন-ও জানাতে পারবেন না।

মনের ভাব প্রকাশ করতে অনভ্যস্ত ডাক্তার কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নিজের দুখানি হাতের দিকে। বললেন—অন্য জায়গায় কাজের কথা বলেছিলাম আপনার কথা ভেবে। আমার কথা ভেবে নয়। আপনাকে ছাড়তে চাইবো কেন আমি? আপনি যে আমাদের হাঁসপাতালের অনেকখানি। তবে এখানেই থাকেন যদি কিছু টাকা আমি বাড়িয়ে দেবো আপনাকে। মাত্র পঞ্চাশ টাকা দেবার কোন মানে হয় না।

—কিন্তু, তার চেয়ে বেশী টাকার তো আমার দরকার নেই ডক্টর। হাঁসপাতাল আমাকে খাবার দেয়, পোষাক দেয়—তার উপর আর বেশী টাকার কি প্রয়োজন?

—কোন প্রয়োজন নেই?

—না ডক্টর। সত্যিই কোন প্রয়োজন নেই।

এইখানেই আলোচনার ছেদ টেনে দিয়ে চলে গেল এডিথ। মুখের ক্ষতবিক্ষত দাগ, কপালের সে আঘাতের চিহ্ন অনেক শুকিয়েছে। ঘাড়ে আর পিঠে নিশীথের সে পুরুষ হাতের আঘাত, সে-ও মিলিয়ে এলো বলে। কিন্তু মনের আঘাত? মনের ঘা কি মিলিয়েছে? মনের সে আঘাত থেকে আর রক্ত ঝরে না আজ। যন্ত্রনা আর দুই চোখকে বন্ধ করে না। শুধু জেগে আছে একটা প্রতিহিংসার জ্বালা।

তার ভাগ্যচক্রে আবার ফিরে ইভামিত্র-র সঙ্গে দেখা। গ্রহ নক্ষত্রের

কি যে যোগাযোগ ছিলো, ইভামিত্র এসেছিলেন এই হাঁসপাতালে। একমাত্র সন্তান, সে-ও ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে তাঁকে। গিয়েছে ডাল্‌টনগঞ্জের-ই স্যানাটোরিয়ামে। ইভামিত্র-র স্বামীর সঙ্গে লড়ে জেতা সম্পত্তি তাঁকে কোনো নিরাপত্তা দিতে পারেনি। জীবনকে আরো দুর্বিষ-ই করেছে। সন্তানের মৃত্যুর পর ইভামিত্র আসেনি জনস্টোনগঞ্জে। হাঁসপাতাল ফণ্ডে-এ কিছু টাকা দেবার কথা তাঁকে ডালটনগঞ্জের স্যানাটোরিয়ামের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট-ই অনুরোধ করে জানিয়ে ছিলেন।

সকালে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে তাঁকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলো এডিথ বিশ্বাস। নিজের মধ্যে এমন ডুবেছিলেন মিসেসমিত্র, যে এডিথের দিকে ভালো করে চাইবার তাঁর সময় হয়নি। কিন্তু এডিথ চিনতে ভুল করেনি তাঁকে। সেই মুখ, সেই হাঁটবার ভঙ্গী। চুল শাদা হয়ে গিয়েছে সামনে। মুখে পড়েছে বার্ধক্যের রেখা। চোখের দৃষ্টি যেন ক্ষীণ। কাগজপত্রে সই করবার সময়ে ভ্রূ কুঁচকে দেখে দেখে সই করছিলেন মিসেস মিত্র।

উঠেছিলেন ডাকবাংলোয়। সেদিনই ফিরে যাবেন ডালটনগঞ্জ। সেখান থেকে কলকাতা। এডিথ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল যখন, তখন তিনি ভেবেছিলেন, বুঝিবা হাঁসপাতালের-ই কোন প্রয়োজনে হবে।

কিন্তু এডিথ তাঁকে হাঁসপাতালের কথা বলেনি। কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল সে। বলেছিল মিসেস মিত্র, চিনতে পারলেন না আমাকে ?

সে মুখখানার দিকে তাকিয়ে পুরনো কোনো স্মৃতি যেন মিসেস মিত্রের মনের দরজায় ঘা দিতে লাগলো। এ মুখ যেন কবে কোথায় দেখেছিলেন—এই কণ্ঠস্বর যেন কবে কোথায় শুনেছিলেন। ধূপের ধোঁয়ায় আঁকা একখানা সুকুমার মুখ আবছা মনে পড়ে কেন ?

এডিথ বলে—আমাকে চিনলেন না ? আমি বাসবী তালুকদার।

—বাসবী তালুকদার ?

—হ্যাঁ মিসেস মিত্র। মরিনি আমি। তবে বেঁচে আছি এডিথ নামে।

—বাসবী তালুকদার!

—হ্যাঁ মিসেসমিত্র। বিশ্বাস হয় না?

—বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস হয়—

অল্প অল্প মাথা নাড়তে লাগলেন ইভামিত্র। বললেন—কি হলো তোমার?

—এর চেয়ে অন্যরকম আর কি হতে পারতো? দুজনেই চুপ করে থাকেন। মিসেস মিত্র বারবার বলেন—সত্যিই তো! নিশীথের নিঃশ্বাসে বিষ আছে! সেদিন যদি জোর করে সরিয়ে আনতাম তোমাকে!

নিশ্বাস ফেলে এডিথ। তারপর বলে—আপনার কাছে অনুরোধ জানাতে এসেছি।

—কি বল?

—প্রথম হলো, আমার পরিচয় আপনি প্রকাশ করবেন না। কেউ যেন না জানে, আমি বেচে আছি। আর···

—আর কি?

—আর কলকাতায় ফিবে যাবেন আপনি—মাঝে মাঝে শুধু তেমন কোনো খবর যদি থাকে আলিপুরেব জানাবেন আমাকে।

নিজের জীবন তছ্‌নছ্‌ হয়ে গিয়েছে, তবু এর জন্যে সমবেদনার অন্ত থাকে না মিসেস মিত্র-র। এডিথের হাত দুখানা ধবে বলেন—বল, আমি তোমার জন্যে আর কি কবতে পারি?

এডিথ হাসে। সে হাসি কান্নার চেয়ে অনেক মর্মস্পর্শী। সে বলে—আপনার সঙ্গে দেখা হলো এতেই আমার অনেক উপকার হলো। আপনার কাছে মাপ চাইব বলে কমদিন খুঁজিনি আপনাকে।

ইভামিত্র বলেন—আমাব কথা ছেড়ে দাও। আমি শেষ হয়ে গিয়েছি। আর কিছু বাকি নেই আমার। আর কোনো সাধ আহ্লাদ—আর কিছু! আমার একই বন্ধন ছিলো—তবে ওর শৈশবে

শরীর মনের ওপর যে ঝড়টা গিয়েছিলো—সেটা ও সামলাতে পারল না। আর জন্মথেকেই বাপী একটু সুকুমার ছিলো। সহজেই অসুখ হতো সহজেই ভয় পেত! যাক, এখন ঈশ্বর তাকে নিয়েছেন, আমি আর তার কথা ভাববনা।

জীবন ভ'রে এত কেঁদেছেন মিসেস মিত্র, যে আজ আর নতুন করে তিনি চোখের জল ফেলেন না। গলাটা শুধু ভেঙে আসে। শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সামনের দিকে। বলেন—কেস্ মিটলো—তবে আমি পেলাম তাকে –কি অবহেলা অযত্নের মধ্যে পড়েছিলো…

যাকে বল্লেন, সে সমবেদনায় ভাবাতুর হৃদয়ে চুপ করে-ই থাকে। সে তো অমন করে কারুকে পায়নি—ভেবেছিল যদি পায় এক-জনকে কোলে—তবে তাকে নিয়ে-ই কাটিয়ে দেবে জীবনটা। কিন্তু সে আর হলো কোথায়? মনে হয় পেয়ে, পনেরো ষোল বছর ধরে ভালবেসে কাছে কাছে রেখে আবার হারানো সে আরো কত মর্মান্তিক।

মিসেস মিত্র বলেন—তুমি বলছ যখন বলব না। কথা দিচ্ছি তোমাকে। আর ও বাড়ীর খবর মানে—তোমার বাবা মা-র খবর?

—নিশীথ তালুকদারের খবর।

—নিশীথের খবর?

হ্যাঁ। কোথায় থাকে, কখন বেরোয় –কি করে—এইসব খবর। ফিরে আমি যাব মিসেস মিত্র –তবে তার কাছে। আগে তার মুখোসটা আমি টানমেরে খুলে দেব—তারপর ফিরে যাব বাবা মা'ব কাছে!

এডিথের কথার মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর কিছু থাকে, যা স্পর্শ করে মিসেস মিত্র-কে। তারপর তিনি বলেন—বেশ তাই হবে। কেউ জানবে না। সাধ্যমত খবর আমি দেব তোমাকে। যা সংগ্রহ করা যায়। দাদা তো এখনো যান ও বাড়ীতে! আর তোমাকে আমি অন্তর থেকে বলছি—আমার ঠিকানা তুমি রাখ –যে ক'টা দিন থাকব কলকাতায় আর ডালটনগঞ্জে ভাগাভাগি করে কাটিয়ে দেব।

কলকাতায়-ও বাড়ী কিনেছিলাম বাপীর লেখাপড়ার সুবিধের জন্য। আর ডালটনগঞ্জে…

আবার গলাটা ভেঙে হারিয়ে যায়। চোখ বন্ধ করে, নিশ্বাস টেনে—নিজেকে সামলিয়ে নেন মিসেস মিত্র। তারপর বলেন— তুমি যেদিন-ই, আশ্রয়, টাকা বা অন্য কোনো সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করবে- চলে এসো আমাব কাছে। আমি তোমার বড় বোনেব মতো-ই। যদি-ও বড় বোনের কাজ করতে পারিনি।

এডিথের মুখের দিকে নিজের লোকের কালিমা মাখা মুখখানি তুলে ধরে বলেন- বাপীর পাশে তুমিও জায়গা করে নিলে আমার মনে। যদি পারতাম আমিই পারতাম তোমার বিয়ে বন্ধ করে দিতে। নিরস্ত হয়ে পিছিয়ে যাওয়াটা উচিত ছিল না।

ম্লান হাসে এডিথ। বলে -আমার ভবিতব্য। যদি প্রয়োজন হয়, আপনার কাছে-ই যাব। আর আমার কথা সেদিন-ই বলবো। আজ আর আপনাকে কষ্ট দেব না।

চলে যায় এডিথ। তার দিকে চেয়ে থাকেন মিসেস মিত্র। লোহার ফটকটি খুলে, রাস্তা ধরে ঐ যে চলে যাচ্ছে। কি নিঃসঙ্গ কি ঋজু দেহ—কি টানটান কাঁধ। অনেকদিন আগে পার্কস্ট্রিটের বেস্টুরেণ্টে যাকে দেখেছিলেন, সেই বাসবী মৈত্র-কে মনে পড়ে। তরুণ নিষ্পাপ সুন্দর চেহারা—সরল মুখশ্রী- স্নেহপ্রেমে ছলছল করছিলো বাসবী সেদিন। মনে পড়ে যেন—সুন্দব পোষাকে সেজেছিল - সুন্দর গহণা পরেছিল…নিজের অন্তরের সুখের সঙ্গে বাইবেটাকে-ও সাজিয়েছিলো।

আর এই মেয়ে; অনেক ভয়ঙ্কর মৃত্যু -অনেক মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা মাড়িয়ে সে এসে পৌঁছিয়েছে এই পরিণতি-তে।

বাসবী মৈত্রকে নিয়ে এডিথ বিশ্বাস এমন করে, এমন নিখুঁৎ করে বানাতে--এক নিশীথ তালুকদার-ই পারে। আশ্চর্য শ্রস্টা সে আশ্চর্য তার ক্ষমতা। কিন্তু গল্পের সেই মানুষে গড়া দৈত্য-ব মতো শ্রস্টার সৃষ্টি আজ যে শ্রস্টার গলাটাই দু'হাতে ধরে তাকে নিয়ে এই নির্মম

পরিহাস করার জন্যে জবাবদিদি চাইবে? তখন কি করবে নিশীথ তালুকদার?

এডিথ বিশ্বাসের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। মিসেস মিত্রের সঙ্গে দেখা হয়ে তার মনে যে ভাবচাঞ্চল্য এসেছিলো—তার পরিচয় বাইরে কেউ পায় না। মুখে কথা নেই এডিথের। সামান্য হেসে সে কথা বলবার প্রয়োজন প্রায়-ই এড়িয়ে যায়। তার কাজের বাইরে-ও সে কাজ করে। নিজের আহার ও বিশ্রামের জন্যে সামান্য ঘণ্টা চার পাঁচ রেখে বাকি সময়টা সে হাঁসপাতালে-ই ঢেলে দেয়।

ডক্টর নারায়ণের আজকাল অনেক কথাই মনে হয়। বলেন—সিস্টার, তুমি আমাকে অনেক কৃতজ্ঞতায় বাঁধছ। ঋণী করছ আমাকে। তোমার এতখানি কি শোধ করতে পারব আমি? আমাকে এমন করে ঋণী করছ কেন?

এডিথ বলে—স্বার্থপর আমি-ও কম নই ডক্টর। দিনরাত কাজ করবার সুযোগ তুমি আমায় দিয়েছ। তুমি সুযোগ না দিলে আমি কাজ করতাম কেমন করে?

ডক্টর নারায়ণ হাসেন। বলেন—কাজ করতে চায়, অথচ করবার মতো কাজ খুঁজে পায় না—এ আমি ভাবতে পারি না। তুমি জাননা, সারাজীবনে আমি যা করেছি, কিছু নয়। অথচ বয়স তো পঞ্চাশের কাছে পৌঁছলো। আজ মনে হয়, দিনগুলো যদি আটচল্লিশ ঘণ্টা হতো, আর পরমায়ু যদি আরো চেয়ে নিতে পারতাম তবে ডক্টর রামানুজের স্বপ্নটাকে সত্যি করতাম।

—কি স্বপ্ন ডক্টর?

ডক্টর নারায়ণ কাজে বিশ্বাসী। কথা তিনি বেশী বলতে পারেন না। কিন্তু এডিথ বিশ্বাসের কাছে কেমন করে যেন তাঁর মুখ খুলে যায়। এডিথের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা বিশ্বাস আনে মনে, যা মনকে কথা কওয়ায়। অথচ এডিথ নিজে কৌতূহলী নয়। সে মৃদু ও স্বল্প-ভাষী। কখনো সে বিব্রত করে না অপরকে।

এতদিন হয়ে গেল। এডিথের বিষয়ে আজ-ও কিছু জানলেন না ডক্টর নারায়ণ। তবে একথা বুঝতে দেরী হয় না যে গভীর কোনো দুঃখ তাকে সর্বদা ঘিরে রেখেছে। মনে হয় শোকের এক নীরব সমুদ্র নিঃশব্দে মাথা কুটছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে—আর সেই দুরতিক্রম্য অতল অপার শোকের মাঝখানে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ এডিথ দাঁড়িয়ে আছে। সুগভীর কোনো মর্মছেড়া অভিজ্ঞতা মহিমান্বিত করেছে এডিথ-কে। বাইরের আঘাতে মুখখানা তার ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু অন্তরে? অন্তরের দুঃখকে আরো কত সুগভীর তা কি বোঝেন না ডক্টর? অনেকদিন রাতে ওয়ার্ড দেখতে এসে দেখেছেন। ওয়ার্ডে নিজের চেয়ারে বসে এডিথ চেয়ে আছে বাইরের দিকে। সামান্য আলো পড়ে যেন আলোয় ছায়ায় তাকে আরো রহস্যময়ী দেখাচ্ছে। দেখেছেন মুখখানা কি সকরুণ – চোখে কত স্মৃতির ছায়া।

আবার ওয়ার্ডে যখন প্রয়োজন হয়েছে, মরনোন্মুখ কোন রোগী বিকারে চেঁচিয়ে উঠেছে---প্রয়োজন হয়েছে অন্যকোনো গুরুতর কেসে —তখন এডিথ-ই নিঃশব্দে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি ডাক্তার! রুগীকে বাঁচানো তাঁর কাজ—মৃত্যুকে তিনি স্বীকার করেন না--জীবনকেই স্বীকার করেন—তবু, অস্বীকার করতে তো পারেন না, যে এডিথের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি প্রেরণা পেয়েছেন মনে। একটা একটা দিন বা রাত এসেছে—কলেরা বসন্তের মড়কের সময়—বা গুরুতর কোনো দুর্ঘটনার কেস নিয়ে –বা আরো গভীর সঙ্কটের সময় - তখন এডিথ তাঁর পাশে ছায়ার মতো থেকেছে। একভাবে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে ষোল ঘণ্টা--আঠারো ঘণ্টা। তারপর ডক্টর নারায়ণকে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বলেছে—ডক্টর, আপনি বিশ্রাম করুন। চা করে দিই আপনাকে?

ডক্টরের ঘরে-ই চা-এর সরঞ্জাম। এডিথ তাঁকে চা করে দিয়েছে। ক্যাম্প চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে চা খেতে খেতে এডিথের প্রতি তিনি আবার নতুন করে কৃতজ্ঞ বোধ করেছেন।

এডিথ তাঁর মনকে কথা কওয়ায়। এডিথের কাছে এসে ডক্টর

নারায়ণ নিজে-ও যে মানুষ—তাঁরও যে ছুটির প্রয়োজন আছে—সে কথা নতুন করে অনুভব করেন। কেন করেন, জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবেন না ডক্টর নারায়ণ। হয়তো বা এরই নাম প্রেম। হয়তো আরো গভীর কিছু—সখ্যতা, সম্প্রীতি বা বিশ্বাস!

ডক্টর নারায়ণ, রামানুজ সম্পর্কে বেশী কথা কারু কাছে বলেন না। এডিথের কাছে এসে তাঁর কথা কইতে ইচ্ছে করে। বলেন—ডক্টর রামানুজ আর আমি দুজনেই এসেছি কেরালা থেকে। বড় গরীব আমাদের দেশ সিস্টার। নীল সমুদ্র আর সবুজ নারকেল বন আছে। কিন্তু আমাদের দেশে নেই পর্য্যাপ্ত চাষের জমি।

ছোটবেলা থেকে আমি ডক্টর রামানুজের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ছাড়া আমি ডাক্তার হতে পারতাম না। আমাকে তিনি আমাদের মিশম থেকে আনেন বারোবছর বয়সে।

সব কথা বলবার নয়, তাই বলতে পারিনা। ডক্টর রামানুজের মতো মানুষ আমি বেশী দেখিনি সিস্টার। এই হাঁসপাতাল···কোথায় ছিলো এই বিল্ডিং—এই এতগুলো বেড—এই লেবরেটরী? রামানুজ যদি দেখে যেতেন সিস্টার—জীবনটা তাঁর ধন্য হয়ে যেত! তিনি এতখানি সমৃদ্ধি দেখে যাননি।

শেষের দিকে—তাঁর একটাই ইচ্ছে হয়েছিলো। আমাকে বলতেন—নারায়ণ, যদি পারি, তো আমি আর তুমি এই হাসপাতাল থেকে আলাদা করে একটা মেটারনিটি হোম করবো। ভীষণ প্রয়োজন এসব জায়গায়। হাঁসপাতালে জায়গা হয় না। কঠিন কেস্ যেগুলো—বারান্দায় ফেলে রাখতে হয়—একলামসিয়া আর টিটিনাসে কম মরে যায় না। বলতেন—জানো নারায়ণ, এমন একদিন ছিলো, যখন এখানকার মানুষের রোগ ছিল কম—আহার পেত তারা—জীবনযাত্রা ছিলো সরল। আমরা অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যমানুষরা-ই না এখানে কয়লা—মাইকা—ম্যাঙ্গানিজের খোঁজে এসে এদের জীবনটা বদলে দিলাম। রুজীরোজগারের প্রতিশ্রুতি দিতে পারলাম না—অনাহারের সঙ্গে সঙ্গে এলো রোগ। অথচ রোগের ব্যবস্থা আমরা করলাম না।

নারায়ণ, আমি মস্তো দায়িত্ব বোধ করি। মনে হয় এ কাজ আমার-ই। সত্যি, আমি তুমি করবোই নতুন একটা মেটারনিটি হাঁসপাতাল।

সিস্টার, আমার সেই স্বপ্ন। মনে হয় রামানুজের সে কাজ আমারই করতে হবে। যদি সে ওয়ার্ড করতে পারি, তোমাকে সেখানে চার্জ দেবো সিস্টার!

এমনি ক'রে অনেক কথা-ই বলেন ডক্টর নারায়ণ। এ কথা এডিথ বোঝে, যে তার দিক থেকে-সস্নেহে কোনো প্রশ্রয় পেলে হয়তো ডক্টর নারায়ণ তাঁর মনটা আরো খুলে ধরবেন। কিন্তু সে ভক্তি, সে শ্রদ্ধার অর্ঘ গ্রহণ করবে সে কোথায়? তার কি সে যোগ্যতা আছে? সে বলে—ডক্টর, যদি সে ওয়ার্ড করেন আপনি, আমি সেখানে-ও সিস্টার থাকব। তাতে হেল্‌থ কমিটির অপত্তি হবে না ত?

—ও, সরকারী লালফিতের কথা ব'লোনা।

এবার চটে যান ডক্টর নারায়ণ। বলেন—আমার হাঁসপাতাল আমার কথামতো চলবে। ওরা কি মানুষের প্রাণমনের মর্যাদা বোঝে? এ ফাইল থেকে সে ফাইল—ঘুরে ঘুরে পচে মবে এক একটা জরুরী প্রস্তাব। তবে কি জানো?

হঠাৎ হেসে ফেলেন ডক্টর নারায়ণ। আর আপনভোলা সেবাব্রতী এই মানুষটির কুশ্রীমুখে হাসিটা এমন শিশুর মতো সরল দেখায়, যে এডিথের মনটা যেন কেমন ক'রে ওঠে। নারায়ণ হাসতে হাসতে বলেন—এসব হচ্ছে আকাশকুসুমের কল্পনা। টাকা কোথায় আমার? অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা না নিয়ে কি সে কাজে হাত দেওয়া চলে? আর পঞ্চাশ হাজার টাকা? আমি মরে যাব যখন, তখন ঐ কবর দেবার খরচটা রেখে যেতে পারলেই যথেষ্ট মনে করব।

এডিথের বুকের ভেতরটা কেমন করে। বাসবী মৈত্র রূপোর চামচ মুখে নিয়ে বসেছিলো। বাসবী তালুকদারের-ও টাকা ছিল অনেক। বাসবী অনেক টাকার ছড়াছড়ি দেখেছে। সে সব টাকার কোন ব্যবহার হয়নি। অথচ তার চেয়ে অনেক কম টাকায় এই

হাসপাতাল আরও মস্ত করা যেতো। সার্থক হতে পারতো ডক্টর নারায়ণের পরিকল্পনা।

সে বলে—ডক্টর, আপনি নিশ্চয় পারবেন।

—পারবো? সিস্টার, তুমি কি বলছো?

এডিথ বলে—কেন ডক্টর, আপনাদের এই হাঁসপাতাল তো শুনেছি সুরু হয়েছিলো মাটির দেওয়াল আর শালপাতার ছাতনী দিয়ে। এই মেটারনিটি ওয়ার্ড-ও তেমনিই ছোট করে সুরু হতে পারে না কি?

—পারে সিস্টার পারে! কিন্তু রামানুজের পাশে আমি ছিলাম। আমার পাশে কে আছে বল?

—পাশে কে থাকলো আর না থাকলো তাই ভেবে কি কাজের মানুষ চুপ করে থাকে ডক্টর? প্রয়োজন হলে, কারু সাহায্য ছাড়াই একেবারে একা আপনি অপারেশান করেন না?

ডক্টর নারায়ণ বলেন—নিশ্চয়। সিস্টার, তোমার কথা সত্যি। তবে আমারই হয়তো ক্ষমতা নেই। ভালকথা, তোমার নামে চিঠি এসেছে। টেবিলে দেখলাম।

এডিথ উঠে যায়। যেতে যেতে বলে—আমার সিস্টারের চিঠি, ডক্টর। আশা করছিলাম আমি।

ইভামিত্র কথা রেখেছেন। ভোলেননি প্রতিশ্রুতি। লিখেছেন—

প্রতিশ্রুতি মতো লিখছি। এডিথ নামেই লিখলাম। অসিত মৈত্র-র স্ত্রী অসুস্থ আজ বহুদিন। নিশীথ তালুকদার মৈত্র বাড়ীতে-ই থাকে। সে-ই সে বাড়ীর সব। এমনকি মালবীর ওপরে-ও তার প্রতিপত্তি অনেকখানি। নিশীথ তালুকদার বাইরে বিশেষ বেরোয় না। কাজের জগত থেকে রিটায়ার করেছে। বারাকপুরের বাড়ী বিক্রী হয়ে গেছে।

এই প্রথম বহির্জগতের ঢেউ বুকে এসে লাগছে। কেমন যেন লাগে এডিথের।

ওয়ার্ডে ডিউটির সময় নার্স এডিথ বিশ্বাসের কেন যেন কাজে ভুল হয়ে যায়। মনে থাকে না কিছু।

॥ ১২ ॥

মালবীর অনুরোধে আলিপুরের বাড়ীতে সুরু হলো এক সান্ধ্য আসর। রজতের সঙ্গে মালবীর যেটুকু পরিচয় হলো, তার সুরু এখান থেকে-ই। সুরু কিন্তু শেষে গিয়ে পৌঁছলোনা। রজত যখন আর একটু ঘনিষ্ঠ হলো, তখন সে মালবীকে-ও আক্রমণ করতে ছাড়লো না।

মালবী গান গায় না—পিয়ানো বাজাতে ভালবাসে। একদিন, রজত বলেছিলো--'আধেক ঘুমে নয়নচুমে স্বপন দিয়ে যায়,

শ্রান্ত ভালে যূথীর মালে পরশে মৃদু বায়—'

এই গানটির মধ্যে একটা সুন্দর দুপুরের বিশ্রামের অলস ভাব আছে। সুরটি যেমন হাল্কা, তেমন-ই মধুর। মনে হয় আকাশ দিয়ে হাল্কা শাদা মেঘ সারি সারি ভেসে চলেছে। কিছু স্পর্শ ক'রে যাচ্ছে না।

সম্ভবত সেই কথা মনে ছিলো মালবীর। ভেবেছিলো গানটা বাইরে শোনাবে রজত-কে। বিকেল বেলা ড্রয়িংরুমে বসে বাজাতে বাজাতে মনটা তার আস্তে আস্তে সুরের ভেতর ডুবে গেল। আর কোন কিছু খেয়াল ছিল না তার। চমক ভাঙলো নিশীথের অস্ফুট আর্তনাদে—বাসবী! বাসবীর গান এটা মালবী! এ গান তুমি বাজিও না।

পিয়ানো ছেড়ে দিল মালবী। অনেকগুলো সুর-এ ওকে জড়িয়ে চলেছিলো—সবই মাঝপথে ছড়াছড়ি হয়ে গেল। ছিঁড়ে গেল সুরের বুনন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো মালবী। আবার তাকে মুগ্ধ করছে নিশীথ। পরিচিত থেকে অপরিচয়ের মধ্যে চলে যাচ্ছে। নিশীথ বলে—মনে পড়ে না তোমার? সে-ই···না, তুমি তখন ছোট ছিলে মালবী···

মনে পড়েছে মালবীর। মনে পড়েছে। সে বুঝতে পেড়েছে মনের অতলে কে যেন এই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে গাইছিলো মধুর বিস্মৃতি কণ্ঠে। এখন মনে পড়েছে সে তার দিদির গলা। দিদিই তো এই

গান গাইতো ? তাই কি, এই বন্ধ ঘরে, দিদির পিয়ানোতে বসে—দিদির ছবির দিকে চেয়ে মালবীর মনে এই গান এলো ?

আরো কাছে আসে নিশীথ। বিকেলের রাঙাআলো কাঁচের জানলার ভেতর দিয়ে এসে পড়েছে। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে নিশীথকে। নিশীথ এগিয়ে এসে মালবীর সামনে দাঁড়ায়। মালবীর কোঁকড়া চুলে আঙুল-গুলো অস্থিরভাবে ছোয়ায়। বলে—সেই রকমই নীল শাড়ী পরেছো …সেইরকম-ই চোখ…ভুল হয়ে যায়। বারবার কেন ভুল হয়ে যায় ? তুমি বাসবী নও' তুমি মালবী।·· তুমি বাসবী নও ? তুমি মালবী ?

মালবী কিছু ভাবতে পারছে না। তবে কি তার মধ্যে দিয়ে ফিরে ফিরে আসছে তার দিদির মৃত স্বপ্ন, অপূর্ণ সাধ কামনা ? নইলে এমন বারবার হয় কেন ?

হঠাৎ ঘরে ঢুকলো রজত। আর মালবীর চমক গেল ভেঙে। দ্রুত চলে গেল ওপরে। নিশীথ তখনো মন্ত্রমগ্নের মতো মালবীর গতিপথের দিকে চেয়ে। রজতের দিকে যেন তার খেয়াল-ই নেই।

তারপর কি যে হলো মালবীর রজতকে বললো—পিয়ানো আমি আর বাজাব না রজত। তুমি জানোনা। অজানতে পুরনো সব সুর আমার মনে হয়—আর নিশীথদা-র মনে হয় দিদির কথা। তোমাকে বোঝাতে পারবো না আমি…

বড় দুঃখে রজত লক্ষ্য করলো, যে মালবীব মধ্যে কোথাও নামছে একটা জাল। মনে হলো, এমন এক আশ্চর্য আকর্ষণ আছে, যে মালবী যেন নিজে-ই নিজেকে জড়াচ্ছে সেই জালে।

রজত চেষ্টা করলো নিজেব যুক্তির দীপ্তিতে মালবীর এই মোহময় আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাতে। তর্কের ঝড় তুললো সে। বললো—দেখ, শোক ভালো, শোক শ্রদ্ধা করবার জিনিষ—কিন্তু সেটা যদি জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এমন কবে জীইয়ে জীইয়ে আস্বাদন করতে চাও, মনে হবে তুমি নিজেকে প্রবঞ্চনা করছো।

—তুমি বুঝবে না রজত।

—না·মালবী, এ যেন এক ধরণের আত্মরতি। আর তোমার মধ্যে

দিয়ে তোমার মৃত দিদির সমস্ত সুপ্ত সাধকামনায় আবার পৃথিবীর রস আস্বাদ করতে চাইছে—এ একেবারে সাহিত্যের ব্যাপার হয়ে গেল।

—কি আশ্চর্য রজত—

মালবী এবার রূঢ় হতে চেষ্টা করলো। বললো—রজত, কেন তুমি অযথা ভেবে মরছো এসব কথা! সত্যিই পরের ব্যাপারে এত চিন্তা তুমি ক'রোনা। অনুবোধ করছি আমি।

কিন্তু সে সব কথায় আর যে নিরস্ত হয় হোক—রজত ওসব মেকী ভদ্রতার ধার ধারেনা। সে বললো —আচ্ছা, বুঝতে পারছ না কেন? তোমার বিষয়ে আমার দারুণ আগ্রহ রয়েছে যে।

—কেন রজত?

—কি জানি মালবী। তোমার বিষয়ে আমার দারুণ আগ্রহ। বছরখানেকের পরিচয় তো। তবু তোমাকে রোজ না দেখলে যেন ভালো লাগেনা।

—রজত, আমি ওসব কথা ভালবাসি না। কেন বারবার বল?

—বাঃ, আমার বলতে ভাল লাগলে বলব না? আসলে মালবী, তুমি-ও একজন হাজারটা সংস্কারে আবদ্ধ মেয়ে—এ দেখতে আমার ভালো লাগছে না। আমি তো বুঝছি, যে এ তোমার ভ্রান্তি।

রজত এমনি সোজা সোজা কথা বলে মালবীর মনটা পরিস্কার করে দিতে চায়। কিন্তু মালবীর মনের আধখানা যে একটা আশ্চর্য আঁধারে ঢাকা। সে আঁধার যবনিকার পেছনে—সবটুকু জায়গা জুড়ে রেখেছে তার দিদি, আর দিদির জন্যে নিশীথদার অদ্ভুত, অপার্থিব ভালবাসা। সেখানে আঘাত করতে চেয়েও পারেনা রজত। রজত হেরে যায়।

বাসবীর জন্যে নিশীথের এ আশ্চর্য প্রেম, মালবীর মনে হয় এমন অপূর্ব আর কিছু সে দেখেনি জীবনে। এমন আশ্চর্য আর কিছু হয় না।

রজতকে সে না বলে পারেনি একদিন—মাটি নেই, জল নেই, সূর্য নেই—তবু একটা গাছ বেঁচে আছে, এ-ও যেমন আশ্চর্য—দিদির জন্যে নিশীথদার এ প্রেমটা-ও তেমনই আশ্চর্য লাগে আমার।

—কেন ?

—কোন অবলম্বন ছাড়াই বাঁচছে ব'লে।

অবলম্বন কি সত্যই নেই ?

—ক'খানা ছবি, আর তার স্মৃতি !

—কেন, তুমি ?

—কি বললে রজত ?

রজত হাসলো। সে হাসিতে দুঃখের ভাবই ফুটলো বেশী। বললো—মনে হচ্ছে একদিন এমন রেগে যাবে, যে তোমার ফটক আমার কপালে বন্ধ হয়ে যাবে মালবী। তবু না বলে উপায় নেই। মালবী, তুমিই তাঁর সেই অবলম্বন। তোমার মধ্যে তিনি তোমার দিদিকে খুঁজে পাচ্ছেন। আর, আর···তোমারই কি সেটা ভালে। লাগছে না ?

—রজত ! তুমি বড় দূরে গিয়েছ। চুপ কর। আর এ বিষয়ে একটা কথাও বলবেনা তুমি।

—আজকে আমি উঠছি। কিন্তু মালবী—সে কথা যদি সত্যিই না হবে, তবে তুমি এত রেগে গেলে কেন ? আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি নিজেকে বুঝতে চেষ্টা কর মালবী।

—নইলে ?

—নইলে আত্মপ্রবঞ্চনার এ ছলনা একদিন ভেঙে যাবে। সেদিন তুমি নিজেই দুঃখ পাবে মালবী।

রজত চলে গেল। তবু মালবীর বুকের দুরু দুরু থামেনা। কান লাল হয়ে গিয়েছে, আগুনের মতো গরম বোধ হচ্ছে বাতাস। একি করলো রজত ? কেন টেনে খুলে দিয়ে গেল মুখোস ? মালবী যে এখন নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে, যে সত্যিই নিশীথের বিমুগ্ধ দৃষ্টি যে তাকে অহরহ অনুসরণ করছে—তাতে তার মনেও এক আকর্ষণ জাগছে। নিশীথ যেন টানছে তাকে।

ভূতে পায় মালবীকে। যে শাড়ী পরে তার দিদি শকুন্তলা সেজেছিলো, সেই শাড়ীখানা পরে। সেই রকম জামা পরে।

চুলগুলো খুলে দেয়। তারপর বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকে নিজের ছায়ার দিকে এক আশ্চর্য আকর্ষণে। কে সে? সে মালবী? তবে তার কপালে অমন করে চুল ঢেকে পড়েছে কেন? সে কি বাসবী? তার মধ্যে কি তার দিদির ছায়া অহরহ ভেসে ওঠে? আয়নার গায়ে একখানা হাত রেখে চেয়ে থাকে মালবী।

এবার আয়না নড়ে ওঠে। আর একটা ছায়া এগিয়ে আসছে। নিশীথ কথা কয় আস্তে আস্তে—যেন সামনের এ মানুষটা-ও এক আলোছায়ার বিভ্রম। একবার হাত দিয়ে ছুঁলেই ভেঙে চূড়ে মিলিয়ে যাবে বাতাসে। বলে—মালবী এই শাড়ী কেন পরেছ? সেই শাড়ী?

মালবীর মুখে কথা নেই। নিশীথ তার কপালে হাত ছুঁইয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। আঙুল দিয়ে বুলিয়ে দেখে তার মুখ, তার চোখ। বলে—তোমার দিদি কাল এসেছিলো। দাঁড়িয়েছিলো আমার মাথার শিয়রে। বললো কেন তুমি অমন করে কষ্ট পাচ্ছ? আমি ত' হারিয়ে যাইনি। হারিয়ে যায়নি সে···তবে সে কোথায়, মালবী?

অতি মিহি রেশমের ঝুরো সূতো যেন ঝড়ে ঝড়ে পড়ছে বাতাসে। ছুঁয়ে যাচ্ছে মালবীর মুখ চোখ। মালবী আস্তে বলে—হারিয়ে যায়নি সে, নিশীথদা।

—কোথায় সে মালবী? সে কি তুমি?

—নিশীথ দা!

দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। তারপর মুখ হাত দিয়ে ঢাকে নিশীথ। বলে—তা হয় না—তা হয় না মালবী—আমি পশু নই।

নিশীথ চলে গেলে পরে-ও পর্দাটা দুলতে থাকে। সেদিকে চেয়ে মালবী দাঁড়িয়ে থাকে। কে পশু? ঐ নিশীথ? কেমন করে তা বিশ্বাস করবে সে?

কিছুক্ষণ আগেকার উত্তেজনায় তার শরীর এখনো রিমঝিম করে।

এ বাড়ীর জীবনযাত্রা যেমন চলছিলো, তেমন চলে—তবু নদীর তলায় যেমন চোরাস্রোত বয়—তেমনই, মালবীর জীবনটা একটা আলাদা স্রোতে বয়ে চলে। বন্ধু বান্ধব—সঙ্গীসাথী নেই--সব বাদ

দিয়ে দেয় সে। একটা অদ্ভুত নেশায় পেয়েছে তাকে। বাসবী হবার সর্বনাশা নেশা সাপের বিষের মতো তার রক্তে রক্তে ছড়িয়ে পড়ছে। এ বিষ বুঝি নামবে না। এ নেশা বুঝি ছুটবে না। নিজে-ই যদি সাপ হয়ে দংশে নিজেকে জ্বালানো যায়, তো সে বিষ নামাবে কোন ওঝা?

কণ্ঠস্বর মৃদু হয়ে এসেছে মালবীর। পদক্ষেপ হয়েছে ধীর। দিদির কুমারী জীবনের শাড়ীগুলো বের করে পরে। চুল বাঁধে তার মতো করে।

নিজের ঘরে বাবা মা যান না বিশেষ-তাই রক্ষা। ঘরগুলো তাদের নিঝুম নিভৃত। সে সবঘরের নীরবতা ভাঙতে কেউ যায় না। নিচের ঘরে নেমে কখনো মালবী পিয়ানো খুলে টুং টাং করে। হালকা আঙুলের ছোঁয়ায় পুরোনো সব প্রিয় গানের সুর বাজায়। চোখ বুঁজে থাকে মালবী। মনে হয় শুকনো গোলাপের গন্ধে, এই বন্ধ ঘরের আবহাওয়ায়, তার দিদি যেন তার মধ্যে আস্তে আস্তে জ্যান্ত হয়ে উঠছে।

কখনো বা চলে যায় বাগানে। আঁধার হয়ে আসে। পাখী ফেরে বাসায়। বড় বড় গাছের ছায়ায় অপার্থিব এক পরিবেশ রচিত হয়। মালবী চুপ ক'রে বসে থাকে সেখানে। নয়তো বা ধীরে পায়-চারি করে।

নিশীথ তাকে আকর্ষণ করবে কি, সে-ই এখন নিশীথকে আকর্ষণ করে। তার দুর্বোধ চোখের চাহনি দেখে নিশীথের চোখ ফুটে ওঠে যন্ত্রনা। তার সামনে আসে না নিশীথ পারত পক্ষে। বেরোয় না ঘর ছেড়ে।

নিশীথ আবার নতুন করে বদলে যায়। দরজা বন্ধ করে থাকে। যখন বেরোয়, দেখা যায় চোখের নিচে কালী—অনিদ্রায় লাল চোখ।

একদিন, শুকনো ঝাউ পাতার উপরে মালবী এমনিই বসে আছে—সেখানে এলো নিশীথ। মালবীর সামনে নিচু হয়ে বসে পড়লো। বললো—কেন আমাকে এমন করে কষ্ট দিচ্ছ মালবী? কেন? কেন

তুমি বারবার তাকে ফিরিয়ে আনছ? একি বিলাস তোমার মালবী? না ঠাট্টা করছ?

মালবী কিছু বলবার আগেই মালবীর নরম হাত দুখানা প্রায় মুচড়ে দিয়ে চলে গেল নিশীথ।

সেই হাত দুখানার দিকে চেয়ে বসে রইলো মালবী। নিশীথের হাতের স্পর্শে এত জাদু আছে? কই, সে তো আগে জানেনি?

নিশীথের চোখের নিচে কালি মালবীর চোখের নিচে কালি। কি যে হয়েছে বুঝতে পারেন না অসিত। জ্যোতিপ্রভা জিজ্ঞাসা করে জবাব পান না।

একদিন নিশীথ জানায়—অনেকদিন হলো। ভাবছি আলাদা কোথাও গিয়ে থাকি—মানে বেহালাতে হোক বা অন্য কোথাও!

—সে কি নিশীথ?

মাথানিচু করে টেবিলে দাগ কাটে নিশীথ। বলে—মনটা যেন অস্থির হয়ে গিয়েছে মা।

চলে যাবে বলে নিশীথ। আর ঘরে গিয়ে দরজাবন্ধ করে মলেবী। কি যে হলো এদের মধ্যে। ভেবে পাননা জ্যোতিপ্রভা।

রাত হয়। নিশীথের ঘরে আলোজলে। নিশীথ টুকিটাকি গোছায় সব।

মালবী এবার অন্ধের মতো বেরিয়ে আসে টলতে টলতে। নিশীথের ঘরে গিয়ে নিচু হয়ে ভেঙে পড়ে নিশীথের কোলে। বলে—যাওয়া তোমার হবে না। তুমি যাবে কেন?

—মালবী!

মালবীকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে নিশীথ। নিশীথের দুই দৃঢ় বাহুতে হারিয়ে যেতে চায় মালবী। যুক্তি আর অন্ধ বিশ্বাস—দুই শলাকার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত মন যেন আর একটা কোন সমাধানের মধ্যে হারিয়ে শান্তি পেতে চায়। মালবী বলে—আমাকে নিয়ে আমি আর পারি না নিশীথদা!

—বাসবী ঠিকই বলেছিলো মালবী!

অন্ধ, বোবা, আদিম যে সব জটে মানুষের মনে জট-বাঁধা, তারই আঘাতে মুখ খুলে যায় মালবীর। ফিসিফিস করে সে বলে

—আমি সে হবো। আমি তার হয়ে তোমাকে ভালবাসবো—তার ফাঁক আমি ভরে দেবো। তুমি আমাকে নাও নিশীথদা!

নিশীথের উপবাসী হৃদয় ফুলে ফেঁপে ওঠে যেন। মালবীকে নিজের বুকে বলিষ্ঠ পেষণে পিষে ফেলে নিশীথ—মালবী! মালবী!

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেন জ্যোতিপ্রভা। সকল প্রশ্নের জবাব পান। জটিল গ্রন্থি সব সহজ হয়ে আসে।

এই ভাল হলো। বাসবীর সকল অপূর্ণ সাধ কামনা মালবীর ভিতর দিয়ে মিটুক। তৃপ্ত হোক, শান্তি পাক বাসবী।

অসিত আর জ্যোতিপ্রভার কাছে যখন প্রনাম করে আশীর্বাদ চাইতে আসে নিশীথ আর মালবী—অসিত শুধু একটি প্রশ্নই করেন—পারবে ত? পারবে তোমরা সুখী হতে?

যুগ্ম কণ্ঠে সম্মতি জানায়।

এবার পনেরো বছর আগেকার সেই এক ঘটনার-ই পুনরাবৃত্তি হয়। খবর যায় স্টেট্‌সম্যানের পাতায়। যারা জানেন—তাঁরা বলেন ক্ষীণ প্রতিবাদে—মৈত্র, ভেবে দেখেছো?

অসিত ম্লান হাসেন। সকলকে খুসী করা যাবে না। তার দরকার-ই বা কি? তাঁরা চারজন চারজনকে নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ। সে টুকু-ই থাক। ঈশ্বরের অভিপ্রেত না থাকলে এমন করে কি ঘটতো ঘটনা?

নিশীথের যেন বয়স ঝরে গিয়েছে। সে যেন নতুন করে জীবন পেয়েছে। মালবীকে সে বলে—মালবী, তোমার কোন সংশয় নেই তো?

—সংশয়?

মালবী চোখ তুলে চায়। এক সংকল্প গ্রহণ করেছে সে—বিচ্যুত হবে না কিছুতে। সুদৃঢ় একটা আত্মপ্রত্যয় বোঝা যায় তার কথায় বার্তায়। সে বলে—সংশয় তো কিছু নেই। যদি কিছু থাকে, যদি কোন অক্ষমতা থাকে, তুমি ঢেকে নিতে পারবে না?

—নিশ্চয়। তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছ, সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবনা আমি? আমার জীবনে আর কোন কাজ থাকবে না মালবী। তোমার দিদি···

—দিদির কথা বলো।

—তোমার দিদিকে ত' আমি সব সময় উপযুক্ত মর্যাদা করতে পারিনি মালবী। কত সময় দুঃখ দিয়েছি কত। তবে কি জানো? বিশ্বাস করো যা করেছি অনিচ্ছায়—অজানাতে। আমি-ও তো মূর্খ ছিলাম কি না! ভ্রান্ত কতকগুলো স্বপ্নে বিভোর ছিলাম।

মালবী সস্নেহে নিশীথের হাতে হাত রাখে। বলে—ছোট কাজ তুমি করতে পারো না। তা কি আমি জানি না?

সকলের সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে জ্যোতিপ্রভাব আনন্দ। অসিতকে ডেকে বলেন—সব চাই সে দিনের মতো। সেই সানাই--সেই ডেকরেটার—! আর দয়ারাম কেমন আগুন লাল রঙের বেনারসী আনিয়ে দিয়েছিলো? সেই রাংটা চাই! গহনা? আমার যা আছে পরুক মালবী। নতুন করে শুধু খোঁপার গহনা করিয়ে দেব। তুমি জাননা কি সখ্ আমার! তখন কেন যে হয়নি!

সব চাই সেদিনের মতো। এ যে অসিত জ্যোতিপ্রভার জীবনের শেষ কাজ! এরপরে আরো উৎসব, মালবী নিশীথের ছেলে মেয়ে যদি হয়? সে নেহাৎ-ই বড্ড বেশী ভাবা। সে সব কথা ভাববার কোনো মানেই হয় না।

এবার অনেকদিন পরে আলিপুরের বাড়ীর ফটক খুলে বাইরের লোক আসা যাওয়া করে। দর্জি—শানাই ওয়ালা—ফুল দোকানের কর্মচারী।

অসিত জ্যোতিপ্রভা মালবী আর নিশীথকে দেখা যায় এখানে ওখানে বেরুতে। কখনো পিকনিকে—কখনো বেড়াতে। একদিন ব্যারাকপুরে-ও বেড়িয়ে আসে তারা।

এদিকে বিয়ের প্রস্তুতি চলেছে। উৎসবের সুর লেগেছে বাড়ীতে। দাসীরা পুরনো তামা পেতল রূপোর বাসন মেজে মেজে সাফ করছে।

ঠিক আগুনলাল রঙের চেলী পাওয়া গেল না। তবে বিয়ের কনের মনের সিঁদুরেলাল রঙটি পাওয়া গেল। একটা আপশোষ জ্যোতিপ্রভার, যে ফুলের দোকানের সেই ঢাকাই কারিগরকে পাওয়া গেল না। বুড়ো মরে গিয়েছে। বাসবীর বিয়ের সময় সে বড় সুন্দর ফুলের গহনা গড়েছিলো।

এবার আত্মীয় স্বজনদের বাড়ী গাড়ী যাচ্ছে। বাড়ীঘর গম গম করছে মানুষজনে। সাতদিনের জন্য সকলকে এখানে রাখবেন জ্যোতিপ্রভা। যারা জানেন শোনেন সব কিছু, তাঁদের বড় দরকার জ্যোতিপ্রভার, টাকা দিয়ে তো সব কিছু হয় না। আচার অনুষ্ঠানের দিকটা কে দেখবে? 'শ্রী' গড়তে হবে—বরণডালা সাজাতে হবে—গৌরীপূজা নান্দীমুখ—এসব-ও করতে হবে—বংশের পূজা তো উঠে গিয়েছে—একবার কালীঘাটে পূজা দিয়ে আসা প্রয়োজন। মালবীর বন্ধুরা বড়জোড় পিঁড়ি চিত্র করবে আর আলাপনা দেবে—এ সব কাজ তো তাদের দিয়ে হবে না।

এবার যেন বরণডালার প্রদীপ না নেভে—কোন ত্রুটি না হয়—সকলকে খুশী করে তবে কাজে হাত দেবেন জ্যোতিপ্রভা। টাকাতে কি হয়? আশীর্বাদ চাই—নইলে কেমন করে সুখী হবে মালবী?

আর মালবী মন্ত্রমুগ্ধ পুতুলের মতো বসে রইলো। তাকে ঘিরে সহসা অনেক মানুষ, অনেক কথা, অনেক কাজ গুঞ্জরণ করে উঠলো। যেন খানিকটা আশ্চর্য হয়ে-ই দেখলো মালবী—সে নিজেকে কতখানি জড়িয়ে ফেলেছে সব কিছুতে।

মালবী মন্ত্রের মতো জপ করতে লাগলো মনে মনে—আমি সুখী হবো। আমি সুখী হবো। আমাকে সুখী হ'তে-ই হবে।

যেন সুখের কথা নয়, জয়পরাজয়ের-ও কথা। আমি জয়ী হবো—এ-ই যেন তার আসল বক্তব্য।

॥ ১৩ ॥

মালবীর সঙ্গে নিশীথের বিয়ের খবর যখন এডিথ বিশ্বাসের কাছে পৌঁছলো এক নীলখামে—এডিথ বিমূঢ় হয়ে রইলো। কিন্তু বিমূঢ় হয়ে থাকবার সময় তখন নয়। মাঝে দিন পনেরো আছে। এখনই তৎপর হতে হবে। নিশীথ তালুকদার বাসবীকে ভেঙে চুরে পিষে ফেলে বানিয়েছে এডিথ বিশ্বাস। মালবীর উপর সে এখন মালীকানা কায়েম করতে চায়? এডিথের মনে হলো, মালবী—সেই সুন্দর সুকুমার, একান্তভাবে দিদির ওপর নির্ভরশীল ছোট্ট মালবীর সমস্ত জীবনটা আঁধার করে নামছে করাল ছায়া। আর তো চুপ করে থাকা চলবেনা। এই তো আত্মপ্রকাশের সময়!

ডক্টর নারায়ণ এডিথের বিষয়ে বড় সতর্ক—চট্ করে বুঝলেন তিনি—যে একটা কিছু ভাঙচুর হয়েছে তার মনে। বিচলিত হয়েছে এডিথ। বললেন—কি হয়েছে সিস্টার?

—কিছু তো হয়নি ডক্টর।

—তবে তুমি বিচলিত হলে কেন?

—না ডক্টর।

নিজেকে সামলায় এডিথ। বলে।

—আমাকে ডাকছিলেন ডক্টর?

—হ্যাঁ সিস্টার। একটা অনুরোধ আছে! আমাদের নতুন পুলিশ ইন্সপেক্টর ত্রিপাঠি-কে তুমি দেখেছ তো?

হ্যাঁ।

—চমৎকার ছেলেটি, তাই না?

—ওঁকে তো সকলেই ভালবাসে।

—ওর স্ত্রী-র এই প্রথম সন্তান সম্ভাবনা। দেড়মাস বাদে হবার কথা। আজ সকালে খবর পেলাম—হঠাৎ সামান্য পা পিছলে যাবার পর থেকে ব্যথা সুরু হয়েছে। তার বাড়ীতে যেতে হবে তোমাকে।

—হাঁসপাতালে আনলে হয় না?

—সেই তো মুস্কিল কি না! ওরা আছে শাজাহানপুরে। আট মাইল রাস্তা কেমন করে আনবে বল? তোমাকে যেতে-ই হবে সিস্টার। তুমি তো শিখেছ সব-ই। তুমি ছাড়া কারু ওপর আমি ভার দিয়ে ভরসা পাবনা। ডক্টর বসু-কে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে শুধু আমার দিক থেকে—একজন পাশকরা ডাক্তার পাঠিয়েছি এই সান্ত্বনা থাকবে। বসু একেবারে ছেলেমানুষ তো! আর এ সব কেস তেমন হ্যাণ্ডেল করতে পারে না। দেখলে তো সেই সাঁওতাল মেয়েটির বেলা কি শোচনীয় কাণ্ড হতে চলেছিলো। তুমিই তো তাকে বাঁচালে! তুমি বরঞ্চ রাডাবীকে নিয়ে চলে যাও। বুড়ো। মানুষ—ও কাজ কর্ম জানে ভাল। তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।

—ডক্টর যদি ফরসেজ বা সিজারিয়নের প্রয়োজন হয়?

—তা হবে না। আমি তো পরশু-ও দেখেছি তাকে। হলে, তা-ও তোমাকেই মাথা ঠিক রাখতে হবে। দাঁড়াও, ভাল বলেছো—ডক্টর বসু-কে তুমি নিয়ে-ই যাও। কিন্তু তোমরা দেরী ক'রো না আর। ত্রিপাঠির গাড়ীতে যাবে, ত্রিপাঠি-ই পৌঁছে দেবে তোমাদের।

ডক্টর নারায়ণ এমন করে অনুরোধ করলে কিছু বলতে পারে না এডিথ। ডক্টর নারায়ণ এত সৎ, এত বিশ্বাস করেন মানুষকে—এমন মনেপ্রাণে খাঁটি একটা মানুষ, যে কোন কথা কইলে, সামান্য অনুরোধটা -ও রাখতে ইচ্ছা করে এডিথের।

ত্রিপাঠির বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে দশটা বেজে যায় বেলা। শ্রাবণ মাসের দিন। ঘনমেঘ করেছে আকাশে। রোদ নেই। চাপা একটা আলো। কেমন যেন বুকে হাঁফ ধরানো গুমটের ভাব সব জায়গায়।

গাড়ী থেকে নেমে—হাতটা ধুয়ে ফেলে এডিথ আগে মেয়েটিকে দেখে। সেদিন-ও দেখেছে হাসি খুসী প্রফুল্ল মুখখানা। এখন সেই মুখখানা যন্ত্রণায় নীল হয়ে গিয়েছে। সমস্ত শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে যন্ত্রণার ধাক্কাগুলো বাঁচাবার সে কি অক্ষম প্রয়াস। নাড়ীটা দেখে

নেয় এডিথ। তারপর বলে—ঘর থেকে বাজে ভিড় না বাড়িয়ে চলে যান সবাই। কারু থাকবার প্রয়োজন নেই। রাডাবি, তুমি গরমজল চড়াও। অনেক গরমজল লাগবে।

এডিথের মধ্যে এমন একটা কর্মপটুতা ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব দেখা যায়, যে খানিকটা যেন আশ্বস্ত বোধ করেন ত্রিপাঠি। এডিথ কথা কয়না। কাজ করে চলে। ত্রিপাঠী তার-ই মধ্যে তাকে জিজ্ঞাসা করেন—সিস্টার কোন বিপদের ভয় নেই ত?

এডিথ বোঝে, যে আশ্বাস চায় ছেলেটি। আশ্বস্ত হতে চায়। বলে আপনি ভাবছেন কেন? সাধ্যমতো চেষ্টা করবো বলে-ই তো এসেছি। কখন পড়ে গিয়েছিলেন মিসেস ত্রিপাঠি।

—কালকে সকালে।

—কালকে সকালে? ডক্টর যে বললেন কালকে নয়—আজকে?

—জানতেন না।

—তো কালই আপনি জানাননি কেন?

—কেস্ নিয়ে গিয়েছিলাম বেরিয়ে। আমিই জানাতাম না। ফিরলাম রাতে। জেনেই খবর পাঠিয়েছি আপনাদের। তাতে বিশেষ কোন বিপদ হতে পারে?

—দেখুন মিষ্টার ত্রিপাঠি, বিপদের আশঙ্কা করিনা আমরা। কিন্তু বিপদ সম্পর্কে অবহিত থাকতে তো দোষ নেই। আপনি ভাববেন না—আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবো। ডক্টর বসুও আছেন।

—যা হয় করুণ সিস্টার। আমি ভয় পাচ্ছি শুধু…আমার জেদে-ই এখানে রইলো চন্দ্রা। নইলে এ সময়ে আমার বাবা মা-র কাছে থাকতো ও পাটনায়। পাটনায় বড় হাঁসপাতাল ছিলো, মুস্কিল হতো না কোন!

—দেখা যাক্। এখনো ত' খারাপ কিছু বুঝিনি।

সে যেন নেহাৎই ত্রিপাঠির মনরাখা কথা। এডিথ বোঝে, যে অসময়ে আঘাত লেগেছে। এখন যদি সন্তানকে বের করে আনা না যায়—মা ও শিশু তু'জনের-ই বিপদ।

মিসেস ত্রিপাঠি বিকেলের দিকে আরো কাহিল হয়ে পড়েন। আর যেন বুঝতে পারেন না। সন্ধ্যে নাগাদ অবস্থা যে খারপের দিকে যাচ্ছে, তা বুঝতে বাকি থাকে না এডিথের। মুহূর্তে গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত। মনে থাকে শুধু ডক্টর নারায়ণের মুখখানা। তিনি তাকে বিশ্বাস করেছেন। ডক্টর বসু-কে বলে—ফরসেপ্ ডেলিভারি করাতে হবে ডক্টর। তৈরী হোন। প্রত্যেকটা মুহূর্তের দাম আছে।

ত্রিপাঠিকে বলে—আপনি চলে যান বাইরের ঘরে। মিছামিছি কষ্ট পাবেন না।

ত্রিপাঠির শোয়ার ঘর নিমেষে-ই হয়ে যায় এক অপারেসন থিয়েটার। দরজা বন্ধ করে দেয় এডিথ। হাতে পরে নেয় রবারের দস্তানা। ডক্টর বসু বলেন—সিস্টার, আপনি এদিকে আসুন।

তারপব যেন ঘণ্টাদুয়েক আর কোন জ্ঞান থাকে না এডিথ ও ডক্টর বসু-র। জঠরের উত্তপ্ত অন্ধকারে শিশু যেমন বত্রিশটা নাড়ীর বাঁধন জড়িয়ে থাকতে চায়—ছাড়তে চায় না—ডক্টর বসুর ফরসেপ্-ও চায় নিরাপদে তাকে বের করে আনতে। সে স্নেহের বত্রিশ নাড়ীর বন্ধন—দেরী হলে মৃত্যু ফাঁস হয়ে উঠবে। দেরী করা চলে না।

গরম জলের ভাপ ওঠে। কথা নেই—চলমান দুটো শাদা ছায়া যেন কাজ ক'রে চলেছে।

রাত দুটোর সময় এডিথ দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। বলে—মিস্টার ত্রিপাঠি—নিশ্চিন্ত হতে পারেন এবার। আপনার স্ত্রী-র ছেলে হয়েছে। দুজনে-ই আপাত নিরাপদ।

তারপরের অধ্যায় এডিথের। শিশুকে ও মা-কে ঠিক করে সোয়াতে সোয়াতে-ই ভোর হয়ে আসে। এডিথ বলে—ডক্টর বসু, আপনি রাডাবিকে পাঠিয়ে দিন জনস্টোনগঞ্জে। লক্ষ্মী বা রূপা, যে কোন নার্স-কে নিয়ে আসুক। মিস্টার ত্রিপাঠি, আপনার স্ত্রী এখন একমাস বিছানায় থাকবেন। নার্স দরকার হবে আপনার।

ভোরের দিকে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। এডিথ বসে থাকে রুগীর ঘরে। ওধুধের ঘোরে ঘুমোচ্ছে মা। শিশু-ও ঘুমায়।

অতি ক্লান্ত দেহ—ভেঙে পড়তে চাইছে বিশ্রামে। তবু বসে থাকে এডিথ। মনে হয় যুদ্ধশেষে কেন সফল সংগ্রামী সে।

সমস্ত বাড়ীটা নিশুতি। ঝড় গেছে সকলের উপর দিয়েই। সকলে তাই ঘুমোচ্ছে। সকাল হয়েছে তবু আলো ফোটেনি কেন? বাইরে বিষ্টি নেমেছে। ভরা শ্রাবণের ধারা বরষণ।

এডিথের মনে হয় বসে থাকলে ঘুমিয়ে পড়বে সে নির্ঘাৎ! তার চেয়ে অগোছালো ঘরখানা গোছালে ভাল হয়। টেবিলটা পরিস্কার করতে যায়। হঠাৎ দৃষ্টিটা তার আটকে যায় সামনে। চামড়ার খাপে রিভলভার। দেখে কি যে মনে হয় তার, কোন্ মনোভাব চাবুক মারে—তা সে কোনদিন-ও বলতে পারবে না। সে টপ করে বের করে নেয় রিভলভারটা। ভরে নেয় নিজের বড় কালো হ্যাণ্ডব্যাগে।

বুকটা ধড়াস ধড়াস করে। যা করলো তার নাম চুরি। আর আগ্নেয়াস্ত্র চুরি—সে এক গর্হিত অপরাধ। ধরতে পারে যদি—এই ত্রিপাঠি-ই হয়তো তাকে জেলে দেবে। স্বদেশী যুগে আগ্নেয়াস্ত্র চুরি নিয়ে কত কাণ্ড হতো, তা তো শুনেছে সে।

খাপটা পড়ে থাকে। এডিথ ভাবে আমাকে আত্মরক্ষা করতে হবে তো! নিশীথ কি আমাকে শেষ করে দিতে চাইবেনা? তখন আমি নিজেকে বাঁচাবো কেমন করে? নিজেকে সে বোঝায়—যে নিজের জন্যেই প্রয়োজন এই রিভলভারের।

নার্স না আসা অবধি এডিথ সেখানেই থাকে। জনস্টোনগঞ্জে ফিরতে পরদিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। ডক্টর বসু নারায়ণকে বলেন—চল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেল—এতটুকু বিশ্রাম নেননি উনি।

এডিথকে ডক্টর নারায়ণ বলেন—ধন্যবান সিষ্টার, আমার বিশ্বাসের মর্যদা তুমি রেখেছ।

একটু হেসে নিজের ঘরে চলে যায় এডিথ। গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। আর সঙ্গে সঙ্গে-ই প্রায় ঘুমে ভেঙে আসে চোখে।

পরদিন, কথাপ্রসঙ্গে এডিথের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান নারায়ণ। বলেন—তুমি ছুটি চাইছ? কতদিনের জন্যে?

—বলতে পারি না ডক্টর।

—সে কি এডিথ?

নামধরে ডাকেন ডক্টর আত্মবিস্মৃত হয়ে। এডিথের মুখ যেন আরো শাদা দেখায়। সে বলে

—আমি তো বলতে পারিনা ডক্টর। কবে ফিরবো, কি ব্যাপার—কতদিন লাগবে। আপনি যদি ছুটি দেন, সে-ও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দিতে হবে। তারচেয়ে ··

—কি এডিথ?

—তারচেয়ে আপনি আমায় ছেড়ে-ও দিতে পারেন।

—এডিথ। তুমি আমাকে অযথা আঘাত করছো।

—কি করবো ডক্টর, কেমন করে আমি সঠিক কথা বলি!

—আমিই যে তোমাকে অমন ক'রে ছাড়তে পারি না—কি হয়েছে? আমি কি তোমায় কোন সাহায্য-ই করতে পারি না? না না—এই হাঁসপাতালে তুমি এত বছর ধরে আছ—আমাদের দিক থেকে তোমার প্রতি কোন কর্তব্য-ই কি নেই? তুমি ছুটি চাও, ছুটি নাও—কিন্তু ফিরে এসো এখানে। তোমাকে হাঁসপাতাল থেকে ছেড়ে দেব কেন বলো?

এডিথ চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ ডক্টর নারায়ণের দিকে। বলে—ডক্টর আজ আপনাকে কিছু বলতে পারে না। যদি ফিরে আসি, তবে যেন আবার জায়গা পাই।

—নিশ্চয়। কিন্তু যদি···এমন করে কেন কথা বলছ?

—বলতে পারব না ডক্টর। বেশী আপনি জানতে চাইবেন না। বলতে পারব না আমি। তবে জানবেন, এখানেই ফিরতে চেষ্টা করব আমি। যদি না পারি, তবে জানবেন ঘটনাচক্র আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী ছিলো—আমি তার কাছে হেরে গেছি ডক্টর!

—জানতে চাইবনা?

—না ডক্টর। বলতে তো পারবোনা আমি।

—কোথায় যাবে এডিথ?

—তা-ও বলতে পারব না ডক্টর।

দুজনে দু'জনের দিকে চেয়ে থাকেন। ডক্টর নারায়ণের মনে হয়—অজানা অদৃষ্ট কোন তুফান উঠিয়ে এডিথকে এনে দিয়েছিলো এখানে। এডিথ চলে যাবে আবার—আবার কি মিলিয়ে যাবে অজানা কোনো ভবিতব্যের আড়ালে? আবার হারিয়ে যাবে?

বুঝতে পারেন তিনি—এডিথ মিথ্যাচরণ করেছে না তাঁর সঙ্গে। সত্যিই সে হয়তো বলবার অধিকারী নয় সবটুকু—মানুষ কি নিজের জীবনের সবটুকু নিজের হাতে ধরে রাখতে পারে? এ-ও বিশ্বাস করেন, যে সে পারলে পরে ফিরে আসবেই তাঁর কাছে। তাঁর হাঁসপাতালে।

এডিথ উঠে গেলে-ও তার উপস্থিতির রেসটুকু যেন মেলায়না। সব কথা বলে নি এডিথ। তবু কি বলেনি? তিনি মুখে কিছু বলেন নি স্পষ্ট করে। তবু কি দিনের পর দিনের পরিচয়ে তাঁব আর এডিথের মধ্যে ডক্টর আর সিস্টারের সম্পর্কটা ঝ'রে পড়ে যায়নি? গৌণ হয়ে যায়নি? এডিথের মুখচোখ কি আজ তার হয়ে কথা বলে নি?

তবু কি সংযম—তবু কি আত্মমর্য্যাদার স্বাভাবিক মহিমা। এই জন্যেই এডিথ তাঁর মনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

এডিথ চলে আসবার সময়ে—ডক্টর তার হাতে খাম তুলে দেন একটা। বলেন—টাকা রইলো সামান্য। দরকার হতে পারে তোমার।

নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দেন ডাক্তার। এডিথের হাতখানা যেন প্রয়োজনের-ও বেশী কিছু সময় থেকে যায় তার হাতে। নারায়ণ বলেন—ফিরে এসো এডিথ!

—আসব ডক্টর।

ছেড়ে দেয় এডিথের গাড়ী। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শাদা

পোষাকে, কালো চেহারার মানুষটি কপালে হাত রেখে চেয়ে আছেন—কাঁচাপাকা চুল উড়ছে বাতাসে—নিঃসঙ্গ প্রৌঢ় মানুষটির মুখখানা শিশুর মতো অসহায় হয়ে গিয়েছে দুঃখে—এই ছবিখানা মনের মধ্যে ধরে নেয় এডিথ। যতক্ষণ না চোখের জলে দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে যায়।

তার ভবিতব্য তাকে টেনে নিয়ে চলে নিশীথ তালুকদারের দিকে। ভবিতব্য তাকে এমন করে কতবার ছিড়ে নিয়ে যাবে স্নেহমমতার বন্ধন থেকে ?

মিসেস ত্রিপাঠি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠেন। ত্রিপাঠির ঘরের রিভলভার চুরি ধরা পড়ে তিনদিন বাদে। চামড়ার কেসটা ছিলো টেবিলের উপর, দেখেনি আর তুলে ত্রিপাঠি। চূড়ান্ত অসাবধানতার এই পরিণতি দেখে দিসাহারা হয়ে পড়ে সে। চোরই রিভলভারের বর্ণনা দিয়ে খবর জানিয়ে দেয় সর্বত্র।

এডিথ বিশ্বাসের সঙ্গে রিভলভার চুরির ঘটনাটা মেলাবার অসম্ভব কথা তার মনে হয়না কিছুতে। বড় দারোগার ধমক ও তিরস্কারের—পুত্রলাভের আনন্দটা তেমন প্রকাশ পায় না।

ইভামিত্র-র বাড়ীতে এসে ওঠে এডিথ। ইভামিত্র-র বাড়ী মধ্য কলকাতার এক বনেদী পাড়ায়। একা থাকেন ঝি চাকর নিয়ে।

এডিথ তাঁকে বলে—আমি যেমন করে পারি এ বিয়ে বন্ধ করবো।

এ বিয়ে আমাকে বন্ধ করতে-ই হবে। আপনার কাছে একমাত্র অনুরোধ, আমি যে এখানে এসেছি, তা যেন কেউ না জানে।

ইভামিত্র করুন হাসেন। বলেন—কেউ আসে না এখানে। কারু সঙ্গে আমি দেখা করিনা। লোকজন, বা বাইরের আলো যেন সহ্য করতে পারি না। কথাবার্তা বলি টেলিফোনে। এক আমার দাদা মাঝে মাঝে আসেন। তা তিনি গেছেন দিল্লী। তোমার পক্ষে ভালই হলো।

এডিথ বলে—বেরুবার মতো জামা কাপড়—আপনার আছে কিছু। আমার ত' কিছুই নেই। কিছু কিছু লাগবে আমার।

আলমারীর পাল্লা তাকে খুলে দেন ইভামিত্র। নানান রঙের কাপড়, কেস-এ গহনা—। বলেন—এ জঞ্জাল গুলো-ও বিদায় করতে হবে। সবই ছিলো—আশা ছিলো বাপীর বৌ এসে পরবে। কিছু হলোনা। তুমি জান না, আমি দিনরাত তার ঐ ছবিগুলো দেখে সময় কাটাই। আমার ত' শরীরটা-ই এখানে। মনপ্রাণ সব তার কাছে। মনে হয় বেশীদিন আর এমন দূরে দূরে থাকতে হবে না।

কিন্তু বারবার এডিথ ফিরে আসে বিফল হয়ে। বলে—পারছিনা দেখা করতে। খবর পেয়ে বোট্যানিকাল-এ গেলাম—কাল গিয়েছিলাম বেহালা···কিন্তু আমার দিকে চেয়ে-ও চিনতে পারলেন না বাবা মা। মরে গিয়েছি তো! ফিরে নিজেকে জীবিত প্রমাণ করা বড় মুস্কিল!

শুকনো মুখচোখ। চোখ জ্বলে কোন অস্বাভাবিক দীপ্তিতে। ইভামিত্র বলেন—স্নানকর, খাও কিছু!

—দেরী হয়ে যাচ্ছে যে? বিয়ের যে মোটে দুইদিন বাকি।

—কি করবে?

—উপস্থিত হবো বিয়েবাড়ীতে! সকলের সামনে নিশীথ তালুকদার কে···!

—সে যদি পালটা কিছু করে তোমায়?

—তার জন্যে-ও প্রস্তুত হয়ে এসেছি আমি।

কাল বিয়ে। আজকে শানাই ধরেছে গৌড়সারং। আলোঝলমল মৈত্র বাড়ী। নিচের তলায় অভ্যর্থনা চলেছে আগুন্তুকদের। এমনদিনে মালবী একটু একলা থাকতে চেয়েছিলো। কিন্তু একলা থাকতে দিচ্ছে না কেউ। গায়ে হলুদের নতুন ঢাকাই পরে গহনায় চন্দনে মাখামাখি হয়ে বসে আছে যেন লক্ষীপ্রতিমা। বাগানে বাজি পুড়ছে। পোড়াচ্ছে ছেলে-রা। জ্যোতিপ্রভার বোনের ছেলেরা। মালবীর মামাতো মাসতুতো ভাই-রা।

যে যা বলছে তাতেই রাজী জ্যোতিপ্রভা! তিনি শুধু বলেছেন—তোরা আনন্দ কর। আমার বাড়ীতে আনন্দ নেই—তোরা সবাই মিলে আনন্দ কর।

নিজের ঘরে বসে আছে নিশীথ। দরজা খোলা। দরজায় ভারী পর্দা টানা। নিজের ঘরে বাতি নেভানো। বাথরুমের দরজা খোলা। বাথরুমের পেছনের দরজা-ও খোলা। হুহু করে জোলো বাতাস আসছে। বড় ভালো লাগছে নিশীথের।

জীবনের পানপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ আজ। ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে নিশীথ। সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে। মনে তার কোন ক্ষোভ নেই।

অনেক রকম হলো। এবার মালবীকে নিয়ে সংসার করবে সে। মন্দ লাগবে না। বয়স-ও বিয়াল্লিশ। আর নতুন নতুন পেশার পিছনে ছুটে কি হবে? মালবী মেয়েটা মন্দ নয়। তার দিদির থেকে ভালো। বেশ উত্তাপ আছে। আর নানারকম কাজে ব্যস্ত থেকেছে নিশীথ—জীবন যৌবন তার আনাস্বাদিত-ই রয়ে গিয়েছে। মালবীর কয়েকটি ছেলে মেয়ে-ও হওয়া দরকার। মালবীর মতো মেয়েদের সর্বদাই ব্যস্ত রাখা প্রয়োজন। বিয়ের পরে-ও যে ঐ রজতরা আসবে

না তার ঠিক কি? তবে ছেলেমেয়ে হলে পরে দুটো একটা—মেয়েদের আকর্ষণ কমে আসে ছেলেদের চোখে।

রজত আর মালবী খুব জমে উঠেছিলো। খুব সময়ে বাধা দেওয়া গিয়েছে। দেরী করলে ঐ রজতের সঙ্গে মালবীর বিয়ে হতো—সে কি করতো? সে বুড়ো ভগ্নীপতি সেজে দই মিষ্টি পরিবেষণ করে মৈত্র-র সম্পত্তির এঁটো শালপাতা ক-খানা নিয়ে সরে পড়তো রঙ্গমঞ্চ থেকে।

সে দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচা গিয়েছে। নিশীথ তালুকদার জীবনে-ও বোকামি করেনি। সবই করছে ঠিক ঠিক। শুধু, বাসবীর সঙ্গে অতটা খারাপ ব্যবহার···বাসবীর কথা আলাদা। ভাগ্যে গোড়ায় কাজটা সারা গিয়েছিলো। বাসবীর ছবিখানা বাঁধাতে হবে। বিরাট একটা ওয়েল পেন্টিং করাবে নিশীথ। তাতে দুইবেলা সিঁদুর পরাবে।

এখন আর বেশী ভাববেনা। একবার বিয়েটা হলে হয়। কাল-কের দিনটা এলে হয়।

চোখ নিমীলিত করে আঁধার ঘরে সুখের ছবি দেখতে থাকে নিশীথ তালুকদার।

কালো শাড়ী আর অজস্র ঝুটো কাঁচের গহনা পরে এডিথ নিচু হয়ে কুঁজো ভাবে হেঁটে বড় গেটটা পেরিয়ে এলো। পেছন দিয়ে ঢুকবার চেষ্টা করবে। সামনে দিয়ে সকলের চোখের ওপর দিয়ে সে না-ই বা ঢুকলো। বুকটা দুরুদুরু করছে কি? না। হাতব্যাগটা জাপটে নিয়ে চলে আসে পেছনের দিকে এডিথ।

বাগানটা প'ড়ো হয়ে ঝোপ হয়ে আছে এদিকে। ঢুকে এডিথ দক্ষিণের বাথরুমের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি ধরে উঠতে থাকে। খোলা থাকাই স্বাভাবিক। দক্ষিণ দিকটা আঁধার কেন।

বাথরুমের দরজা দিয়ে ঢুকে ঘরে ঢোকার আগে থমকে দাঁড়ায় এডিথ। বের করে নেয় রিভলবার। রাখে বুকে। ব্যাগটা ফেলে দেয় বাথরুমের বেসিনের ওপর। ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায় পাথর হয়ে।

সেইঘর। তার বিয়ের সেই বাসর ঘর। খাট, পালঙ্ক, সব যেন আবছা বোঝা যাচ্ছে তরল আঁধারে। আজ বুঝি এ ঘরের দেওয়ালে ওরা সাজিয়ে দিয়ে গেছে ফুলের বড় বড় রিং। ঘরটা তাই গন্ধে ম' ম' করছে। আর ইজিচেয়ারে অমন করে শুয়ে আছে কে? সিগারেটের আলোয় পাতলা ঠোঁট—নিশীথ! নিশ্চয় নিশীথ!

—নিশীথ!

ফিসফিস করে ডাকে বাসবী।

—কে?

মুখতোলে নিশীথ। মুখতোলে আর সামনের দিকে চেয়ে পাষাণ হয়ে যায়। কি দেখছে সে? কি ও? প্রেতলোকের অন্ধকার থেকে ও কোন ছায়া উঠে এসেছে? কার চুল বাতাসে উড়ছে? আঁধারে কার চোখ জ্বলজ্বল করছে? সে চ্যাঁচাতে চায়। চ্যাঁচাতে পারে না। বিকৃত কণ্ঠে আবার বলে,—কে? কে তুমি?

—বাসবী।

এগোতে থাকে নারীমূর্ত্তি। ধীরে ধীরে—পা ফেলে ফেলে। দাঁড়ায় নিশীথ তালুকদার। চোখ ঢাকে। বলে—না-না। বাসবী মরে গিয়েছে আজ সাত বছর আগে!

—সেখান থেকে উঠে এসেছি আমি নিশীথ! এ বিয়ে আমি হতে দেবো না।

নিশীথ তালুকদারের পা দুটো পাথর—শরীর মনের কোনো ক্ষমতা নেই। সে শুধু মুখঢাকে আর বলে,—না! চলে যাও তুমি!

—যাবো নিশীথ। এবার তোমাকে টেনে নিয়ে যাবো। কি ভেবেছিলে নিশীথ? আঁধাররাতে টুর্নীনদীর জল তোমার সব পাপ ঢেকে দেবে?

—বাসবী! ক্ষমা কর!

—তোমাকে নিয়ে তবে আমি যাব যদি যেতে হয়! নিশীথ তালুকদার! মূর্ত্তিমান একটা ব্যাভিচার হয়ে আর আমি তোমায় বাঁচতে দেব না।

না। প্রেতমূর্ত্তি তো নয়? রক্তমাংসের বাসবী? বাসবী, না নিশীথের মনের একটা প্রতিচ্ছবি? নিশীথ আলো জ্বালে মরিয়া হয়ে। সুইচটাই আঁকড়ে ধরে মরিয়া হয়ে। যেন সুইচটা সর্বশক্তিমান। যেন সুইচটা তাকে বাঁচাবে। • আলোয় ঝলমল করে ঘর। ঘুরে দাঁড়ায় নিশীথ। হ্যাঁ। বাসবী-ই। কোন ভুল নেই। প্রেতলোক থেকেই উঠে এসেছে বাসবী। তবে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে। চোখ জ্বলছে প্রতিহিংসায়। ঠোঁটের লালরং-ও যেন জিঘাংসার-ই রঙ। আজ বাসবী তাকে ধরবেই। আর তাকে এড়াতে পারবে না নিশীথ। বাসবী হাসে। বলে -- কি ভেবেছিলে নিশীথ? সাতপাকের বাঁধন। কি জীবনে, কি মরণে তুমি আমার। এমন চট করে ছেড়ে দিতে পারি কি?

নিশীথ লাফিয়ে এসে হাতটা চেপে ধরে বাসবীর। বাসবী-ও প্রস্তুত ছিলো, টেনে বের করে রিভলভার। নিশীথ তার সে হাত-ও ধরে। সুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। নিশীথ বাসবীর চেয়ে অনেক শক্তিশালী কিন্তু ভয় তাকে আজ পরাজিত করে। বাসবী লড়ে প্রাণপণে -সমস্ত জীবনের শক্তি একত্র করে। দু'জনে দুজনকে বাঁধে আলিঙ্গনে। অদ্ভুত আলিঙ্গন। এমন করে একাঙ্গ হওয়া শুধু প্রেমের কাজ নয়। বাসবীর হাতটা নিশীথের গলার কাছে নলটা ধরে আটকে যায়।

যতজোরে ধরে ছিল নিশীথ, এবার ততজোরে-ই দূরে সরিয়ে দিতে চায়। ভয়ে সে আর্তনাদ করে একটা বিকৃত স্বরে- যেন শূয়োর-কে কুপিয়ে মারছে কেউ। বাসবীর মরিয়া আঙ্গুলগুলো এবার চেপে বসে ট্রিগারে। শব্দ হয় চাপা।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় বাসবী পিছিয়ে। উঠে দাঁড়াতে চায় নিশীথ। পারে না। গড়িয়ে পড়ে যায়।

বাসবী এবার নিজেকে দেখে। দেখে নিশীথকে। সিল্কের পাঞ্জাবী রক্তেলাল। কার্পেট রক্তে ভিজে যাচ্ছে। রক্ত-র ছিটে মেঝেতে-ও।

অস্ফুট আর্তনাদে উঠে দাঁড়ায় বাসবী। যেন বোঝে সে কি করেছে! সমস্ত উত্তেজনা। এতবছরের সমস্ত প্রস্তুতি সবটুকু ঢেলে দিয়ে যেন মাথা গোলমাল হয়ে যায় তার।

পড়ে থাকে রিভলভার। পড়ে থাকে হাতব্যাগ। বাথরুমের দরজা দিয়ে সে নামতে থাকে সিঁড়ি ধরে। প্রায় ছুটে বেরোয় রাস্তায়। ট্যাক্সি চাই একটা। ট্যাক্সি কোথায়?

ট্যাক্সি দেখে দাঁড় করায় বাসবী। উঠতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে তার কাঁধ চেপে ধরে শঙ্কর। বলে—তুমি!

—শঙ্কর!

—আমি কোনদিন-ও বিশ্বাস করিনি তুমি মরেছো অমন করে। ভেবেছি ও তোমাকে খুন করে কোথাও···

—শঙ্কর, তুই আমাকে নিয়ে চল্ শঙ্কর!

ইভামিত্র-র ঠিকানা বলে শঙ্করের কোলেই ঢলে পড়ে বাসবী।

অসিত মৈত্র-র বাগান থেকে তুবড়ির আগুন আকাশে উঠে ফেটে পড়ে।

তারপরে যা হয়। সেই ঘটনা থেকে-ই বলতে গেলে এই কাহিনীর সুরু।

পুলিশকে অজস্র পুরস্কারের কথা বলেন অসিত মৈত্র। তৎপর হয় পুলিশ। কমিশনার বলেন—পুরস্কারের কথা বলবেন না। সে যদি আমরা অপরাধীকে ধরতে পারি, সেটাই হবে মাস্তো কৃতিত্ব। আসলে অপরাধীকে ধরতে হবে আমাদের।

সুরু হয় পুলিশের কাজ। সন্তর্পণে। রিভলভারের ঠিকানা মেলে— আর এডিথের ব্যাগ-ই তার সঙ্গে রিভলভারের যোগসূত্র ধরিয়ে দেয়।

শঙ্কর ফিরে আসে দুই দিনবাদে। বাসবীকে ধরা তারপর খুব কঠিন হয় না পুলিশের পক্ষে। ইভামিত্র শুধু বলেন—অনেকদিন পরে ঘুমোচ্ছে বাসবী। ঘুমটা ভাঙিয়ে দেবেন ইন্সপেক্টার? একটু বসবেন না?

আইন হৃদয়ানুভূতি মানেনা। ঘুম ভাঙাতেই হয় বাসবীর।

খবর পেয়ে জনস্টোনগঞ্জে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন না ডক্টর নারায়ণ। চলে আসেন তিনি।

॥ ১৫ ॥

এডিথ বিশ্বাসের জবাববন্দীতে বাসবী তালুকদারের করুণ জীবন কাহিনী উদ্‌ঘাটিত হয় ধর্মাধিকরণের এজলাসে। টাকা খরচ করেন অসিত মৈত্র জলের মতো। এলীরায় আসে লাহোর থেকে। বৃদ্ধ কাউল সাহেব আসেন। ইভামিত্র-র পাশে এসে দাঁড়ান রমাপদসোম। বুড়্‌ঢা গুহ মদ খেয়ে মরে গিয়েছে গতবছর। প্রিয়াগুহ-কে পাওয়া যায়। ললিতা বসুর কলঙ্কের কথা তার ছোট বোন সবিতা বসুর জবানীতে উদ্‌ঘাটিত হয়। কাউল বলেন—নিশীথ তালুকদার দুর্ঘটনায় মারা গেল তার সৌভাগ্য। আমার স্ত্রী-র মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি। আমিই হয়তো মারতাম তাকে।

—সাহস থাকলে আমি-ই মারতাম—এলী রায় বলে। আমি ভীরু, আমি পারিনি।

সুগত মিত্র বলে ললিতার আত্মহত্যার পেছনে ঐ কারণ? জানলে আমি কবে সরিয়ে দিতাম ওকে!

এক্টর নারায়ণ কিছু বলতে পারেন না বাসবী সম্পর্কে। তিনি শুধু তাঁর সিস্টারের প্রশংসা করে চলেন। মৈত্র-কে বলেন—আমার হাঁসপাতালের রেকর্ড এনে দেব? তাতে আপনার মেয়ের কোন উপকার হবে?

এ কথা-ও কেউ বলতে পারেন না, যে খুনই হয়েছে নিশীথ। এক ধ্বস্তাধ্বস্তি থেকে এই দুর্ঘটনা হতে পারে না কি? এই কথা ফেরে মুখে মুখে।

রায় বেরুবার দিন লোকে ভেঙে পড়ে আদালতে। এলীরায়ের চুল পেকে গিয়েছে। সে আর সবিতা জ্যোতিপ্রভার দুদিকে বসে থাকে। মৈত্র বারবার ডক্টর নারায়ণের হাতে চাপ দিয়ে সান্ত্বনা খোঁজেন। সুগত মিত্র একবার এসে ঘুরে যায়। মালবীর পাশে

রজত বসে থাকে। মালবীর হাত দু'খানা বারবার ঘামে। রজত রুমাল এগিয়ে দেয়।

জুরীরা ফিরে আসেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে।

বাসবীর বিরুদ্ধে কোন কেস-ই দাঁড়ায় না। বাসবীকে মুক্তি দেয় ধর্মাধিকরণ।

নেমে আসতে গিয়ে পা টলে যায় বাসবীর। আজ তাকে জড়িয়ে ধরেন অসিত। অজ্ঞান হয়ে যায় বাসবী। বুকে জাপটে ধরে তাকে গাড়ীতে নিয়ে চলেন অসিত।

রজত শুধু বারণ করে চলে রিপোর্টারদের—ছবি নেবেন না। অনুরোধ করছি। ছবি নেবেন না।

আলিপুরের বাড়ীর সে বিয়ের লগ্ন পিছিয়ে যায় মাত্র। তাই বলে বিয়ে বন্ধ থাকে না। প্রথমদিন বাপ, মা, আর বোনের কাছে বাসবীকে রেখে চলে যায় রজত। যাবার সময়ে নিয়ে যায় ডক্টর নারায়নকে। বলে—আমি মেসে থাকি। তবু আমার সঙ্গেই কাটান সময়টা। কাল না হয় যাব ওখানে।

ডক্টর নারায়ন এত ঘটনার মধ্যে যেন কথা হারিয়ে ফেলেছেন। বলেন—কি মেয়ে? অমন আমি দেখিনি কখনো!

রজত-ও স্বীকার করে।

ওদিকে চারজন চারজনকে ধরে বসে থাকেন। অনেক পরে বাসবী বলে—একটু ছাড়। মালবী, বড় আলোটা জ্বাল্। তোকে দেখি। তোমাদের দেখি।

মা-র বুকের মধ্যে সেদিন বাসবী বড় নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

সকাল হলে রজত আসে। মালবীকে বলে—মালবী এবার একটা কথা বলি?

—বল।

—বিয়েটা হয়ে-ই যাক্ না। তোমার আপত্তি না থাকে তো সুযোগ দিলে আমি তোমাকে সুখী করতেই চেষ্টা করবো।

—রজত! এর পরেও তুমি…

—তাতে কি ! তোমার সে মানসিক বিকার-কে আমি এক মুহূর্ত-ও বিশ্বাস করিনি মালবী। দিনরাত কামনা করেছি, যে তুমি তোমার আপনাকে খুঁজে পাও ! আর…

—আর কি রজত ?

রজত চোখে চোখে চেয়ে বলে—তুমি তো জীবন যাপন করোনি মালবী। আমি তোমাকে জীবনে আনন্দ পেতে শেখাব। এতদিন থেকেছ কাঁচের ঘরে। তোমাকে আমি কাজে টেনে আনব। তুমি কাজ করবে। নিজের জীবনকে সার্থক করবে। দেখবে তার চেয়ে সুখ বুঝি কোথাও নেই। মালবী, ভাল লাগবেনা তোমার ?

মালবী বলে -তুমি যদি পারো রজত, তবে আমি-ও পারব। তবে আমি যে কত অনভিজ্ঞ, তা তো দেখলে। তোমার ধৈর্য থাকবে ?

—থাকবে। তবে মালবী ঐ ববণডালা আর পুরুত চলবেনা। ও বরদাস্ত হবে না।

রজত ও মালবীর বিয়ের ঠিক হয়। সাত আট দিন কেটে যায়। ডক্টর নারায়ণ এবার বাসবীর কাছে বিদায় নিতে আসেন। দুজনে বসে থাকেন নিচের ঘরে। নারায়ণ বলেন—সময় পেলে কখনো বেড়াতে যাবেন। আর তো ফিবে যেতে বলতে পাবি না।

—সে কি ডক্টর ?

নারায়ণ হাসতে থাকেন। বলেন— ডক্টর আর সিস্টারের সম্পর্ক আর টানবাব কি মানে হয় কোনো ?

বাসবী চোখের দিকে তাকায়। বলে—কিন্তু আমি ফিরে যাবই ডক্টর।

—বাসবী, সত্যি ?

- নিশ্চয়। ফিরে যাব। আমার আপনার সেই মেটারনিটি হোম গড়বার কথা। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন ডক্টর ?

নারায়ণ বাসবীর হাত দুখানি ধরেন। বলেন—তুমি শুধু দুঃখ-ই পেয়েছ। দুঃখ-ই জেনেছ। সে যে অনেক কষ্টের কাজ বাসবী ! তা

ছাড়া তোমার বাবা মা—তাঁদের কি হবে? তাঁরা কি তোমাকে ছাড়তে চাইবেন?

—সুখ আমি যা জেনেছি ডক্টর, তা আপনার কাছে কাজ শিখে। নিজের জীবনকে অতটুকু মূল্য কেউ কোনদিন দেয়নি আমাকে। আমার যা আছে, তাই নিয়েই আসবো আমি। বাপ, মা-ও যাবেন। থাকতে পারবেন সেখানে। এই বাড়ীটা…বাবাকে বলেছি আমি—যে এই বাড়ীটায় রজত মালবী যদি থাকনে চায় থাকবে। তাঁদের নিয়ে যাব ওখানে। মা-র পক্ষে-ও ভাল হবে। ভাল লাগবে তাঁর। এই বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দিলেই তো হয় — ! আর ডক্টর !

বাসবী !

— মেটারনিটি হোম না হয় আমার টাকা দিয়ে-ই সুরু করবো আমরা। না হয় ছোট খাটো ভাবেই হবে —তবু আপনার সেই পঞ্চাশ টা দরজায় ছুটোছুটি করবার থেকে বাঁচাবেন ত ?

—তুমি অনন্য বাসবী। তোমার তুলনা নেই।

-সিস্টারের প্রয়োজন তোমার সেদিন-ও হবে ডক্টর।

--কথা দিচ্ছ বাসবী ?

—কথা দিচ্ছি।

হাতে হাত দেয় বাসবী। এগিয়ে দিতে চলে নারায়ণকে। হাতে হাত ধরা থাকে। হাত সরিয়ে নেয় না সে। ওদিকে ড্রয়িংরুমে আলো জ্বলেছে। এসেছে এলী, সবিতা, ইভামিত্র-ও এসেছেন। রজত আর মালবী বুঝি ঐ গাছের তলায় বসে আছে।

নারায়ণের পরিচিত চেহারাটা মিলিয়ে যায় পথের বাঁকে। তাঁর দিকে—যেন নিজের ভবিষ্যতের দিকেই চেয়ে থাকে বাসবী। মুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগে।

শুধু ভাঙচুর, শুধু অপব্যয়, শুধু নষ্ট হয়েছে বাসবী। ভাঙচুরের পরেও যা রইলো, তাই নিয়েই নিজেকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে সে। বহু ধ্বংসের চেয়ে একটি প্রাণ বাঁচানোর কাজ মহৎ। নিঃশোধিত, নিষ্পিষ্ট মানব সত্তার থেকে বাসবী এবার নতুন করে

বাঁচতে চেষ্টা করবে। স্ব-পরিচয়ে। পিতা বা স্বামীর ছাড়পত্র নিয়ে আর নয়।

গলার আচলটা জড়িয়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফেরে বাসবী। মুখে আলো এসে পড়ে বাড়ী থেকে। পায়ের তলায় শুকনো পাতার শব্দ হয়। বৃষ্টির প্রথম দুই এক ফোঁটা পড়ে মুখে। বাসবী খেয়াল করে না। বৃষ্টি আর একটু জোরে আসে। বাসবী একটু জোরে চলে। তারপর প্রায় ছুটে উঠে পড়ে বারান্দায়।